গুরুদেব

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শ্রীকালীপদ গুহ রায়ের

শ্রীকরকমলে

২২ শ্রাবণ ১৩৬৯ প্রণতা

শান্তিনিকেতন রানী

‘গুরুদেব-দাদু ও অভিজিৎ’, ‘পুনশ্চর বারান্দায়’ ও ‘উদীচীর গৃহ-প্রবেশ-অনুষ্ঠান’ চিত্র শ্রীশম্ভু সাহা -কর্তৃক, ‘শ্যামলীর পিছনে আম্রকুঞ্জের ছায়ায়’ চিত্রটি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক এবং ‘সকালে চায়ের টেবিলে’ চিত্রটি অনিলকুমার চন্দ -কর্তৃক গৃহীত। সমস্ত চিত্র লেখিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সন তারিখ মনে নেই— মনে থাকেও না; তখন বেশ বড়ো হয়েছি, বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় এলাম আমরা মায়ের সঙ্গে, তার কিছুকাল বাদে বড়দা দেশে ফিরে এলেন বিলেত হতে বারো বছর পরে। এসেই চললেন শান্তি-নিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে; সঙ্গে নিলেন— দিদি আমি— দুই বোনকে।

অপরাহ্নের কোনো-একটা ট্রেনে লম্বা ইণ্টার ক্লাসের এক কামরায় জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছি দু বোন, স্পষ্ট মনে আছে। একটু আড়ষ্ট, ভীত-ভীত ভাব— বুকে চাপা উল্লাস। জ্ঞান হয়ে শহরে ঘোরাঘুরি আমাদের এইই প্রথম। বাবা ইহলোক হতে বিদায় নিলেন আমার শৈশবে। বড়দা তখন সবে জাপান ঘুরে এসেছেন গুরুদেবের সঙ্গে। মা আমাদের নিয়ে চলে এলেন ঢাকায়, বড়দা গেলেন বিলেত। শহর বলতে তাই জানতাম ঢাকা; গ্রাম বলতে চিনতাম শ্রীধরপুর— মামাবাড়ি।

দু বোনে ফিসফিস করি। গুরুদেবকে দেখি নি চোখে কখনো; তবে জানি তো তাঁকে। ভালো করে জানি, আপন মানুষের মতো করে জানি। মায়ের কাছে ছিল প্রকাণ্ড এক কালো রঙের স্টীলট্রাঙ্ক, মানুষ শুতে পারে তার মধ্যে, এত বড়ো। সেই বাক্স বোঝাই ছিল— ছবি, বই, গুরুদেবের ফোটো, তাঁর হাতে-লেখা কবিতা, চিঠি; আর ছিল বড়দার আঁকা ছোটো-বড়ো অজস্র স্কেচ। বরাবর দেখেছি বছরে দুবার সেই ট্রাঙ্ক খুলে মা ছবি কাগজপত্র রোদে মেলতেন। আমাদের দু বোনকে পাহারায় বসিয়ে দিতেন— হাওয়ায় না উড়ে যায় কিছু। সেই তখনই সে-সব নেড়েচেড়ে দেখতাম। ফোটোর অ্যালবামগুলি নিয়েই কাড়াকাড়ি করতাম বেশি দু বোনে। এগুলিই ছিল আমাদের বেশি প্রিয়। বুঝি-বা বছরের এই দুটি দিনের জন্য অপেক্ষাতেই থাকতাম ফোটোগুলি ফিরে দেখতে পাব বলে। মা'র কাছে শুনেছি বড়দা নিজেই তুলেছেন সব ফোটো। বেশির ভাগ গুরুদেবেরই— আশ্রমে মন্দিরে যাচ্ছেন, মন্দিরের সামনে, মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে, ছাত্রদের নিয়ে, লেখার টেবিলে দু-হাত রেখে ভাবছেন গুরুদেব— কত কত ছবি তাঁর। গাছতলায় আশ্রমের ক্লাস, শালবীথি, বেণুকুঞ্জ, দেহলি, থারিক— বোঠান

বড়োমা লাবণ্যদি— সব তো চেনা আমার এই ফোটো দেখে দেখে। তা ছাড়া গল্প শুনেছি মায়ের কাছে— ছোটোবেলা থেকে বড়দাকে দিয়ে-ছিলেন বাবা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তে। সেই বড়দা বড়ো হয়েছেন সেখানেই। প্রতি ছুটিতে বাড়ি আসতেন যখন মাকে গল্প শোনাতেন আশ্রমের। সেই-সব গল্পই এই বারো বছরে বারে বারে এতবার শুনেছি— আশ্রমের পথ, মাঠ, মানুষ, গাছ সবেরই সঙ্গে যেন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেই আছে আমার।

অজয় নদ দেখা যেতে বড়দা বললেন— আর মাত্র মাইল-কয়েক বাকি— তার পরই বোলপুর।

তখনকার দিনে স্টেশনে ট্যাক্সি রিক্সা ছিল না। স্টেশন থেকে শান্তি-নিকেতন দু মাইল পথ, গোরুর গাড়িতে যেতে হত, নয় হেঁটে। আমরা বোধ হয় হেঁটেই গিয়েছিলাম। কুলি মালপত্র বয়ে এনেছিল। ঠিক কোন্ সময়টিতে গিয়ে আশ্রমে পৌঁছই— মনে নেই। সেই সন্ধেয় গুরুদেবকে দেখেছিলাম, কি, দেখি নি মনে নেই। তিনি কোথায় বসে ছিলেন, কি করছিলেন তাও মনে নেই। কিছুতেই সেই সন্ধেটা মনে আনতে পারছি না। যাক— যেখান থেকে সব-কিছু পরিষ্কার মনে আছে সেখান থেকেই শুরু করি।

আশ্রমের আদিবাড়ি তখন ছিল গেস্ট হাউস। সেখানেই আমরা ছিলাম। পরদিন খুব ভোর-ভোর উঠলাম। গেস্ট হাউসের কাছেই রাস্তার ওধারে পান্থশালা; উঠোনে মাচা-ভর্তি বেগ্নি রঙের সিম ফুল, আর ঝোপভরা ছিল রাশি রাশি আকন্দ। বড়দা এনেছিলেন বিদেশ হতে বিখ্যাত স্টেটমারের হাতে-গড়া মাটির একটি মেটুলি রঙের ছোট্ট বাটি। দু হাতের মাঝে রাখা যায় এমনি মাপ বাটির। সেই বাটিতে সিম ফুল আর আকন্দ ফুল তুলে ভরে নিলাম; নিয়ে চললাম দু বোন বড়দার সঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করতে।

উত্তরায়ণে উদয়নের দোতলায় সিঁড়ির পাশে যে ছোটো ঘর— তখনো দেয়াল গাঁথা হয় নি চার দিকে; থামের উপরে ছাদ ঢালা শুধু— সেইখানে বসে লিখছিলেন গুরুদেব। মনে আছে, ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে যাব— কি খুশি হয়ে উঠলেন ফুল দেখে। বললেন, 'কে এল আমার আকন্দ নিয়ে

আমায় উপহার দিতে ?' বলতে বলতে দু হাত বাড়িয়ে ফুলভরা বাটিটি তিনি তুলে নিলেন আমার অঞ্জলি হতে।

বহুদিন পরে বড়দা এসেছেন, বড়দার সঙ্গেই কথা হল বেশি। আমাদের বললেন, 'আশ্রম দেখেছিস তোরা ? আলাপ হয়েছে মেয়েদের সঙ্গে ? যা যা, আলাপ করে নে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে আর কি— 'হ্যাঁ ভাই, হুঁ ভাই' করবি, আলাপ হয়ে যাবে।' সেই শুনেই খিলখিল করে হেসে উঠলাম, আর কি বললেন শুনতেই পেলাম না। গুরুদেবও হাসলেন সেইসঙ্গে।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে বড়দা আমাদের নিয়ে চললেন মেয়ে-হোস্টেলের দিকে। তখন মেয়ে-হোস্টেল ছিল 'দ্বারিকে'। ইটের গাঁথনি, খড়ের চালের দোতলা বাড়ি। প'ড়ো প'ড়ো হয়েও তা ছিল এতকাল; এই সেদিন সে বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্টেশন হতে আশ্রমে ঢুকতে পথের ধারেই দ্বারিক। তখনকার কালে আশ্রমে নতুন কেউ এলে পুরাতনরা যেন দু হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিত। সে আন্তরিকতা আমাদের কালের পরেও বহুকাল ছিল। এখন আশ্রম বাড়তে বাড়তে এত বেড়েছে যে, কে এল-গেল খোঁজ পাওয়া যায় না।

হুটুদি অনুদি ইত্যাদি আরো যাঁরা ছিলেন, ঘিরে এলেন। গুরুদেব বলে দিয়েছেন 'হ্যাঁ ভাই, হুঁ ভাই' করতে— সে কথা বলতে বলতে যত হাসি, শুনতে শুনতে তাঁরাও তত হাসেন।

মুহূর্তে ভাব হয়ে গেল সবার সঙ্গে। তাদের সাথে ঘুরে বেড়াই খেলার মাঠ আম্রকুঞ্জ বকুলবীথি ছাতিমতলা। বড়দা নিয়ে যান গুরুপল্লীর ঘরে ঘরে; সারিবদ্ধ মাটির কুটির— শিক্ষকেরা থাকেন নিজ নিজ সংসার নিয়ে। দেখতে দেখতে তিনটে দিন পলকে ফুরিয়ে গেল।

মনে আছে, ট্রেনে চড়ে যখন সেই অজয় আবার পার হই, দু বোনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম; যেন এখান থেকেও আশ্রমকে দেখতে পাচ্ছিলাম এতক্ষণ; এবারে তা চোখের আড়াল হল।

মাস-কয়েক পর বড়দা প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এলেন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে। চৌরঙ্গীর উপর প্রাসাদতুল্য আর্ট কলেজের বাড়ি, তারই দোতলায় প্রিন্সিপ্যালের ফ্ল্যাট। সেও বিরাট ব্যাপার। দু পাশে বড়ো বড়ো ঘর, মাঝখানে করিডর। পুব দিকে খোলা বারান্দা, নীচে বাগান, পুকুর; আলোছায়া ঝলমল করে জলে দিনে রাতে সমানে।

পুকুরের কথা শুনে গুরুদেবের খুব ভালো লাগল। জল দেখতে গুরুদেব বড়ো ভালোবাসেন। গুরুদেব এলেন চৌরঙ্গীতে সেই ফ্ল্যাটে; কিছুদিন থাকবেন বলে। তখন সেখানে দিদি আমি ছোটোভাই আর বড়দা আছি। খোলা বারান্দার পাশের ঘরই বসবার ঘর। গুরুদেব খোলা আকাশ, পুকুরের জল দেখে খুব খুশি। কেবল ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া বাকি সব সময় ঐ ঘর আর বারান্দাতেই কাটান। আমরা দু বোন ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকি। পিতৃস্নেহবঞ্চিত প্রাণ— এতখানি স্নেহ-মমতা পাই নি কখনো জীবনে; গুরুদেবের কাছছাড়া হতে পারতাম না মুহূর্তের জন্যেও। একটু যদি এ কাজে ও কাজে এ ঘর ও ঘর করেছি— ঘুরঘুর করে আবার এসে তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়েছি, কি, পাশঘেঁষে মাটিতে চুপটি করে বসে থেকেছি। গুরুদেব লিখতেন, ছবি আঁকতেন; তারই সাথে সস্নেহে এই স্নেহকাঙাল মনকে কাছে টেনে নিয়ে রাখতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐভাবে কেটে যেত।

সেই তখন তিনি রেখায় রেখা মিলিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন। একমনে দেখতাম তা। রেখা টানতে টানতে যেই একটা গড়নে এসে যেত— উল্লাসে হেসে উঠতাম। গুরুদেবও সেই হাসিতে খুশি হয়ে উঠতেন। সেই যেন এক খেলা ছিল আমাদের। সে খেলা চলেছিল শেষ পর্যন্ত। এর পর তাঁর শেষজীবনের ক'টা বছর তো তাঁর কাছেই কাটিয়েছি— গুরুদেবের বেশির ভাগ ছবিই আমার চোখের সামনে আঁকা। আজও বলতে পারি কখন কোন্ ছবি কোথায় বসে এঁকেছেন— আঁকতে বসে কি বলেছেন— কোন্ মুডে এঁকেছেন। তাঁর ছবির কথা পরে বলব— তবে এইখানে এই চৌরঙ্গী হতেই তাঁর ছবি আঁকার খেলায় একটা অংশে গুরুদেব আমাকে টেনে নিয়েছিলেন— টেনে রেখে দিয়েছিলেন। আজ সময়ের পটভূমিতে তা নিয়ে আর-একখানি

ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

গুরুদেবের জন্য রান্নার আলাদা লোক ছিল, সে-ই রান্না করত গুরুদেবের রুচি অনুযায়ী। তবু, দিদি আমিও রান্না করে দিতাম রোজ কিছু-না-কিছু, নয়তো কেমন মন মানত না। পূর্ববঙ্গের মেয়ে, গুরুদেব আদর করে বলতেন 'পদ্মাপারের মেয়ে'। ঝাল ছাড়া কি করে রান্না করা যায় বুঝতেই পারতাম না। অথচ গুরুদেব ঝাল খেতে পারতেন না। গুরুদেব বলতেন, ডালে আবার লঙ্কা কেন, লঙ্কা বিনেই ডাল রান্না কর-না। মহা সমস্যা। লঙ্কা বিনা ডাল ফোড়ন কি করে হতে পারে! দু বোনে পরামর্শ করি, ডালে লঙ্কা ফোড়ন দিয়েই ভাজা লঙ্কা তুলে ফেলব, তা হলে তিনি আর বুঝতে পারবেন না। ছেলেমানুষি বুদ্ধি, লঙ্কা ফোড়ন দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে ঝাঁজটা গিয়ে দু-তিন ঘর পেরিয়ে গুরুদেবের নাকে লাগত সে খেয়াল হত না। রান্না করে ডাল ফোড়ন দিয়ে এ ঘরে এসেছি— গুরুদেব যেন কড়া কি এক গন্ধ পাচ্ছেন এমনি করে দেখিয়ে দেখিয়ে নিশ্বাস টানতেন— টেনেই আড়চোখে চাইতেন। বুঝতে বিলম্ব হত না যে, ভাজা লঙ্কার তীব্র গন্ধটারই ইঙ্গিত করছেন। ভঙ্গি দেখে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে পালাতাম।

কখনো কখনো অবসর সময়ে গুরুদেব বসতেন আমাদের নিয়ে ইংরাজি পড়াতে। মনে আছে প্রথম দিন 'Crescent Moon' নিয়ে শিশুর সেই কবিতাটি : খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে, কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে'—"Where have I come from, where did you pick me up?" the baby asked its mother— এই একটি লাইনই পড়ালেন কত রকম করে উলটেপালটে, কত ভাবের মানে করে। তাঁর পড়াবার পদ্ধতিই ছিল অপূর্ব। তখন কি সে-সব বুঝতাম কিছু? একই লাইন নিয়ে এতক্ষণ লাগে পড়াতে— পরদিন সমস্ত ইংরাজি কবিতাটাই মুখস্থ করে রাখলাম আগে থেকে। গুরুদেব জিজ্ঞেস করতে-না-করতেই গড়গড় করে কথাগুলি বলে ফেলছি, ভাবছি গুরুদেব না জানি কত খুশি হচ্ছেন। গুরুদেব বললেন, তাই তো— না পড়াতেই পড়া শিখে ফেললি— এত মাথা!— বলতে বলতে তিনি হেসে ফেললেন। আমিও যেন সেদিন একটু লজ্জাই পেলাম, তবু হেসেছিলাম তাঁর সঙ্গে।

তখন বুঝি নি আজ বুঝি, মানুষ মাত্রেই খেলতে চায়। মাটি খেলা, ধুলো

খেলা— শিশুমনের এক আনন্দের খেলা। দিনে দিনে বড়ো হতে হতে তা থেকে মানুষ সরে যায়; কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটুকু থেকে যায় ঐ একমুঠো ধুলোর জন্য। সময় পেলেই আপনাকে ভুলে একফাঁকে তা দিয়ে একটু খেলা খেলে নেয়। এই ফাঁকটুকু সবার জীবনেই চাই।

বয়স হলেও বড়ো হই নি। শহরের ছাট লাগে নি তখনো গায়ে। চলনে বলনে গ্রামের গন্ধ। গুরুদেব বিশ্রামের অবকাশে আমায় কাছে নিয়ে বসে গান শোনাতেন—

জয় যদু নন্দন
জগত জীবন—
ও তুমি— ভবে আইস্যা করলা কি?

বাঙালদের মতো 'জ' 'য'র উচ্চারণ করে এক-একটা লাইন গেয়ে ওঠেন আর শুনে হেসে কুটিকুটি হই। সে কি হাসি! যত হাসি গুরুদেব ততই গাইতে থাকেন—

ও তুমি— ভবে আইস্যা কর্‌লা কি?
জয় যদু নন্দন—।

কখনো বা পদ্মানদীর গল্প করতেন। আমারই বয়সী এক কন্যা প্রায় রোজই আসত গুরুদেবের কাছে। একদিন গুরুদেব আমাকে বললেন, পদ্মাপারের মেয়ে, বল্‌ তো তুই কখনো জল এনেছিস কলসি কাঁখে নিয়ে?

বলি, হুঁ, কতবার গেছি মামীমাদের সঙ্গে কলসি কাঁখে নিয়ে নদীর ঘাটে। মামাবাড়িতে গরমের দিনে পুকুরের জল শুকিয়ে যেত। গাঁয়ের বউ-ঝিরা দল বেঁধে যেতেন নদীতে খাবার জল আনতে। দিদিমা আমাদের দু বোনকেও দিয়েছিলেন দুটি ছোটো ছোটো পিতলের কলসি কিনে।

গুরুদেব বললেন, আর এই দেখ্‌, এই শহুরে মেয়ে বিশ্বাস করে না সে কথা। বলে, কলসি কাঁখে জল আনা, ও নাকি কবিত্ব করে বলা। বাস্তব নয়।

গুরুদেব বলেন শিলাইদ'র গল্প; আমি শোনাই তাঁকে মামাবাড়ির বর্ষার মজা, মাছধরার রকমারি কৌশল, মাঘমণ্ডল সুবচনী মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের নানা কাহিনী।

লম্বা নিচু একটা সোফায় আধশোয়া অবস্থায় গুরুদেব বিশ্রাম নিতেন,

মুখোমুখি মেঝেতে বসতাম আমি। গুরুদেব আগ্রহে বলে উঠলেন সেদিন—স্ববচনী ব্রত? সে আবার কি ব্রত?

বলি, হ্যাঁ— হয় তো। পুকুরপারে শান-বাঁধানো ঘাটের উপরে হয়। তেল সিঁদুর মাখিয়ে 'স্ববচনী' আঁকে, ব্রতকথা বলে। পাড়ার বউ-ঝি গিন্নি-বান্নিরা আসে। ঘাটে উলুধ্বনি পড়লেই বোঝা যায় কেউ হয়তো কোনো সুখবর পেয়েছে, কি, কিছু মঙ্গল ঘটেছে, তাই ঘাটে স্ববচনীর ব্রত করতে এসেছে। সবাই ছুটে আসে যোগ দিতে। পান সুপারি বাতাসা, আর একবাটি তেল, খানিকটা সিঁদুর, এই লাগে। ব্রতের শেষে সকলের মাথায় সেই তেল ছোঁয়ানো হয়, সধবাদের কপালে সিঁদুর পরায়, আর প্রসাদী পান সুপারি বাতাসা সবার হাতে হাতে দিয়ে দেয়।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, আর মঙ্গলচণ্ডী?

—সে হয় অঘ্রান মাসে। পুরো মাসই এই ব্রত করতে হয়।

বলেন, কি কি লাগে এই ব্রতে?

গম্ভীর ভাবে বলি, বেশি কিছু না। কলাপাতার ডগার দিকটা, ধান-দূর্বা ফুল, আর পিটুলিবাটা দিয়ে একরকম আলুনি— মানে লবণ ছাড়া— পিঠে—এই দিয়েই পুজো হয়ে যায়।

গুরুদেব জানতে চাইলেন— খুব উৎসাহে বলতে থাকি ব্রতকথা। পূর্ববঙ্গে বাড়ি, তার উপরে গুরুদেব যখন-তখন সবার সামনে ডেকে বসেন 'পদ্মাপারের মেয়ে'; বড়ো লজ্জা পাই, মনে হয় এ বুঝি-বা একটা কলঙ্কই আমার। তাই ভাষাটা যতটা পারি এ-দেশীয় যাতে হয় তা নিয়ে প্রবল একটা প্রচেষ্টা থাকে আমার। গুরুদেব বললেন, না, না, এমনি করে নয়, ঠিক যেমনটি করে ব্রতকথা বলে তেমনি করে বল্।

এমন শ্রোতা! এত আগ্রহ শুনতে! মুহূর্তে বাঙাল মেয়ের লজ্জা-কুণ্ঠা কোথায় চলে যায়, উল্লাসে দু পা সামনে সোজা মেলে দিয়ে বলতে থাকি। বলি, হাতে ধান-দূর্বা ফুল নিয়ে বসতে হয় কথা শুনতে— সে আর কোথায় পাব এখন, এমনিই বলি।

আমি বলছি আর গুরুদেব একমনে শুনে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দু চোখ বড়ো বড়ো করে বলে ওঠেন— হ্যাঁ! মানে এমনতরো আশ্চর্য ঘটনা!

আমাকে আর পায় কে? ভেসে চলেছি তখন ব্রতের কথা-স্রোতে। কত অঘটন ঘটনা, কত অসম্ভব সম্ভব, কত আশ্চর্য অত্যাশ্চর্য ব্যাপার— এক রাত্রে কত ওলটপালট! বণিককন্যা রাত জেগে বসে আছে, রাত্রি প্রভাত হলেই তার সকল দুঃখের অবসান। রাত আর কাটে না— 'রাইত পোহা, রাইত পোহা, রাইত পোহা— রাইত পোহাইল'; অর্থাৎ ভোর হল।

গুরুদেব বললেন, বটে? এমন! তা এই ব্রত করলে কি ফল হয়?

গড় গড় করে বলে যাই— 'নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, অবিবাহিতের বিবাহ হয়, লাখোপতির কন্যা কোটিপতির ঘরে পড়ে।' মঙ্গলচণ্ডী ব্রত— 'আলোতে করে আন্ধারে খায়, যেই বর মাগে সেই বর পায়।' মানে, ব্রত করে ব্রতের সেই পিটুলি পিঠে-প্রসাদ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খেতে হয়।

গুরুদেব বলেন, এই ব্রত করলে টাকা পাওয়া যায়?

বলি, হ্যাঁ, ব্রতকথাতেই তো আছে, নির্ধনের ধন হয়।

—তা খরচ কত লাগে?

—বেশি না গুরুদেব, মাত্র সওয়া পাঁচ আনা।

সেদিন কি তৃপ্তি আমার। যেন এক অপূর্ব কাহিনী শুনিয়েছি গুরুদেবকে। এক দুর্লভ তথ্য দিয়েছি তাঁকে।

তখন যে-কয়দিন গুরুদেব ছিলেন চৌরঙ্গীতে, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর স্নেহসিক্ত ভক্ত, অনুরাগী, আশ্রমের হিতৈষী নারী পুরুষ বহুজনা আসতেন তাঁর কাছে। জ্ঞানী গুণী সুধীজন সব। গুরুদেব সেদিনের নতুন কবিতা বা লেখা তাঁদের পড়ে শোনাতেন। নতুন গানে সেদিন কোনো সুর দিলে গাইয়ে যাঁরা তাঁরা তা শিখে নিতেন। আলাপ-আলোচনা হত কত রকমের তাঁদের সঙ্গে। কেবল তাঁর আঁকা ছবি তিনি সবাইকে দেখাতেন না— সত্যিকারের শিল্পরসিক ছাড়া।

সেদিন সন্ধেবেলাও ভিড় হয়েছে সে ঘরে। নানা কথার পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের টাকার সমস্যার কথা উঠল। কয়দিন ধরেই এ প্রসঙ্গ চলছিল, কি করলে কোথা হতে কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। সম্প্রতি টাকার বিশেষ প্রয়োজন সেখানে। কেউ বললেন গুরুদেবকে কোথাও বক্তৃতা দিতে; কেউ বললেন নাচগানের একটা 'শো' দিতে কলকাতায় স্টেজে;

কেউ বললেন অমুককে কিছু টাকা চেয়ে চিঠি লিখতে, ইত্যাদি। এটা ওটা সেটা, যাঁর মাথায় যা আসছে সেই পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। আমি গুরুদেবের পিঠের দিকে বসে চুপ করে শুনছি সব, আর, সকলের কথার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ চেয়ে চেয়ে ফিরছি।

হঠাৎ গুরুদেব বলে উঠলেন, আহা তোমরা এত ভাবছ কেন? টাকা পাবার একটা অতি সহজ উপায় আছে।

সবাই আগ্রহে উৎসুক হয়ে উঠলেন। আমিও বিস্মিতনেত্রে গুরুদেবের মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। কি সে উপায়?

গুরুদেব আড়চোখে যে পাশে আমি বসেছিলাম, সেদিকে একবার তাকিয়েই তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, মাত্র সওয়া পাঁচ আনা খরচ।

বলতেই আমি লজ্জায় গুটিয়ে গেলাম। যে কথা খালি ঘরে একান্তে তাঁকে বলা, সে কি এমন করে সবাইকে জানতে দিতে হয়?

গুরুদেব তাঁদের বললেন, দেখো, ও-সব কিছু নয়; মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করো। যত টাকা চাও, পেয়ে যাবে।

সবাই কৌতুক বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

আমি যে কি করব, কোথায় লুকোব দিশে পাই না। মনে হল বাঙাল মেয়ের এ যেন এক মহা কলঙ্ক রটল। লজ্জা— লজ্জা! এত লজ্জা যে মাটিতে যেন মিশে যাই!

এই সওয়া পাঁচ আনার ব্যাপার নিয়ে গুরুদেব আমাকে কতবার এমনিতরো লজ্জায় ফেলেছেন। তখন কেন, অনেকদিন অবধি আমার এই ধারণাই ছিল যে এ-সব ব্রতকথার মধ্যে যে বাঙালপনা আছে তা একেবারে অচল, হাসির ব্যাপার। গুরুদেবও জানতেন আমার লজ্জাটা কোথায় আর কত গভীরে। তাই তিনি এ কৌতুকে মজা পেতেন। নতুন কেউ এলেই, টাকাপয়সার কথা উঠলেই আমার বুক দুরদুর করতে থাকত— এই বুঝি-বা আবার সেই কথা ওঠে। আর হতও তাই। ঠিক গুরুদেব বলে বসতেন 'মাত্র সওয়া পাঁচ আনা'। আর আমিও ধরণী দ্বিধা হও বলে লুকোবার আশ্রয় খুঁজতাম। বহু বছর পর্যন্ত গুরুদেব এ নিয়ে কৌতুক করেছেন। কেন যে এত লজ্জা পেতাম তাই ভাবি আজ। কিন্তু পেতাম। মনে হত যে গুরুদেবকে ব্রতকথা বলে মহা এক অপরাধ করেছি। মনে হত, এমন কি কিছু হতে পারে না,

যাতে করে গুরুদেব এই কথা বেমালুম ভুলে যান। আর গুরুদেবও যেন কেমন, ভিড়ে-ভাড়েই আবার বলে বসবেন এ কথা। কলাভবনে ছাত্রী তখন আমি; গুরুদেব সে সময়ে প্রায়ই আশ্রমে হঠাৎ চলে আসতেন। কলাভবনে প্রায়ই আসতেন। তখন সবে একটা বড়ো হল্-ঘর হয়েছে কলাভবনে, তখনকার কালে ঐ ঘরটিই ছিল সব চেয়ে বড়ো। গুরুদেব চলে এলেন একদিন সেখানে। গুরুদেবকে আসতে দেখে অন্যরা— ছাত্রছাত্রীশিক্ষক যে যেখানে ছিল, সব বিভাগের সবাই— এসে জড়ো হল হল্-ঘরে। সে-সব দিনে ক্লাসের ঘণ্টা সময় নিয়ে অত কড়াক্কড়ি ছিল না— নিয়মের বাঁধন ছিল না। গুরুদেব কোনোদিন ছবি, কোনোদিন সাহিত্য, কোনোদিন-বা এ জগতের জীব-জীবন নিয়ে গভীর হতে গভীরতর কথা বলে শোনাতেন। সেদিনও তেমনি অনেকক্ষণ ধরে বললেন। সবাই মগ্ন, স্তব্ধ। কথাশেষে নন্দদার সঙ্গে কলাভবনের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে কথা উঠল। আশ্রমের সর্বত্রই তো এই এক সমস্যা। টাকার অভাব। নন্দদা জানান, মিউজিয়ামের ঘর বাড়াতে হবে, পুরাতন ছবিগুলি রাখতে গোটা দুই কাঠের বাক্স চাই, কলাভবনের ছেলেদের হোস্টেলের খড়ের চালটা এবারে পালটাতেই হবে, ইত্যাদি। গুরুদেবও ভেবে পান না কি ভাবে এ টাকার ব্যবস্থা করা যায়। লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে ডোনেশন আর কতই-বা আসে? গুরুদেবের কৌতুকপূর্ণ এক বিশেষ ভঙ্গি ছিল— হঠাৎ সেই ভঙ্গিতে তিনি এক পলক আমার দিকে তাকালেন, এমনভাবে তাকালেন যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেই দিকে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, তা নন্দলাল, ভাবছ কেন এত? মাত্র তো সওয়া পাঁচ আনার মামলা—

শুনে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসলাম।

গুরুদেব হাসলেন। নন্দদা হাসলেন, ছেলেরা হেসে উঠল, মেয়েরা তো হাসতে হাসতে মেঝেতে লুটিয়েই পড়ল। এমনিই হত বার বার।

ছাত্রীজীবন পার হল, বিয়ে হল, সন্তানের মা হলাম; তখনো আমার সওয়া পাঁচ আনা নিয়ে গুরুদেব কৌতুক করেছেন আর আমি সত্যিসত্যিই লজ্জায় জড়সড় হয়েছি।

চৌরঙ্গীতে সেবারে বোধ হয় গুরুদেব সপ্তাহ-তিনেক ছিলেন। গুরুদেবের আশ্রমে ফিরে যাবার কথা উঠলেই দু চোখ ছলছল করে উঠত। ভাবতে পারতাম না এই স্নেহ-ছাড়া হয়ে কি করে থাকব।

মা'র কাছে শুনেছি বাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদেরও আশ্রমে রেখে

পড়ান। বাড়ি করবেন বলে জমিও রেখেছিলেন কিনে সেখানে। হঠাৎ বাবা চলে গেলেন— সব কিছু উলটেপালটে গেল।

গুরুদেবের আশ্রমে ফিরে আসার দিন স্থির হয়ে গেল। চৌরঙ্গী হতে আসবার আগের দিন সন্ধেয় গুরুদেব দিদিকে আর আমাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, অনেকগুলি বছর তোদের নষ্ট হয়ে গেছে, আর নষ্ট করে লাভ নেই। আমার সঙ্গেই চল তোরা কাল সকালে।

পরদিন আনন্দে নাচতে নাচতে দু বোন চলে এলাম গুরুদেবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে।

৩

গুরুদেব বললেন, পড়ে পাস করে কি করবি? অঙ্ক অ্যালজাব্রা জীবনে তোর কোন্ কাজে লাগবে? ইতিহাস ভূগোল যেটুকু দরকার, আপনা হতেই জেনে যাবি। বাংলা মাতৃভাষা, এমনিতেই শিখে ফেলবি। আর ইংরাজি? তা আমিই শিখিয়ে দেব। তোর ছবির দিকে ঝোঁক— ছবিতেই মনপ্রাণ দিয়ে লেগে যা। আর সময় নষ্ট করিস নে।

দিদির ছিল গানের গলা, দিদিকে দিলেন সংগীতে; আর অবসর সময়ে হাতের কাজ শিখতে।

শ্রীভবন মেয়েদের নতুন হোস্টেল, সেখানে থাকি। গুটিকয়েক মেয়ে মাত্র সেখানে। যেবার বাড়তে বাড়তে চল্লিশটি মেয়ে হল— কি আনন্দ আমাদের! গুরুদেবকে গিয়ে বলি, আজ আরো দুটি মেয়ে এল গুরুদেব, শ্রীভবনে। গুরুদেবও খুশি হন শুনে।

সেই শ্রীভবন এখন শ্রীসদন— বিরাট প্রাসাদ; কত শত মেয়ের বাস।

শ্রীভবনে হেমবালাদি থাকেন আমাদের নিয়ে। কিন্তু আমরা জানি গুরুদেবই আছেন আমাদের নিয়ে। কথায় কথায় তাঁরই কাছে ছুটে যাই, যা-কিছু আবদার তাঁরই কাছে করি, যা পাবার তাঁরই কাছে পাই। দিনে ঘুরে-ফিরে কতবার আসি গুরুদেবের কাছে। ভালো কিছু পেলেই ছুটে গিয়ে তাঁকে দিই, ভালো কিছু শুনলেই ছুটে গিয়ে তাঁকে বলি। আশ্রমের সকলের সুখ-দুঃখের তিনি সমান ভাগীদার। কোথাও এতটুকু অসন্তোষ বা বিরূপতার আভাসমাত্রই তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করে দিতেন— দানা আর বাঁধতে পারত না।

একদিনের এক ছোট্ট ঘটনা, তখন বাংলাদেশে খোঁপায় ফুল পরবার রেওয়াজ ছিল না। দক্ষিণী মেয়েদের আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে চল হল, মেয়েরা একটি দুটি শিরীষ কুর্চি কাঞ্চনের গুচ্ছ খোঁপায় দিয়ে সাজতে শুরু করলে। আমাদের কলাভবনে তা নিয়ে কোনো সোরগোল উঠল না। নন্দদা খুশিই হলেন দেখে; কিন্তু কলেজের দু-একজন শিক্ষকের তা চোখে লাগল। ক্লাসে ছাত্রী আসবে পড়তে, খোঁপায় ফুল— এ চপলতা অশোভন। কথাটা গুরুদেবের কানে গেল। গুরুদেব সব মেয়েদের ডেকে

পাঠালেন উদয়নে। সে সময়ে গুরুদেব মেয়েদের— মানে ছাত্রীদের— ডাকলে প্রৌঢ়া গিন্নিরাও আসতেন গুরুদেব কি বলবেন শুনতে। পুরুষরাও কাছাকাছি কান পেতে ভিড় করতেন। কারণ তাঁর কথা সকল বিষয়ে সব সময়েই শুনবার মত।

খোঁপায় ফুল দিয়ে ক্লাসে যাওয়া উচিত কি না গুরুদেব সে কথায় কোনো উল্লেখই করলেন না। তিনি বলতে লাগলেন মেয়েদের ব্যবহারের শোভনতা নিয়ে। এতে বক্তারা সকলেই খুব খুশি হলেন। গুরুদেব বলতে বলতে শেষে এলেন মেয়েদের সৌন্দর্যবর্ণনায়। ঠিক ঠিক কথাগুলি মনে নেই, তবে মনে আছে বলেছিলেন, মেয়েরা সাজবে বৈকি। নারী নিজেকে সুন্দর করবে, চার দিক সুন্দর করে তুলবে। নারীর ধর্মই হচ্ছে সুন্দরের ধর্ম।

কথা-শেষে ছোটো বড়ো সকলেই খুশি মনে উঠে এল। যে যার মনোমত কথা পেয়েছে। দু-চার জন তখনো যারা কাছে আছি আমরা— গুরুদেব হেসে বললেন, দেখ, গিয়ে 'কো-অপে' এতক্ষণে কত ভিড় জমে গিয়েছে সো-পাউডার কিনতে।

'কো-অপ' ছিল কো-অপারেটিভ স্টোর, আমাদের একমাত্র দোকান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কেনবার।

শ্রীভবনে কিছুকাল থাকবার পর বড়দা আশ্রমে জমি কিনে বাড়ি করালেন। বাড়ি হবার পর বাড়িতেই থাকি, মাও ছোটো ভাইকে নিয়ে এলেন সেখানে। তারও কিছুকাল বাদে দিদির বিয়ে হল গৌরদার সঙ্গে গুরুদেবের ইচ্ছেয়। গৌরদা ছিলেন শ্রীনিকেতনের ভার নিয়ে। সাত বছরের ছেলে এসেছিলেন পড়তে আশ্রমে— ফুটফুটে গায়ের রঙ, গুরুদেব আদর করে ডাকলেন 'গোরা'।

সেই নামেই তাঁকে ডাকতেন বরাবর, গৌরদার গোরা রঙ যখন রোদে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল তখনো।

দিদির বিয়ের পর মা অসুস্থ হলেন। মাকে নিয়ে কলকাতায় রইলাম। বড়দা বিয়ে করলেন। সব মিলিয়ে মাস-কয়েক কেটে গেল। ফিরে যখন এলাম আশ্রমে, একটু মৃদু হাসির গুঞ্জন শুনি চার দিকে।

আমার স্বামী তখন সবে বিলেতের পড়া শেষ করে ফিরে এসেছেন গুরুদেবের কাছে। বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগে উনি কিছুকাল পড়েছিলেন।

গুরুদেব যখন শেষবার বিলেতে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওঁকে, তোরা আমার আশ্রম না ধরলে কে ধরে থাকবে? সেই কথা ওঁর প্রাণে গাঁথা ছিল। উনি আশ্রমের যে-কোনো একটা কাজের ভার চাইলে পরে গুরুদেব খুব খুশি হয়ে কাজ দিলেন ওঁকে। সেইসঙ্গে বউঠানের কাছে কথা উঠল আমাদের বিয়ের সম্পর্কে।

অভিভাবকরা আমাদের বিবাহের আয়োজনে লাগলেন। আমিও কলকাতায় চলে এলাম। এমন সময়ে দু পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কারণ নিয়ে মনোমালিন্য জমাট বেঁধে উঠল।

গুরুদেব আশ্রমের জন্য টাকা তুলতে অভিনয়ের দল নিয়ে বোম্বের পথে বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন; গোপন পরামর্শ মতো উনি আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলেন গুরুদেবের কাছে। বিবাহ নিয়ে গোলমালের কথা গুরুদেব শুনেছিলেন আগেই।

খানিক পরেই হাওড়া হতে বোম্বে মেল এল। দলের সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম তাতে। কিছুক্ষণ গুরুদেবের কামরায় তাঁর কাছে বসে রইলাম। গুরুদেবের পাশের কামরায় দিনদা ছিলেন, মেয়েরাও কয়েকজন ছিল; পরে আমিও রইলাম সেইসঙ্গে।

পুরুষোত্তম ত্রিকোম দাসের স্ত্রী বিজুবেন তখন কলাভবনের ছাত্রী, বিজুবেনও চলেছেন এইসঙ্গে। বোম্বেতে তাঁর বাড়ি। বোম্বে স্টেশনে নেমে গুরুদেব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বিজুবেনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে। দিনদা নন্দদা ক্ষিতিমোহনবাবু ও ওঁকে নিয়ে গুরুদেব গেলেন টাটা প্যালেসে; সেখানেই তিনি থাকবেন। দলের বাদবাকি সবার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে অন্যত্র, টাটা প্যালেস হতে কিছুটা দূরে শহরের ভিতরে।

আমি সারাদিন বাজার ঘুরে শহর দেখে বিজুবেনের সঙ্গেই কাটিয়ে দিলাম। এই যে এমন করে চলে এসেছি কাউকে না বলে-কয়ে— ভয় ভাবনা কিছুই হয় নি তেমন। গুরুদেবের কাছে এসে গিয়েছি আর আমার ভাবনার কি থাকতে পারে। আজ বুঝতে পারি এ নিয়ে কতখানি ভাবতে হয়েছিল গুরুদেবকে। আমরা তো অবুঝের মতো কাজ করে বসে আছি; ভালোমন্দের কত দায়িত্ব পড়েছিল সেদিন তাঁর উপরে। কিছু মনেই জাগে নি সে-সব তখন। পরম নিশ্চিন্ত নিরাপদ মনে হয়েছে নিজেকে।

সন্ধেবেলা খবর এল বিজুবেনের কাছে আমাকে নিয়ে টাটা প্যালেসে যেতে। গুরুদেব ডাকছেন।

টাটা প্যালেসে বিরাট বসবার ঘর, মেঝেজোড়া পুরু কার্পেট, বাতি-ঝলমল দেয়াল, গুরুদেব বসে আছেন সেখানে সোফার উপরে। পরনে গরদের ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর; গলায় জুঁইয়ের লম্বা গোড়ে মালা। অপরূপ রূপ। যেন আলো ছড়িয়ে বসে আছেন। ঘরে সরোজিনী নাইডু, নন্দদা, ক্ষিতিমোহন ঠাকুরদা, উনি ও হরেন ঘোষ মশায়। গুরুদেব আমাকে বললেন, যাও একটু সেজে এসো।

পাশে লেডী টাটার স্যুইট, গুরুদেবের জন্য সাজানো হয়েছিল এটি। গুরুদেব এখানে না থেকে ওদিককার অপেক্ষাকৃত ছোটো ঘরটাই বেছে নিলেন, বললেন, অতবড়ো ঘরে আমি হারিয়ে যাই। এ আমার সেক্রেটারির জন্যই থাকুক।

সেই ঘরে এলাম। কি আর সাজব, শাড়িটা বদলে নিলাম শুধু, আর খোঁপায় জড়ালাম ফুলের মালা একছড়া, বিজুবেন দিয়েছিলেন আসবার সময়। সেজে এ ঘরে এলাম। গুরুদেব সোফা থেকে উঠে এসে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসলেন জোড়াসন হয়ে। আমাদের দুজনকে বসালেন তাঁর সামনে পাশাপাশি। গুরুদেব আগে হতেই বোধ হয় বলে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, আমার পাশে বসলেন নন্দদা, কন্যাপক্ষ; ওঁর পাশে বসলেন ক্ষিতিমোহন ঠাকুরদা, বরপক্ষ। সরোজিনী নাইডু বসলেন একাই সভাসদ্ হয়ে। হরেন ঘোষ মশায় রইলেন দরজায় প্রহরী কেউ যাতে এখন না আসে ভিতরে।

গুরুদেব মন্ত্র পড়তে লাগলেন বৈদিক বিবাহের। আজও সে ধ্বনি কানে আসে। তন্ময় হয়ে শুনছি গুরুদেবের কণ্ঠস্বরে সে মন্ত্রধ্বনি। আমারই যে বিয়ে সে খেয়ালই ছিল না। গুরুদেব বললেন, বলো।

বুঝতে পারি নি আমাকে বলছেন। চুপ করে আছি যেমন ছিলাম। গুরুদেব আবার বললেন, বলো আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বলো রানী।

গুরুদেব আমাকে মন্ত্র পড়ালেন। ওঁকে মন্ত্র পড়ালেন। নিজের গলার মালা খুলে আমাদের মালাবদল করালেন। ক্ষিতিমোহন ঠাকুরদাকে নন্দদা বললেন, আপনারা এবারে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করুন।

তাঁরা 'স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি' বললেন।

গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করলেন। যাঁরা ছিলেন ঘরে তাঁদের প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ পেলাম।

গুরুদেব উঠে সোফায় বসতে বসতে বললেন, চলো এবার নেমন্তন্ন খেতে।

তাঁর সঙ্গেই গেলাম বোম্বের মেয়রের পার্টিতে। আমাদের দলের সবাই আছেন সেখানে, সকলেরই নিমন্ত্রণ। বোম্বের গণ্যমান্য আরো বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত। গিসগিস করছে হল। শান্তিনিকেতনের সবার কৌতূহলী দৃষ্টি আমার উপরে। কেউ জানে না ভিতরের কি ব্যাপার? সবাই এ নিয়ে কানাকানি করছে; আমি সে-সব বুঝি নি তখন কিছু। একটু লজ্জা, একটু কুণ্ঠা, একটু ভালোলাগা—সব মিলিয়ে একটু বুঝি-বা জড়ো ভাবই ছিল। কিন্তু যাঁর ভাবনা তিনি তখন ভাবছেন কি করে এই বিবাহের কথা প্রচার করা যায়।

গুরুদেবের কাছাকাছিই বসেছিলাম। সরোজিনী নাইডুর বোনেরা ও আরো অনেকে গুরুদেবকে ঘিরে খুব আনন্দ উল্লাস করছেন। গুরুদেব হেসে বলে উঠলেন, আমাকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছ। ঐ দেখ নব-বিবাহিত দম্পতি বসে, তাদের কাছে যাও।

তাঁরা ইশারা বুঝলেন। হৈ-হৈ করে আমাদের ঘিরে ফেললেন। সম্ভ বিবাহিত আমরা, আমাদের নিয়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে সে জায়গা মাতিয়ে তুললেন। সবাই জানলেন, গুরুদেব নিজে প্রচার করলেন এরা বিবাহিত। কাগজের রিপোর্টাররা খবর লুফে নিল। পরদিন বোম্বের ও বাংলাদেশের ইংরাজি বাংলা সংবাদপত্রে খবর বেরিয়ে গেল, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে জানল বোম্বে শহরে অমুকদিন অমুকস্থানে গুরুদেব নিজে পৌরোহিত্য করে আমাদের বিবাহ দিলেন।

বোম্বে শহর। গুরুদেব এসেছেন, নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান-অভ্যর্থনার আয়োজন প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়। যেখানে যখন যেতেন গুরুদেব, নিয়ে যেতেন আমাকে সঙ্গে করে। আর উনি তাঁর সেক্রেটারি, উনি তো থাকতেনই গুরুদেবের সঙ্গে। বাইরে লোকসমাজে কোথায় কিভাবে চলতে হয়, বলতে হয় গুরুদেব আমাকে শেখাতেন প্রতি পদে। অতি ছোটোখাটো তুচ্ছ ব্যাপারও তিনি শেখাতেন বেশ গুরুত্ব দিয়েই। একদিন এক মিটিং হতে ফিরছি, সবাই গুরুদেবকে মোটরে তুলে দিতে ভিড় করেছেন, আমাকে উঠতে বললেন, আমি উঠে সিটের ওধার ঘেঁষে বসলাম, গুরুদেব উঠলেন— উঠে আমায় এ দিকটায় সরিয়ে দিয়ে আমি যেখানে বসেছিলাম তিনি সেখানে বসলেন। মোটর ছেড়ে দিলে পর বললেন, আমি এখানে কেন বসলুম বলো তো?

বুঝতে পারলাম না কেন বসলেন। বললাম, ওদিকটায় রোদ্দুর ছিল— তাই কি আমাকে সরিয়ে দিলেন?

গুরুদেব তামাশা করে বললেন, তা নয়, মাননীয়দের ডানদিকে বসাতে হয়। আমি তোমার মাননীয় হই তো— কি বল?

সেবার বোম্বেতে একদিন বড়ো একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল।

বোম্বের একজিকিউটিভ কাউন্সিলর সার্ গোলাম মহম্মদ হিদায়েৎ উল্লার বাড়িতে এক রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ গুরুদেবের। সরোজিনী নাইডু, উনি ও আমি আছি গুরুদেবের সঙ্গে, নিমন্ত্রিত নারীপুরুষে বসবার ঘর ঠাসা। এই রকম বড়ো বড়ো পরিবেশে অভ্যস্ত নই আমি। গুরুদেব আমাকে আগলে আগলে রাখেন। সেদিনও অত লোকের মাঝে হকচকিয়ে গেলাম। গুরুদেব বুঝলেন, ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বড়ো লম্বা যে সোফাটায় তিনি বসে ছিলেন সেখানে তাঁর পাশে আমাকে বসিয়ে রাখলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। কারো সঙ্গে আর আলাপ জমাবার দায়-দায়িত্ব রইল না। গুরুদেবের দিকেই সকলের নজর, তাঁরই সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ সবার। আমি দেখছি, শুনছি, খুশি মনে আছি।

খাবার ডাক পড়তে সবাই পাশের ঘরে গেলাম। ঘরজোড়া টেবিল,

টেবিলের এক মাথায় গুরুদেব বসলেন, অন্য মাথায় কে মনে পড়ছে না— বাড়ির কর্তাই হবেন। আর টেবিলের দু ধারে দু সারি অন্যান্য সকলে বসলাম মুখোমুখি। আমার পাশে বসলেন এ বাড়িরই এক মহিলা। এঁরা সবে পর্দা ছেড়ে বেরিয়েছেন শুনেছিলাম। ভদ্রমহিলা পাশে বসেই আর থাকতে পারলেন না, এতক্ষণ বোধ হয় কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলেন আমাকে গুরুদেবের পাশে এক সোফায় বসে আছি— কে হতে পারি আমি তাঁর? এবারে আমাকে কাছে পেয়ে প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বুঢ্‌ঢা সাব আপ্‌কো সাব্‌ হ্যায়?

সেদিন যে কি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিলাম!

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে বাড়ি ফিরে সে কথা গুরুদেবকে বলি আর হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ি।

শুনে গুরুদেব হাসতে লাগলেন, সরোজিনী নাইডু হো হো করে হেসে উঠলেন, সেক্রেটারিও অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে খানিকটা হাসলেন। পরদিন সরোজিনী নাইডুর কল্যাণে বোম্বের অর্ধেক লোক জেনে গেল ঐ গল্প। পথে বাড়িতে যার সঙ্গেই দেখা হয় সরোজিনী নাইডু ডেকে বলেন, শোনো শোনো, সদ্য নতুন গল্প শোনো। সরোজিনী নাইডু রসিকা ছিলেন, হাসতে জানতেন হাসাতে জানতেন। গল্প উপভোগ করবার মতো সরস হৃদয় ছিল তাঁর। সেবার গুরুদেবের দেখাশোনার সকল ভার সরোজিনী নাইডু নিজে নিয়েছিলেন। সকাল হতে সারাদিন গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, যেখানে গুরুদেব যেতেন সঙ্গে সঙ্গে যেতেন, রাত্রে তাঁকে খাইয়ে সবশেষে বিশ্রাম নিতে নিজের ঘরে ঢুকতেন। টাটা প্যালেসেই থাকতেন; গুরুদেবের যদি কখনো কিছুর দরকার হয় এই ভেবে।

বোম্বেতে নাচ-গানের পালা চুকিয়ে দলবল ফিরে গেল শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব আমাদের দুজনকে ও কালীমোহনবাবুকে নিয়ে এলেন ওয়ালটেয়ারে। দেহ ক্লান্ত, সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নেবেন কিছুদিন।

হায়দ্রাবাদে যাবার কথা, নিমন্ত্রণ এসেছে সেখান হতে। গুরুদেবের ভাবনা হল আমাকে নিয়ে। কি জানি হয়তো সেখানে পর্দাপ্রথা এখনো, আমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন তখন অন্ধ্র ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার, ওয়ালটেয়ারে থাকেন সপরিবারে। গুরুদেব তাঁর সঙ্গে

ঠিক করলেন আমাকে তাঁর বাড়িতে রেখে যাবেন, ফিরবার পথে তুলে নেবেন এখান হতে। রাধাকৃষ্ণন আমাকে রোজই একবার তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। ভাব জমিয়ে নেবার জন্য, যেন নতুন আবেষ্টনীতে আড়ষ্ট না হই পরে। শেষে কালীমোহনবাবু যখন বললেন যে ইনি আগেও গেছেন একবার হায়দ্রাবাদে বিশ্বভারতীর কাজে এবং যা দেখেছেন তাতে আমাকে নিয়ে যাবার কোনো অসুবিধার কথাই উঠতে পারে না তখন গুরুদেব রাজী হলেন। আমাকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে এলেন।

হায়দ্রাবাদে তখন ঐশ্বর্যের পূর্ণ গৌরব। যেখানে যাই, নবাব বেগম-সাহেবাদের জলুসে যেন পরীরাজ্য শোভা পায়। ক্লাব তাস টেনিস স্টেজ নিয়ে অতি আধুনিক তারা। পার্টিতে বেগমসাহেবাদের গায়ের উজ্জ্বলবর্ণে সাজে অলংকারে সিফন জর্জেটে যেন বিজুলী খেলে।

গুরুদেব এখানকার নিয়মমত একদিন নিজামের সঙ্গে দেখা করে এলেন। বাকি যত নবাব রাজা মহারাজা এ রাজ্যের, সবাই এলেন গুরুদেবের কাছে। মনে আছে, তখন গুরুদেব শহরের গেস্ট হাউসে কিছুদিন থাকবার পর বাঞ্জারাহিলে এলেন কয়দিন নিরিবিলিতে থাকবেন বলে। হায়দ্রাবাদ শহর হতে চার-পাচ মাইল দূরে এক পাহাড়ী বন, ছোটো-বড়ো পাহাড় পাথর আর বাবলা কাঁটায় ভরা জায়গা। বাঞ্জারা নামে একজাতের পাহাড়ীরাই কেবল থাকে সেখানে। নবাব মেহেদী নওয়াজ জং গুরুদেবের একজন বিশেষ অনুরাগী, শান্তিনিকেতনের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু; কি জানি কোন্ সম্পর্কে তাঁকে প্রথম দিন হতেই 'মেহেদীভাই' বলে ডাক দিলাম, এমনিই ছিল তাঁর স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব। মেহেদীভাইয়ের ঝোঁক গেল বাঞ্জারাহিলের উপর। বললেন, বন পাহাড় কেটে এখানে নগর বসাব। বন্ধুবান্ধব হেসে উঠলেন শুনে। মহারাজ কিষণপ্রসাদ তখন হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী আর মেহেদীভাই কিষণপ্রসাদের সেক্রেটারি। মেহেদীভাইয়ের অনুরোধে মহারাজ কিষণপ্রসাদ মত দিলেন। মেহেদীভাই বাঞ্জারাহিলে মহারাজার জন্য ছোট্ট একখানি বাড়ি করালেন, আর নিজের জন্য একখানি বাড়ি করলেন। মেহেদীভাইয়ের বাড়িটি হল এক অভিনব বস্তু। বড়ো একটা পাহাড় বেছে নিলেন তিনি। সেই পাহাড়ের পাথর কুঁদে কুঁদে গুহার মতো সব ঘর বানালেন। ভিতরে ঐ পাহাড়টাই রইল ঘরের দেয়াল ছাদ সব-কিছু হয়ে। শোবার ঘর বসবার ঘর

রান্নাঘর বারান্দা মিলিয়ে পাহাড়ের ভিতরে রইল পুরো বাড়িটা, আর বাইরের দিকে পড়ে রইল হুমড়ি-খাওয়া কালো প্রকাণ্ড পাথরটা।

গুরুদেব বাঞ্জারাতে এলেন মহারাজ কিষণপ্রসাদের বাড়িতে, আমরা রইলাম পাশে মেহেদীভাইয়ের গুহাবাড়িতে। গুরুদেব এখানে এসে খুব খুশি, নির্জনে নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকতেন বেশির ভাগ সময়ে।

এইখানে আসতেন মহারাজ কিষণপ্রসাদ গুরুদেবের কাছে। মহারাজার আসা-যাওয়া ছিল এক জমকালো প্রসেশন। মহারাজা পথে বের হবেন খবর রটতেই সারাপথে ভিড় জমে যেত। মহারাজা কোথাও যাবেন, সঙ্গে চলল দাসদাসীর দল পানের বাটা পিকদানি পাখা গড়গড়া হাতে নিয়ে; চলল পাত্রমিত্রের দল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ফিটফাট সাজে। পর পর নানা রঙের মোটরে উঠল সবাই। মহারাজা উঠলেন সকলের আগের মোটরে, বসলেন ড্রাইভারের পাশে, এখানেই বসেন বরাবর; হুঁকোবরদার নল এগিয়ে ধরে বসে রইল পিছনের সিটে। মহারাজের ডান হাতের কাছে থলি-ভরা আধুলি টাকা সিকি। মহারাজা মুঠো মুঠো থলি হতে তা তোলেন আর পথে ছড়ান। মোটর চলতে থাকে।

এই ছিল মহারাজা কিষণপ্রসাদের পথ চলার নিয়ম।

মহারাজা আসতেন বাঞ্জারাহিলে গুরুদেবের কাছে। মহারাজাও ছবি আঁকতেন জলরঙে। ঐ ছিল তাঁর শখ। আমাকে তাঁর হাতের আঁকা কয়েকখানা ছবি উপহার দিয়েছিলেন সে সময়ে। আছে আমার কাছে।

আকবর হায়দারি আসতেন, আরো কত লোক আসতেন, রোজ বিকেলের দিকে তাঁদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। গুরুদেব আছেন এঁদের অতিথি হয়ে, তাঁর আরাম-আনন্দের দিকে প্রখর দৃষ্টি এ দেশের মুরুব্বিদের সকলের।

বিখ্যাত বীনকার নিয়ে আসতেন মহারাজা, গুরুদেব বীণা শুনতেন। বাজনার শেষে চারমিনারের ছাপ তোলা গোটা গোটা মোহর মহারাজা ছুঁড়ে দিতেন ওস্তাদকে।

বড়ো স্নিগ্ধ খুশিমাখা দিনগুলি ছিল বাঞ্জারাহিলে।

সেই সেবারেই হায়দ্রাবাদে শুনেছি গুরুদেবের মুখে কবিতা আবৃত্তি। তখনকার যুগে মাইক ছিল না কথায় কথায় মুখের কাছে তুলে ধরতে।

চারি দিক খোলা প্যাণ্ডেলের নীচে জনসভা; হাজার হাজার নাগরিক

জড়ো হয়েছে গুরুদেবের বক্তৃতা শুনতে। বক্তৃতার পর তাদের শখ জানিয়েছে গুরুদেবের মুখে কবিতা আবৃত্তি শুনবে। গুরুদেব কবিতা পড়লেন, যেন গলার স্বরটা ছুঁড়ে দিলেন জনতার মাথার উপর দিয়ে এ দিক হতে একেবারে শেষ দিক পর্যন্ত। সে কি জোর গলায়, সে কি ঝংকার সুরে। বাংলা ভাষা কেউ জানে না, একটি কথাও বুঝতে পারছে না, কিন্তু কি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে সব। গুরুদেব যখন জলদনিনাদ স্বরে

ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা

বলে কবিতা শেষ করলেন, অনেক ক্ষণ অবধি সে শিহরনে নিশ্বাস স্থির হয়ে রইল সকল লোকের।

পরে শুনেছি অনেকবার কবিতা আবৃত্তি তাঁর মুখে, তবে অমনভাবে শুনি নি আর কখনো। সে সময়ে আরো দুটি কবিতা গুরুদেব প্রায়ই পড়তেন যখন শুনতে চাইত তারা, 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা নিশীথবেলা', আর, 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে'।

সেই হায়দ্রাবাদেরই আর-একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। কত ছোটো-খাটো ব্যাপারেও গুরুদেবের কত খেয়াল কত যত্ন থাকত দেখেছি।

মহারাজ কিষণপ্রসাদ বিরাট এক ব্যাঙ্কোয়েট দিলেন গুরুদেবের হায়দ্রাবাদ আগমন উপলক্ষে। আমরাও আছি তাতে। নিমন্ত্রণের দিন সকালে গুরুদেব বললেন, রানী, তোর কি কি শাড়ি আছে সঙ্গে আন্ তো দেখি সব। ভালো করে সেজে যেতে হবে আজ সেখানে।

শাড়ি য়া যা ছিল এনে ধরলাম গুরুদেবের কাছে। সব চেয়ে যে ভালো শাড়িখানি, গুরুদেব তা হাতে নিয়ে বললেন, এখানাই পরিস আজ সন্ধ্যায়।

বললাম, ব্লাউজ তো তৈরি নেই, পিস্‌টা এমনিই পড়ে আছে।

গুরুদেব ওঁকে ডাকলেন, ডেকে আদেশ দিলেন যেমন করে হোক একজন ভালো দরজি দিয়ে ব্লাউজটা বিকেলের মধ্যেই তৈরি করিয়ে আনতে।

তখনকার দিনে ইংরেজ রেসিডেন্টের প্রবল প্রতাপ হায়দ্রাবাদে। রেসিডেন্ট সস্ত্রীক আসছেন ব্যাঙ্কোয়েটে। আনুষ্ঠানিক ভোজ ইত্যাদি তখন নিখুঁত বিদেশী মতেই হত।

মহারাজের প্রাসাদে যেতে যেতে মোটরে গুরুদেব আমাকে শেখাতে শেখাতে

চললেন—যতক্ষণ না খাবার ডাক পড়ে আমার কাছাকাছি থেকো। আর, খাবার টেবিলে যাবার সময় যে ভদ্রলোক পাশে বসবেন তিনি তোমাকে হাতে ধরে টেবিলে নিয়ে যাবার জন্য তোমার হাত চাইবেন। সে-ই নিয়ম। তখন যেন আবার হাত সরিয়ে নিয়ো না। তার বাহুতে এমনি করে হাত রেখো। খাবার সময়ে ক্ষণে ক্ষণে টোস্ট করতে দাঁড়াবে সবাই। সকলে যা করে দেখে দেখে ঠিক তেমনটিই কোরো।

প্রাসাদে ঢুকবার আগে পর্যন্ত ধারণা করতে পারি নি যে কি ব্যাপার! ব্যাঙ্কোয়েট বলে কাকে। দেখে তো হতভম্ব আমি। রেসিডেণ্টের স্ত্রী জাঁকিয়ে বসেছেন গুরুদেবকে নিয়ে; সেইসঙ্গে প্রধান প্রধান অতিথিবর্গ। সন্ত্রস্ত আমি বারে-বারে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাই। বুঝতে পারি ঐ ভিড়ের মাঝেও গুরুদেব লক্ষ রাখছেন আমার প্রতি। কেবল তাই নয় দৃষ্টিতে যেন অভয়ও দিচ্ছেন আমায় কয়েকবার।

অর্কেস্ট্রা বাজছিল সমানে। এক সময়ে বাজনার সুরে সুরে তালে তালে উঠে পড়লেন সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে। গুরুদেব রেসিডেণ্টের স্ত্রীর হাত হাতে নিয়ে চললেন সকলের আগে আগে খাবার টেবিলের দিকে। পর পর চললেন আর-সকলে জোড়ে জোড়ে। দাঁড়িয়ে আছি, রাজা ধনরাজগিরি এসে হাত বাড়ালেন। এঁকে চিনি, দুদিন আগে এসেছিলেন ইনি গুরুদেবের কাছে। আশ্রমের জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পনেরো হাজার দিয়েছিলেন।

টেবিলে রাজা ধনরাজগিরির পাশেই বসলাম, বারে বারে উঠে সবার সঙ্গে টোস্টও করলাম, ভালো মতোই সব পারলাম।

বাড়ি ফিরে এসে গুরুদেব ওঁকে দিলেন এক প্রচণ্ড ধমক। বললেন, চুড়িদার আচকান আর টুপি এ হল ভারতীয় পোশাক। দেশী পোশাকে মাথায় টুপি না রাখা অভদ্রতা। বিলিতি পোশাকের বেলা তো তোমরা এমন কর না।

মস্ত হলের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত অবধি লম্বা খাবার টেবিল, শতাধিক লোক বসেছিল খেতে। কোনার দিকে বসেছিলেন উনি; খেতে খেতে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে একবার মাথার টুপি খুলে হাতে রেখেছিলেন মিনিটখানেক। গুরুদেব বসেছিলেন টেবিলের মাঝামাঝি রেসিডেণ্ট ওঁদের নিয়ে, সেখান থেকেই ঐটুকু শিথিলতা তাঁর নজর এড়াতে পারে নি সেদিন।

গুরুদেব বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিতে এক পরম বিস্ময়। তাঁর কথা কি আমি ধরতে পারি, না, বলতে পারি? আমি সেদিক দিয়েই যাব না। সে কথা বলবেন গুণীজ্ঞানীরা। আমি শুধু বলব সেই মানুষটির কথা, যে মানুষ আমার ঘরের পাশের মানুষ, আমার নিত্যপ্রতিবেশী, আমার সুখদুঃখের সাথী। যে মানুষ আমায় আগলে রেখেছিলেন আপন ছায়া দিয়ে, বাইরের ঝঞ্ঝাট তাপ হতে বাঁচিয়ে। কচিপাতার স্তবক হয়ে দুলেছি কেবল যাঁর প্রাণঢালা স্নেহে। চার বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি, কিন্তু পিতৃস্নেহের অবারণ দাক্ষিণ্য গুরুদেবের কাছেই পেয়েছি। সেই তাঁরই কথা কেবল বলব আমি।

কত দিকে লক্ষ থাকত গুরুদেবের। আমি বাড়িতে নেই, বন্ধু অতিথি এসেছেন বাড়িতে, নিজে খোঁজখবর নিতেন, কথা বলতেন, গল্প করতেন, কখনো কখনো খাওয়াতেনও তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে। আমি বাড়ি ফিরে এলে বলতেন, জানো, তোমার বাড়িতে আজ চীনে প্রফেসর তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছিলেন খানিক আগে। আমি ওদিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলুম, ওদের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে তোমার বাড়িতে থেমে তোমার হয়ে গল্পগুজব করলুম। ওদের বললুম, তোমরা যদি গৃহস্বামিনীর জন্য অপেক্ষা কর তবে ভুল করবে। তিনি এখন কোথায় গেছেন কখন ফিরবেন তার কি কিছু স্থিরতা আছে? বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমার এই মোটরে করে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

উত্তরায়ণে কোনার্কই কোণের বাড়ি। তার পাশে প্রায় গায়ে লাগা মৃন্ময়ী— মাটির দেওয়াল খড়ের চাল, বাংলো ধরনের বাড়ি। এই মৃন্ময়ীতে এসে বিয়ের পর আমরা নতুন সংসার পাতলাম। একখানি মাত্র ঘর, ঘরের আধখানা জুড়ে ফরাশ পাতা, দিনের বেলা বসি, রাত্রে তার উপরে বিছানা পেতে সেটাই শোবার ঘর করি। আর বাকি আধখানায় খাবার টেবিল সাজানো থাকে। ঘরের তিন দিকে বারান্দা; এক দিকের বারান্দা ঘিরে স্নানের ঘর; কাপড় রাখবার ঘর, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোটো খুপরি; ভাঁড়ার রাখি আর স্টোভে তোলা-উনুনে সেখানে রান্না করি। গুরুদেব থাকেন কোনার্কে, ধরতে গেলে একই বাড়ি, মাঝখানে মাত্র তিন হাত চওড়া লাল

কাঁকর ফেলা সরু পথটুকু। নাওয়া খাওয়া ঘুম ছাড়া বাকি প্রায় সব সময়টা গুরুদেবের কাছাকাছি থাকি। যেটুকু সময় না থাকি তিনি জানেন কোথায় আছি, কেমন আছি, কি কাজ করছি।

বরাবর দেখেছি আশ্রমে কোনো অতিথি এলে গুরুদেব তাকে আপন ঘরের অতিথি বলেই জানতেন; নিজে তার সুখসুবিধের খবরাখবর নিতেন ক্ষণে ক্ষণে, একে ওকে অতিথির কাছে পাঠাতেন। যেন তাঁর বিভুঁই বলে না মনে হয় আশ্রমকে, অপরিচয়ের আভাস না জাগে মনে। আমাদেরও তিনি শেখাতেন সে ভাবে। এমন-কি, বিদেশী ছাত্রছাত্রী যারা আসত তাদের সম্বন্ধে বলতেন, দেখ্, এরা সব দূর দেশ থেকে এসেছে। এরা যে আপন আপন ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশে এসেছে সেটা যেন বুঝতে না পারে। এরা যেন আপন গৃহ পায় তোদের ঘরে ঘরে, এইটে দেখিস।

বলতে বলতে মনে পড়ল একবার আমাদের এক বন্ধু অতিথিকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল। মৃন্ময়ীতে সংসার পাতবার দিন-কয়েক বাদে একদিন মাঝরাত্রির ট্রেনে আমার স্বামীর এক বন্ধু হঠাৎ এসে উপস্থিত। বিলেতে পড়তে পড়তে দু মাসের ছুটিতে দেশে এসেছেন, শুনেছেন অনিল বিয়ে করেছে —নতুন বউ দেখতে তক্ষুনি ছুটলেন।

রাত-দুপুরে দুই বন্ধুতে হৈ-হৈ আহ্লাদ। যা ছিল ঘরে খাবার তাই খাইয়ে তাঁকে শুতে দেওয়া হল সামনের বারান্দায়। পরদিন ভোরের গাড়িতেই ফিরে যাবেন তাই এক কাপড়েই চলে এসেছেন। রাত্রে প'রে শোবার জন্য উনি আমার একখানি ছাপানো শাড়ি দিলেন বন্ধুকে লুঙ্গির মতো করে পরতে। বন্ধুও তাই পরে শুয়ে পড়লেন, আমরা ঘুমালাম ঘরে।

মৃন্ময়ীর বারান্দার পাশ ঘেঁষে কোনার্কের পুব-বারান্দা পুবের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। গুরুদেব ভোর রাত্রে উঠে এসে রোজ বসেন এই পুব-বারান্দায়। সেদিনও এসে বসলেন। তখনো চার দিক আবছা অন্ধকার। বনমালী গুরুদেবের চা এনে সামনের টেবিলে সাজাচ্ছে। গুরুদেব একবার এদিকে তাকিয়ে দেখলেন মৃন্ময়ীর বারান্দার খাটে মশারি ফেলা। বুঝলেন কোনো অতিথি এসেছেন গত রাত্রে। দেখে গুরুদেব একবার কাশলেন। গুরুদেবের সাড়া পেয়ে বন্ধু জাগলেন, জেগে উঠে বিছানার

উপরেই বসে রইলেন। মশারির ভিতর তাঁকে বসে থাকতে দেখে গুরুদেব ডাক দিলেন, ওহে অতিথি, তুমি আমার সঙ্গে চা খাবে এসো।

অতিথি আসবেন কি করে গুরুদেবের সামনে? পরনে যে তার বোম্বাই প্রিন্টের রঙচঙে শাড়ি। কিছু না বলে মশারির ভিতরেই নড়েচড়ে বসলেন।

গুরুদেব আবার ডাকলেন, এসো অতিথি, উঠে এসো। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বন্ধু তেমনি অবস্থায় বিছানায় বসে উসখুস করতে লাগলেন। আমরা প্রথম থেকেই সব টের পাচ্ছিলাম, আর মজা দেখছিলাম। এদিকে ঘরের দরজা বন্ধ, সে যে ঝট্‌ করে এক ঝাঁকে নেমে ঘরে ঢুকে সাজ বদলে নেবে সে উপায় নাই। এ অবস্থায় মশারি তবু তো একটা আবরণ।

ওদিকে গুরুদেব বলছেন, ওহে অতিথি, শোনো; গৃহস্বামিনীর উঠতে এখনো অনেক দেরি। বুদ্ধিমান হও তো চলে এসো এখানে। গৃহস্বামিনীর হয়ে অতিথিসেবা এ আমি করেই থাকি। এসো এসো, লজ্জা নেই এতে।

গুরুদেব ডেকেই চলেছেন।

জাগ্রত অবস্থায় বিছানায় বসে আছে অথচ গুরুদেবের ডাকে সাড়া দিতে পারছে না, উঠে দাঁড়াচ্ছে না, এক মহাসংকটজনক অবস্থা তার তখন। গুরুদেবই বা কি মনে করছেন। বন্ধু প্রায় কাঁদো-কাঁদো। চাপা স্বরে ঘরের ভিতরে ওঁকে উদ্দেশ করে কেবলই বলছেন, এই অনিল, জাগ-না ভাই, ওঠ-না একবার ঘরের দরজাটা খুলে দে-না।

আর গুরুদেব বলছেন তাকে, আর কেন দেরি করছ অতিথি এসো এবারে।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর উনি উঠে দরজা খুলে দিলেন। বন্ধু এক লাফে ঘরে ঢুকে সাজ বদল করে নিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে চা খেতে বসল। একটু পরে উনিও গিয়ে যোগ দিলেন। তার পর শাড়ির রহস্য নিয়ে হাসাহাসির একটা ধুম পড়ে গেল কোনার্কের বারান্দায়।

একদিনের জন্য এসে বন্ধু সেবার ছ সপ্তাহ কাটিয়ে গেলেন আশ্রমে। দু বেলা গুরুদেবের কাছেই চা খেতেন, চা খেতে খেতেই কত নতুন গান শিখতেন সেবারে। গানের দরাজ গলা ছিল বন্ধুর। গুরুদেব তাঁর গান শুনে খুশি হতেন। প্রতাপ বসু তাঁর নাম, কিছুদিন আগেও কলকাতায়

পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন।

আমাদের কাছে কোন্ অতিথি এলেন, কখন এলেন, তাদের খাবার কি ব্যবস্থা হল, সব-কিছুর খোঁজ রাখতেন গুরুদেব। পর পর জুতোর সারি বারান্দায় দেখেই বুঝতেন। বউঠানকে বলতেন, অনেক অতিথি এসেছে ওদের ঘরে, রানী একলা পেরে উঠবে না— তুমি বরং কিছু রান্না করিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো, বউমা।

কখনো নিজের খাবার হতে মাছের বাটি তরকারির বাটি পাঠিয়ে দিতেন আমাদের ঘরে।

মৃন্ময়ীর সেই একটি ঘরেই কত অতিথি আসতেন আমাদের। অতিথি বরাবরই এসেছেন, তবে গুরুদেব যতদিন আমাদের মাঝে ছিলেন অতিথির যেন স্রোত বইত। সংসার যেন অতিথিরই জন্য; এইটেই ধরে নিয়েছিলাম। মনে পড়ে, দলে দলে জানা অজানা অতিথি এসেছেন, ফরাশ জুড়ে তাঁদের বিছানা করে দিয়েছি; নিজে ভাঁড়ার ঘরে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি— জানালার ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হাওয়ায় হাড়কাঁপানো শীত, তাই-বা কত মধুর ছিল। কারণে অকারণে কত হাসতাম, প্রাণে আনন্দ যেন টগবগ করত। কত সহজে তখন তুচ্ছকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি; নিজের অজানিতেই করেছি। সব পেরেছি— কেবল গুরুদেবের স্নেহের জোরে।

ছোট্ট সংসার, তারই মধ্যে নতুন একটা-কিছু করলে সকলের আগে তা গুরুদেবকে দেখানো চাই। কি উৎসাহই না তিনি দিতে পারতেন। সামান্য ব্যাপার— কোদাল দিয়ে একটু একটু করে মাটি খুঁড়ি রোজ, বাগান করব। কাঁকর মাটি, কি লাগানো যায় এতে ?

এক দুপুরবেলা গুরুদেব এলেন আমাদের ঘরে, হাতে এক মাসিক পত্রিকা। বললেন, দেখ্, এতে চাষ সম্বন্ধে একটা ভালো প্রবন্ধ আছে।

বসে বসে আমাকে আগাগোড়া প্রবন্ধটি পড়ে শোনালেন। অনেক আলোচনা পরামর্শও হল। শেষে ঠিক হল যে, প্রথমে চীনেবাদাম লাগানো হবে জমিতে। চীনেবাদামের শিকড়ে এমন জিনিস আছে যা নাকি মাটিকে উর্বরা করে। চীনেবাদাম উঠে গেলে সেই জমিতে ফুল সবজি লাগাব। লাগিয়েওছিলাম তাই। কিন্তু, কি গভীর গবেষণা হয়েছিল সেদিন দুপুরে আমাদের দুজনের—

তাই ভাবি আজ। কতটুকুই-বা জমি আর কিই-বা তার ফলাফল তবু সেটুকুর জন্যই সেদিন গুরুদেব পুরো দুপুরটা দিয়ে দিলেন।

বড়ো বড়ো গাছ গুরুদেব খুব পছন্দ করতেন। বলতেন, আমি ভালোবাসি অরণ্য— বড়ো বড়ো গাছ, বনস্পতি। তার ছায়া প্রাণ মাতিয়ে তোলে। অনেকে আবার তা সহ্য করতে পারেন না; যখনই দেখেন গাছ বড়ো হল, অমনি কাট তাকে। ঐ একটু একটু গাছে একটু একটু রঙ নিয়েই তারা খুশি। আশ্চর্য, বড়ো গাছের মাথায় যখন মেঘ করে আসে, তার সৌন্দর্যের কি তুলনা হয়— যখন সেই মেঘের ছায়া এসে পড়ে ঐ একটু একটু গাছের উপরে— তার সঙ্গে?

বর্ষার জল পেয়ে মাটির তলার কবেকার কোন্ শুকনো বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এখানে-ওখানে মাথা তুলত; গুরুদেব খুব খুশি হয়ে উঠতেন, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। সেই সেই গাছ সেখানেই বাড়তে দিতেন। বড়ো গাছ কেউ কাটলে তিনি প্রাণে ব্যথা পেতেন। আগে আশ্রমে আতা গাছ ছিল না। আতা যে এ মাটিতে হতে পারে তা জানা ছিল না কারো। একবার দু-তিনটে আতা গাছ হল উত্তরায়ণে, খুব ভালো আতা ফলল। গুরুদেব আতা খেয়ে বীজগুলি প্লেটে না রেখে হাতে নিয়ে দু দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। বলতেন, হোক গাছ— যেখানে যেখানে ঠাঁই পাবে শিকড় মেলুক এরা; পথ-চলতি লোকেরাও তুলে নিয়ে খাবে একদিন এ ফল।

সেই বীজ হতে পরে অনেক গাছ হয়েছিল উত্তরায়ণে। শ্যামলীর ধারে এক সময়ে আতা গাছের বেড়াই তৈরি হল গুরুদেবের ফেলা বীজ হতে। কত তাল, জাম, হিমুঝুরি, মহানিম হয়েছে এখানে-ওখানে আশ্রমে বর্ষার জলে আপনা হতে। কোনার্কের সামনের বারান্দার ঠিক সামনে উঠল এক শিশু শিমুল এক বর্ষার শেষে। গুরুদেব দেখে খুব খুশি। দিনে দিনে তাকে লালন করেন, গোড়ায় সার জল নিয়মিত ঢালান। রথীদার ভয়, শিমুলগাছ আকারে বেজায় বাড়ে, আর তেমনই তার পল্‌কা দেহ। ঝড়ে হাওয়ায় ভেঙে যদি পড়ে কখনো, বারান্দার ছাদ যাবে ধসে। গাছটাকে ওখানে হতে না-দেওয়াই ভালো।

গুরুদেব দুঃখ পান শুনে। দিনে দিনে সে গাছ মাথা ছাপিয়ে ওঠে। আর এক বর্ষায় মালতীলতা দেখা দেয় তার তলায়, গুরুদেব মালতীর লিকলিকে

কচি লতাটি তুলে জড়িয়ে দেন কিশোর শিমুলের গায়ে। লতা বেড়ে উঠুক আশ্রয় পেয়ে। সেই শিমুল শেষে একদিন মহীরুহতে পরিণত হল। মালতী তার সর্বাঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে আজও। এই শিমুলের ছায়ায় গুরুদেব কত সকালে কত বিকেলে বসে চা খেয়েছেন, গল্প করেছেন। মাথার উপরে ডালে ডালে কচি পল্লব দুলেছে, মাটিতে শিমুল ফুল লুটিয়ে পড়েছে, ফল ফেটে হাওয়ায় তুলোর ঝরনা ঝরেছে। বর্ষায় শুভ্র মালতী লাল কাঁকরের উপর সাদা গালিচা বিছিয়েছে। এই মালতীকে নিয়েই গুরুদেব গান গেয়েছেন, 'তব ভবনদ্বারে রোপিলে যে মালতী সে মালতী আজি বিকশিতা'।

বারান্দার একপাশে ছিল নীলমণি লতা, এধারে ওধারে মধুমালতী, ছিল কুঁচি গোলক হেনার মঞ্জরী। সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে যেন থাকতেন তিনি। কার কবে কুঁড়ি এল, কে কবে ফুল ফোটাল, কখন তারা কোন্ সময়ে পাতা ঝরিয়ে দিল, দিনে দিনে চেয়ে দেখতেন। যেন কথা কইতেন তাদের সঙ্গে। যেন তারা ছিল তাঁর বড়ো আপন জন।

মধুমালতীর কথায় মনে পড়ল একদিনের এক ছবি— সে অতি সুন্দর। জাপান হতে এক অতিথি-দম্পতি এসেছেন আশ্রমে। গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে তারা জাপানী প্রথায় 'টি সেরিমনি' করে চা খাওয়াবেন তাঁকে। কোনার্কের সামনের বারান্দায় সতরঞ্চি চাদর বিছিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃন্ময়ীর বারান্দায় বসে 'বাতিক' করতে করতে দেখছিলাম। গুরুদেব ডাক দিয়ে কাছে নিলেন। জাপানী-রীতি-মতো বসলাম সকলে চাদরের উপরে। আসন করে বসতে গুরুদেবের খুব কষ্ট হত, হাঁটুতে লাগত। কিন্তু বিদেশী অতিথি ব্যথা পাবে মনে— গুরুদেবও বসলেন এসে সেখানে।

জাপানী ভদ্রমহিলা জাপানী ট্রেতে উনুন কাঠকয়লা কেটলি পেয়ালা সাজিয়ে এনে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধাভরে একটি একটি করে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে ছোট্ট একটি কেটলি চাপিয়ে চায়ের জল গরম করতে লাগলেন। স্থিরভাবে সবাই তাকিয়ে দেখছেন তা। দেখবারই জিনিস। গুরুদেবও দেখছেন। কিন্তু আমি সেদিন কেবল গুরুদেবকেই দেখছিলাম চেয়ে।

বারান্দার পুব দিকে ছিল মধুমালতীর লতা। ছাদে-বেয়ে-ওঠা লতার অনেকগুলি ডগা এদিকে ওদিকে ছড়িয়েছিল হাওয়ায় ভর দিয়ে। তারই একটি ডগা গুচ্ছ গুচ্ছ লাল সাদা ফুল নিয়ে গুরুদেবের পিঠে মাথায় কপালে যেন

ছোঁয়াছুঁয়ি খেলে চলছিল। সে যে কি সুন্দর লাগছিল দেখতে। কতকাল পর্যন্ত সুন্দর কিছু মনে করতে গেলেই এই ছবিটি মনে এনেছি।

সেই বারান্দায় কত সভা গান রিহার্সেল— কত কিছু হয়েছে। দেশ-বিদেশের কত লোক এসেছে সেখানে গুরুদেবের কাছে।

একবার এক বিদেশী এলেন গ্রামোফোন আর রেকর্ড নিয়ে, গুরুদেবকে তাঁদের দেশের গান শোনাবেন। কেউ কারো ভাষা জানেন না, আকারে-ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। বিদেশীর মুখের কথাতেই উঁচুনিচু হরেক স্বর। সূচনাতেই প্রমাদ বুঝতে পেরে গুরুদেব সামলে দিলেন আমাদের, বললেন, দেখো গান শুনে হেসে ফেলো না যেন। তা হলে এ কি মনে করবে বলো ?

রেকর্ড বেজে উঠতেই অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠল। গুরুদেব বলেছেন না-হাসতে ; প্রাণপণে হাসি চেপে আছি, কতক্ষণ থাকতে পারব এ ভাবে তাই ভাবছি। গুরুদেব আগে হতেই বুঝে নিয়েছিলেন এমনটিই ঘটবে গান শুনে।

এরকম বহু ঘটনায় বহুবার এভাবে হেসে ফেলেছি। গুরুদেব কিন্তু রাগ করতেন না তা নিয়ে।

কোনার্কের বারান্দা। জওহরলালজী কমলাদেবী এলেন আশ্রমে ; কোনার্কে থাকতেন। এই বারান্দায়ই বসে তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে গল্প করতেন, কাছে বসে আমি জওহরলালজী ও গুরুদেবের পোর্ট্রেট্ স্কেচ করতাম। অতি সহজ ওঠা-বসার স্থান ছিল কোনার্কের লাল বারান্দা। বিদেশী মান্যগণ্য অতিথি সুজন এসেছেন, এই বারান্দায় চায়ের টেবিল পাতা হয়েছে। বারান্দার সামনে দিয়ে মৃন্ময়ীতে যাওয়া-আসার পথ। ছবির কাজ সেরে কলাভবন হতে মীরাদির বাড়ি হয়ে পোড়া ভুট্টা হাতে নিয়ে খেতে খেতে বাড়ি ফিরছি, গুরুদেব ডাকলেন, যাও কোথা, এসো এঁদের চা ঢেলে খাওয়াও।

আধ-খাওয়া ভুট্টা পথে ফেলে আঁচলে হাত মুছে অতিথিদের চা ঢেলে দিয়েছি। সহজ ভঙ্গি। কোনো-কিছুতে আড়ষ্ট হতে দেন নি তিনি কোনো দিন। তা বলে শাসন যে ছিল না— তা নয়। কোথাও কোনো কর্তব্যের ত্রুটি বা অবহেলা দেখলে ক্ষমা করতেন না। মনে আছে, সেই সেবারে হায়দ্রাবাদ

হতে ফিরবার পথে ট্রেনে এক জায়গায় দুপুরবেলা, গুরুদেব ছিলেন পাশের কামরায়, আর এই কামরায় ছিলাম আমি উনি ও কালীমোহন ঘোষ মশায়। কালীমোহনবাবু কয়েক স্টেশন আগে নেমে গুরুদেবের কামরায় গিয়েছিলেন। দুপুরের খাবার সময় হল; আমরা দুজনে খেয়ে নিলাম। ধরে নিয়েছিলাম কালীমোহনবাবু গুরুদেবের কাছেই খাবেন দেরি যখন করছেন। পরে তা নিয়ে গুরুদেব খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আমার উপরে, যে, আমি মেয়েমানুষ, আমি কি বলে নিজে খেয়ে নিলাম, কালীমোহনবাবু খেলেন কি না-খেলেন সে খোঁজ না নিয়েই। আমার সেই ত্রুটির কথা ভেবে আজও আমি সংকুচিত হয়ে উঠি।

ক্ষমাও ছিল তাঁর কাছে। কত অপরাধ যে ক্ষমা করতে দেখেছি তাঁকে।

একবার আশ্রমের এক বিভাগের এক অধ্যক্ষ একটি ছেলেকে শাস্তি দিলেন। ছেলেটির দোষও ছিল, শাস্তিও একটু কঠিনই হল। গুরুদেবের কানে এল কথাটা। তিনি ব্যথা পেলেন। সেই অধ্যক্ষের নাম করে বললেন, ওরা কি জানে না, এর চেয়েও কত বড়ো বড়ো অপরাধ ওদের আমি ক্ষমা করেছি।

আশ্রমে ছোটোবড়ো সকলের সব-কিছুতে ছিলেন গুরুদেব। তাঁকে না হলে চলত না। বয়স্করা সকাল-বিকেলে বেড়িয়ে ফিরবার পথে গুরুদেবের কাছ হয়ে যেতেন। ছেলের দল বর্ষার জলে ভিজতে বের হল, গুরুদেবের কাছে এসে ভিজতে ভিজতেই উল্লাস জানিয়ে গেল। পিকনিক হতে ফিরছে সবাই 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাইতে গাইতে; তারা গুরুদেবকে দেখা দিয়ে তবে ঢুকল আশ্রমে। আশ্রম ঘুরে যে বৈতালিক বের হয় সে বৈতালিক সম্পূর্ণ হয় গুরুদেবের দোরগোড়ায় এসে। ফুটবল খেলল, হারজিত যার যা হল দুই দলই প্রসেশন করে গুরুদেবের কাছে এল, তবে খেলা সাঙ্গ হল। টুর্নামেণ্টে 'কাপ' পেল যে দল, পেল না যে দল, সবাই মিলে খাওয়া আদায় করল বোঠানের কাছে। এ-সব যেন স্থির করাই ছিল।

ফুটবল খেলার কথায় একবারের কথা মনে আসছে। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হতে ফুটবল টিম এল আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে। উৎসাহী অপূর্বদা নিয়ে এসেছেন তাদের। ইনি তখন সে কলেজের প্রিন্সি-প্যাল। তখনকার দিনে বাইরে হতে আশ্রমে কোনো দল খেলতে এলে সাড়া

পড়ে যেত। আশ্রমের ভিতরে খেলার মাঠ, উত্তরায়ণ হতে অনেকটা দূরে। কিন্তু খেলা বেশ টের পাওয়া যায় ঘরে বসেই। এক-একটা গোল হতেই সোরগোলের যে রব উঠত তাতেই বোঝা যেত কোন্ পক্ষ জিতল। বলা বাহুল্য, আশ্রম জিতলে হল্লাটা একটু প্রচণ্ডই হত। সেদিনও খেলা শুরু হল। কিছুক্ষণ খেলতে-না-খেলতে হৈ-হৈ করে একটা জোর হল্লা উঠল। আশ্রমের যে যেখানে ছিলাম বুঝলাম আশ্রম এক গোলে জিতল। খুব খুশি আমরা। গুরুদেবও। খানিক বাদে আর-একটা হল্লা। দু গোলে জিতল আশ্রম। খানিক বাদে আর-একটা হল্লা, তিন গোল। গুরুদেব এবার একটু উসখুস করে উঠলেন। খানিক বাদে আর-একটা হল্লা— আর-একটা, আর-একটা; পর পর আটটা হল্লা হল। গুরুদেব রেগে উঠলেন, বললেন, এ হচ্ছে বাড়াবাড়ি। বাইরের ছেলেরা খেলতে এসেছে, হারাতে হয় এক গোল কি দু গোলে হারাও। তা নয়, পর-পর আট গোল। এ দস্তুরমত অসভ্যতা।

সেবারে গুরুদেব জল জল করে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কেবলি পদ্মার চরে 'বোটে' থাকার কথা বলেন, ভাবেন। শেষে ঝুঁকেই পড়লেন এবারে কিছুদিন বোটে থাকবেন। কিন্তু কোন্ স্রোতে থাকবেন! শিলাইদতে আর সম্ভব নয়। অনেক ভেবে পরামর্শ করে গঙ্গার উপরে বোটে থাকা স্থির হল। কলকাতা হতে চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ডে ঢুকতে প্রথমেই যে একটা লালবাড়ি, ঐ একটি মাত্র বাড়িই যা নাকি একেবারে গঙ্গার উপর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, সেই বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। আর, বাড়ির বাঁধানো ঘাটে গুরুদেবের বিখ্যাত বোট নিয়ে আসা হল।

গুরুদেব এলেন সেখানে নিরিবিলিতে থাকতে, কেবলমাত্র ওঁকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গরমের ছুটিতে।

লাল ইটে গাঁথা লালবাড়ি, বাড়ির ঘাটে গঙ্গা ছলছল করে দিবারাত্রি। ঘাটের পাড়ে প্রকাণ্ড বটগাছ, তলা দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে জলে, জলের শেষ সিঁড়ির গা লাগিয়ে বোট বাঁধা ঘাটে। গুরুদেব রাত্রে বোটে ঘুমোন, ভোরে বাড়িতে উঠে আসেন। ক্লান্ত গুরুদেব বিশ্রাম নিতেই এসেছেন এখানে। গঙ্গামুখী লম্বা বারান্দা, সেখানে লম্বা বেতের সোফায় আধশোয়া হয়ে গুরুদেব গা এলিয়ে বসে থাকেন। পাশে মাটিতে বসে থাকি আমি। গুরুদেব চেয়ে থাকেন গঙ্গার দিকে। এমনি কাটল কয়দিন। কোনো কিছু রচনায় হাত দিলেন না।

বিয়ের পরও নিয়মিত ইংরাজি পড়াতেন আমায় গুরুদেব। এখানে আসার ব্যাপার নিয়ে কয়দিন বাধা পড়েছিল। গুরুদেব বললেন, দাঁড়া, আগে সেইটে পূরণ করে নিই। কি বই ধরা যায়? তখন ম্যাক্সিম গোর্কির *My University Days* বইখানা নতুন এসেছে তাঁর কাছে। বললেন, ওখানাই আন, আমার পড়া হয় নি, তোকে পড়াতে পড়াতে আমারও পড়া হয়ে যাবে।

গুরুদেব পড়ে যেতেন বই, আমি বসে বসে শুনতাম। আমার মুখ দেখেই তিনি বুঝে নিতেন, কোন্ জায়গায় বুঝতে আমার আটকে গেল। সেই জায়গাটা ফিরে পড়তেন, মানে বলে বুঝিয়ে দিতেন।

ধারে-কাছে অন্য কেউ নেই। বাইরের লোকের ঝামেলা নেই। উনি

সেক্রেটারি— গুরুদেবের 'ডাক' বাছা, চিঠির জবাব দেওয়া, এটা-ওটা টাইপ করা, এ সবেই ওঁর দিনের এবেলা ওবেলা কেটে যেত। একা আমি, গুরুদেবই আমার সঙ্গী। ছেলেমানুষী মন আমার, সেই মনের মতো করে কত গল্প শুনিয়ে সময়টা আমার ভরিয়ে দিতেন তিনি। কত হেসেছি সে গল্প শুনে, কত খুশি হয়ে উঠেছি। তাঁর সেই বলার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি, ভাবের ভঙ্গি— সব চোখে ছবি হয়ে আছে।

এক-এক দিন দাশরথি রায়ের পাঁচালি বলতেন। বলতেন, আমাদের কালে সে কি সমাদর দাশরথি রায়ের পাঁচালির, সবাই আহা আহা করত। বলেই সুর ধরতেন—

ওরে রে লক্ষ্মণ,
এ কি অলক্ষণ
হল, দেরি বিলক্ষণ
ত্বরা জানকীরে দিয়ে এসো ব—ন।

এমন ভাবে ভুরু কুঁচ্‌কে মুখ তুলে মাথা নেড়ে ব—ন বলে গান শেষ করতেন, হাসতে হাসতে গড়াতে থাকতাম। গুরুদেব হেসে আবার ছড়া ধরতেন।

কখনো-বা বলতেন, সেই-সব দিনের কথা। এই গঙ্গার ধারেই আর-একটু ওদিকে এক বাড়িতে— সে বাড়ি আমিও দেখেছি, আমাদের এই লালবাড়ি হতে আরো এগিয়ে, সে বাড়ি ভেঙে গিয়ে বনজঙ্গলে ঢেকেছে এখন। গুরুদেব বলতেন, সে বাড়িতে জ্যোতিদাদা নতুনবউঠান আর আমি এলাম থাকতে। গঙ্গা সাঁতরে তখন এ পার ও পার হতাম। নতুন-বউঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। কত বেড়িয়েছি নতুনবউঠান আর আমি বনে জঙ্গলে, কত কুল পেড়ে খেয়েছি। বিদ্যাপতির অনেকগুলি গানে সুর দিই আমি সে সময়ে। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'— এ গানে এখানেই সুর দিই। সুর দিয়েই নতুনবউঠানকে শোনাতুম। খুব ভালোবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালোবাসতেন। এই ভালো-বাসায় নতুনবউঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন।

গুরুদেব বলতেন, দেখ্, মরে যে যায়, সে যায়ই। আর তাকে দেখতে

পাওয়া যায় না। শুনতাম, ডাকলে নাকি আত্মা এসে দেখা দেয়। সে ভুল। নতুনবউঠান মারা গেলেন, কি বেদনা বাজল বুকে। মনে আছে সে সময়ে আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছি, 'কোথায় তুমি নতুনবউঠান, একবার এসে আমায় দেখা দাও।' কতদিন এমন হয়েছে— সারারাত এ ভাবে কেটেছে। সেই সময়ে আমি এই গানটাই গাইতুম বেশি, আমার বড়ো প্রিয় গান, বলে গেয়ে উঠেছেন—

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে—
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

তিনি বলতেন, দেখ্, মজা এই, যে মরে যায় তার আর বয়স বাড়ে না। আমার নতুনবউঠান— তিনি সেই ঐটুকু মেয়েই রয়ে গেলেন। আর আমি কত বুড়ো হয়েছি, ঝুঁকে পড়েছি।

মনে আছে, রোগশয্যায় গুরুদেব উদয়নের দোতলা ঘরে একদিন আবার নতুনবউঠানের কথা বলতে বলতে বলে উঠলেন, বউমা, আমায় নতুনবউঠানের একটি ফোটো এনে দেখাও-না একবার।

বোঠান তখুনি উঠে এ ঘর ও ঘর এ আলমারি সে আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করলেন, কিন্তু সেই সময়ে সেই মুহূর্তে নতুনবউঠানের ছবি পাওয়া গেল না হাতের কাছে। পাওয়া গিয়েছিল তিনি চলে যাবার পর— মনে আছে।

নন্দননগরে অনেক সময়ে গুরুদেব গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক-এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তেন; আবার চোখ মেলতেন, আবার বুজতেন। হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ত তাঁর শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু এ পাশ হতে ও পাশে। বহুক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখতাম আমি।

দৈনন্দিন ছোটোখাটো তুচ্ছ ঘটনা— এ দিয়েই মানুষ মানুষের অন্তরের গভীরতম স্নেহমমতার পরিচয় পায় বেশি করে। এ জীবনে সারাদিনের নানা কাজের অন্তরালে গুরুদেবের এমনিতরো সুগভীর স্নেহস্পর্শ কতবার পেয়েছি।

সেবার চন্দননগরেই একদিনের এক ছোট্ট ঘটনা— গুরুদেব বোটে ঘুমোতেন,

ভোরে বাড়িতে উঠে আসতেন, সারাদিন বাড়িতেই থাকতেন। কয়দিন এমনিভাবে কাটবার পর রোজ সিঁড়ি ভেঙে নীচে যাওয়া, আবার উপরে উঠে আসা— গুরুদেবের বিরক্তি এল তাতে। বললেন, তোরা গিয়ে এবার হতে বোটে ঘুমো, আমি বাড়িতেই থাকব।

সেদিন হতে রাত্তিরে গুরুদেব বিছানায় গেলে পর আমরা বোটে চলে যেতাম, ভোরে উঠে আসতাম।

একদিন এক বিশেষ কাজে সেক্রেটারি সকালের ট্রেনে কলকাতায় গেলেন, সেইদিনই ফিরে আসবেন মাঝরাত্রির এক ট্রেনে। সেদিন সন্ধের পর গুরুদেব আর আমি বারান্দায় বসে গল্প করছি, রাত জমে এল, ঘুম পেতে লাগল, গুরুদেবকে বিছানায় দিয়ে আমি বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখনকার দিনে ভয়ভাবনা বলে কিছু ছিল না। দরজা-জানালা খোলাই থাকত। দেয়াল-ঘেরা বাড়ির ভিতরে খোলা আঙিনা, খোলা বারান্দা ; দিনে-রাতে একইভাবে যেখানকার যা তেমনিই পড়ে থাকত ; চিন্তার কারণ থাকত না।

গুরুদেবের ঘরের খোলা দোরের কাছেই আমার খাটিয়া। খানিক বাদে উনি কলকাতা হতে ফিরে এলেন। পাছে সাড়া-শব্দে গুরুদেবের ঘুম ভেঙে যায় পা টিপে টিপে আমরা বোটে চলে গেলাম। গভীর রাত্রে বৃষ্টি এল। গুরুদেবের ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন ভোরে যখন উঠে এলাম বোট হতে বাড়িতে, গুরুদেব বললেন, জেগে আমার ভাবনা হল, অনিল এল কি না-এল ; ভাবলাম রানীর যা ঘুম, হয়তো সে বৃষ্টিতে ভিজছে শুয়ে শুয়ে। টর্চ হাতে উঠে এলাম বারান্দায়। 'রানী' 'রানী' বলে টর্চ ফেলে এ বারান্দা ও বারান্দা খুঁজছি কোথায় গেল ও। এমন সময়ে বনমালী উঠে এসে বললে, তেনারা তো বোটে চলে গিয়েছেন অনেকক্ষণ হল।

গুরুদেব একবার বিছানায় শুয়ে পড়লে ঝট্ করে আবার ওঠা— এ বড়ো কষ্টকর ছিল তাঁর পক্ষে। ওঠাবসায় চলাফেরায় বিশেষ ক্লান্তি বোধ করতেন। সেই গুরুদেব ঐ রাত্তিরে টর্চ নিয়ে লম্বা বারান্দা ছোটো বারান্দা, এ ঘর ও ঘর ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সে ছবি চোখে না দেখেও স্পষ্ট দেখি আজও।

চন্দননগরের এ বাড়িটা অন্যান্য বাড়ি হতে একটু আলাদা রকমের।

আঙিনায় একধার ঘেঁষে পর পর একসারি ঘর। দোতলা ঠিক পথে গিয়ে মিশেছে, নীচের তলা মাটির তলে, জোয়ারে গঙ্গার জল চলে আসে সেখানে। সে তলায় যেত না কেউ বড়ো, প'ড়ো হয়েই থাকত। আমরা আসবার পর হঠাৎ একদিন কোথা হতে এক মেথর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে বাস করতে লাগল একতলার ঘরে। এই মেথর নাকি একসময়ে জাহাজে কাজ করত, দেশ-বিদেশ বহু ঘুরেছে সে। অবসর সময়ে বনমালীর সঙ্গে খুব গল্প জমত তার নানা দেশের কাহিনী নিয়ে। বনমালী গুরুদেবের খাস নোকর, সে হার মানবে কেন? সেও ভারিক্কি চালে বলতে থাকত— আমি যখন সেবার বাবামশায়ের সঙ্গে বোম্বাই গেনু—

মেথর বলত, আরে, রেখে দাও তোমার বোম্বাই। ব'লে হাতে হাতে চাপড় মেরে এক ধাক্কায় তার কথা ঠেলে দিত। বলত, আমেরিকা দেখেছ? ইংলণ্ড? বাড়ি কি এক-একটা সেখানে, আরে বাপ্ রে—

বনমালী বেচারি চুপসে যেত। তার দৌড় বড়োজোর বোম্বাই হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত। বাবামশায়ের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি দূরে সে যায় নি কখনো।

নিরালা দুপুরে তাদের একতলার আলাপ খোলা জানালা বেয়ে স্পষ্ট উঠে আসত উপরে। গুরুদেব হাসতেন শুনে।

বিকেলে যখন বনমালী চা সাজিয়ে দিত, চা খেতে খেতে গুরুদেব বলতেন, তুই তাকে আরো বড়ো বড়ো নাম বললি নে কেন? বললেই হত যে তুমি বক্তিয়ারপুর গেছ? উটকামণ্ড ভিজেগাপট্টম বেজোয়াডা, এই-সব জায়গায়? খটোমটো নাম শুনে নিশ্চয়ই ভড়কে যেত ও।

বনমালী খুদে খুদে দাঁত বের করে হিহি করে হাসত আর বলত, তা বাবুমশায় কথাগুলি কঠিন কিনা? অতবড়ো নাম আমার তাই স্মরণে থাকে না।

—তা থাকবে কেন? যাও তবে, ওর কাছে বোকা বনে বসে থাকো গে। যাবার আগে আমার 'ন্যাপকিন'টা দিয়ে যাও। 'ন্যাপকিন'টা দিয়ে 'নাম্বা' টেবিলটা এদিকে সরিয়ে দাও। তার পর 'স্যানাভজন'এর শিশিটা রাখো তার উপরে।

এগুলি ছিল বনমালীর ভাষা। গুরুদেব প্রায়ই তাকে নিয়ে এভাবে মজা করতেন। আর বনমালী মুচকে মুচকে হাসত।

বনমালীর গায়ের রঙ ছিল কালো কুচকুচে। গুরুদেব নাম দিয়েছিলেন, নীলমণি, ডাকতেন, নীলমণি।

নীলমণির বোম্বাই শহরের উপর বিশেষ একটা আগ্রহ ছিল। তার ধারণা, বোম্বাই গেলে তার গায়ের রঙ অনেক ফর্সা হয়ে যায়। সে নাকি বার-কয়েকই প্রমাণ পেয়েছে বাবামশায়ের সঙ্গে গিয়ে। গুরুদেব বলতেন, চল্ বোম্বাইতে গিয়ে থাকি এবার হতে তোতে আমাতে।

বনমালী খুব খুশি হয়ে উঠত এ প্রস্তাবে।

গুরুদেব বলতেন, আচ্ছা বনমালী, তুই কি জানিস আমি যে একজন খুব বড়োলোক?

বনমালী বলত, হ্যাঁ বাবুমশায়, জানি।

—কিসে আমি বড়োলোক বল্ তো? দ্বারকানাথের 'নাতি' বলে?

বনমালী হিহি করে আর হাত কচলায়। বলে, বলব? বলব?

গুরুদেব বলতেন, বল্-না?

বনমালী আরো হেসে দুহাত কচলে বলে ফেলত, আপনি 'নেকার জোরে বড়োলোক'।

গুরুদেব হো হো করে হেসে উঠতেন।

বনমালীর সঙ্গে সময়ে সময়ে গল্প করে তিনি আমোদ পেতেন। তাঁর মতো শ্রোতাও বিরল। কত গল্পই যে করত বনমালী, গুরুদেব একমনে শুনতেন। একদিন বনমালী গল্প বলে চলেছে, তাদের গাঁয়ে নাকি কে একজন আছে, এমন বাণ মারে সে— একবাণে সাত-সাতটা কলাগাছ ফুটো হয়ে বাণ বেরিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে শত্তুরটা ধড়ফড়িয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। একেবারে 'মিরতু'; আর তাকে আলো দেখতে হয় না।

আর আছে মণিবাবা তাদের গাঁয়ে। কি উৎসাহ গল্প শোনাতে বনমালীর! বলে, সে বাবামশায়, মণিবাবার এত মাহাত্ম্য, কাউকে যদি জাতসাপে কাটল তো তিনবার শুধু বলো, 'মণিবাবা মণিবাবা মণিবাবা', ব্যস্, অমনি সে উঠে বসবে, বিষ নেমে যাবে।

গুরুদেব বলেন, বটে?

—হ্যাঁ বাবামশায়— এত তার নামের গুণ।

গুরুদেব ত্বরিত গতিতে সোজা হয়ে বসে সেক্রেটারির দিকে চেয়ে বললেন,

যা তো অনিল, যেখান থেকে পারিস এখুনি একটা কেউটে সাপ জোগাড় করে আন। এনে সাপটাকে দিয়ে বনমালীকে কাটা। তার পর তিনবার কেন আমি তিনশো বার বলব 'মণিবাবা মণিবাবা মণিবাবা মণিবাবা—'

বনমালী বুঝত এটা রসিকতার ঢেউ। হেসে চায়ের বাসন তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেত।

বনমালীকে গুরুদেব একবার নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন, দেখেছি। হায়দ্রাবাদের পথে ভিজেনাগ্রামে যাচ্ছেন গুরুদেব একদিনের জন্য, রাজমাতা ললিতাদেবীর আমন্ত্রণে। ভোর রাত্রে ভিজেনাগ্রাম স্টেশনে ট্রেন থামল। দেখি, ট্রেনের করিডরে দাঁড়িয়ে গুরুদেব তাঁরই একটা কালো ভেলভেটের টুপি বনমালীর মাথায় পরিয়ে থাবড়ে থুবড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন। বনমালীকে পরিয়েছেন গুরুদেব নিজেরই একটা সাদা সিল্কের পাজামা। বলছেন, রাজ-বাড়িতে যাচ্ছিস— তোর ঐ সাজে যাবি নাকি? আমার পাজমা টুপি পরে সেজে নে ভালো করে।

গুরুদেবের টুপি আর পাজামা পরে খুদে বনমালীর সে এক অপূর্ব সাজ। বনমালী টুপি সামলায়, না, পাজামা সামলায়। বনমালী চওড়া চলচলে পাজামা কেবলি কোমরে গুঁজে গুঁজে তোলে। তুলতে তুলতে পাজামা হাঁটু অবধি তুলে ফেলল। মাথার টুপি চোখ ঢেকে ঝুলে রইল।

এই ভিজেনাগ্রামে আসতেই পথে এক জায়গায় স্টেশনে ট্রেন থেমে আবার চলতে শুরু করল; দেখি, গুরুদেব বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন, বলছেন আর হাসছেন। শুনবার জন্য এগিয়ে এলাম। শুনি, বলছেন, সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত; সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত।

বলি, সে আবার কি?

বললেন, শুনতে পাচ্ছিস নে? গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে— সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত— সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত— সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত— ।

কিছুদিন বিশ্রামের পর গুরুদেব কবিতা লিখতে শুরু করলেন। সারাদিন একটানা লিখে যান। 'বীথিকা' 'শেষ সপ্তকে'র বেশির ভাগ কবিতা চন্দন-নগরেই লেখা। অনেক সময় যে কবিতা লিখবেন তার ভাব বলে শোনাতেন। হাবার মতো চেয়ে থাকতাম। বলতেন, বলি, ব'লে আমার আইডিয়াটাই একটু পরিষ্কার করে নিই। কোনোদিন-বা জিজ্ঞেস করলেন, তোরা কানের

ফুলকে ফুলই বলিস, না, আর কোনো নাম আছে তার? কখনো বলতেন, ফল্‌সাবরণ শাড়ি পরেছিস কখনো? আচ্ছা, এই যে তোর শাড়ির পাড়টা এটা অনেকটা ফল্‌সাবরণ নয়? কবিতা লিখে সঙ্গে সঙ্গে শোনাতেন—

গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফল্‌সাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো—
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।

বলতেন; মেয়েদের সাজাতে তো কম সাজালুম না।

চন্দননগরে থাকতে মাঝে মাঝে দু-চারজন আসতেন গুরুদেবের কাছে। সারাদিন থেকে সন্ধের দিকে ফিরে যেতেন। শরৎ চাটার্জি মশায় এলেন একদিন, একবেলা ছিলেন। কি নিয়ে যেন মতান্তর ঘটেছিল তাঁর গুরু-দেবের সঙ্গে। সেটা সেবারেই কাটল।

মনে আছে, শরৎ চাটার্জি মশায় আমাকে নিয়ে বোটের ছাদের উপরে বসে নানা গল্পেই কাটিয়ে দিলেন বেশির ভাগ সময়। গুরুদেবের উদ্দেশে বললেন, ওঁর সামনাসাম্‌নি কি বেশিক্ষণ থাকা যায়? চলো, আমরা একটু দূরে গিয়েই বসি।

বাড়ি ছেড়ে বোটে চলে এলেন। সে কত গল্প, কবে কিভাবে তিনি ও তাঁর ভায়ে মিলে এমন দেশী দেশলাই তৈরি করলেন যে সেবারে দামোদরের বন্যায় সব ভেসে গেল, শরৎবাবু হাসেন আর বলেন— কিন্তু আমাদের দেশলাই জানো জলে ভিজেও ঠিক জ্বলল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় আসতেন। তুলসী গোস্বামী, অপূর্বদা আসতেন। আরো গণ্যমান্য কেউ কেউ আসতেন, কিন্তু ভিড় জমত না কখনো।

ছ মাস ছিলাম সেখানে আমরা। এর মধ্যে একদিনের জন্য বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, একবার বাড়ির গেটের ওদিকেও পা বাড়াই নি। স্বামী থাকতেন তাঁর কাজকর্ম নিয়ে, বাড়ির ভিতরে একমাত্র সঙ্গী আমার গুরুদেব। লিখতেন যখন, তখন চেয়ারের পিছনে বসে থাকতাম, তাঁর কাছছাড়া হতাম না। ঐ চেয়ারের পিছনে বসেই গঙ্গা দেখতাম। তীরে লোকে স্নান করত, চালুনিতে কাদা তুলে জলে ধুয়ে ধুয়ে কি যেন খুঁজত

দিন-ভর জেলেনির দল। ছোটো বড়ো লম্বা মোটা কত রকমের নৌকো যেত পাল তুলে দিয়ে। একমনে দেখতাম। ভালো কিছু দেখলে গুরুদেবকে ডেকে দেখাতাম। বিরক্ত হতেন না তিনি। হাসির কিছু দেখলে নিস্তব্ধ ঘরে জোরে হেসেও ফেলেছি কতবার। শান্তিনিকেতন হতে সুরেনদা ওঁরা এলেন, বোট নিয়ে মাঝগঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। দেখছি চেয়ে চেয়ে। স্নান-শেষে সবাই ফিরছেন এবারে। সুরেনদা বসে আছেন গলুইতে জোড়াসন হয়ে। বোট এসে পাড়ে লাগতেই মাটির ধাক্কা লাগল বোটে, সুরেনদা উলটে পড়ে গেলেন কাদা-জলে।

আমি দোতলা থেকে দেখে হেসে উঠলাম। গুরুদেব চমকে উঠলেন— হল কি রে?

মুখ তুলে তাকালেন জানালা দিয়ে। সুরেনদা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন সবে। গুরুদেব বুঝলেন ব্যাপারটা, স্মিতহাস্যে আবার লিখতে থাকলেন।

কি হাসিই যে হাসতাম তখন। কারণে অকারণে হেসেছি। গুরুদেব কোনোদিন কিছু বলেন নি। কত সময়ে এমন হয়েছে, হাসির কারণ কিছু ঘটেছে; গুরুদেবকে বলতে গেছি, সব-কিছু তাঁকে না বললেও চলত না। কথাটা বলতে গিয়ে বলার আগেই হাসি শুরু হয়ে গেছে। দেখে গুরুদেবও হাসতেন, বলতেন, কি হয়েছে আগে বল্-না?

আমার হাসি আর থামে না। শেষে তিনি বলতেন, যা, ওধারে গিয়ে আগে খানিকটা হেসে আয়, পরে এসে বল্ ঘটনাটা।

গুরুদেবকে সময়ে সময়ে অপ্রস্তুত হতেও দেখেছি। তখন তাঁর যে মুখের ভাব হত, সেও বড়ো সুন্দর। একবার কোনার্কের বারান্দায় বসে আছেন গুরুদেব সন্ধেবেলা। তাঁর সেক্রেটারিকে উল্লেখ করে গুরুদেব আমায় প্রায়ই বলতেন, তোমার 'নমিনেটিভ কেস্'— মানে, আমার 'কর্তাব্যক্তি'।

সেদিন নন্দদার স্ত্রী সুধীরা বউদি এসেছিলেন মৃন্ময়ীতে বেড়াতে, কোনার্কের সামনের পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিলেন। আবছা-আলো পথটায়। গুরুদেব ভাবলেন আমিই যাচ্ছি বুঝি-বা। ডেকে বললেন, তোমার নমিনেটিভ কেসকে একটু ডেকে দাও তো।

বউদি থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। বুঝলেন, এ কথা তাঁর জন্য নয়। তাঁকে যেতে দেখে গুরুদেব হাঁক দিলেন— ওগো শুনছ? অমন

করে চলে যেয়ো না, তোমার নমিনেটিভ কেসকে একটু ডেকে দিয়ে যাও। আমার কাজ আছে।

বউদি যেমন যাচ্ছিলেন যেতেই লাগলেন।

এদিকে আমি বউদিকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে এধার দিয়ে মৃন্ময়ীর বারান্দা থেকে কোনার্কের বারান্দায় চলে এলাম। গুরুদেব বললেন, ও তবে কে গেল একটু আগে?

বললাম, সুধীরা বউদি।

গুরুদেব বললেন, আরে রামো। বউমা কি ভাবলেন বল্ দেখি। আমি যত বলি, ওগো শুনছ, শোনোই-না, এত ব্যস্ত হয়ে চললে কোথায়? তোমার নমিনেটিভ কেসকে একটু ডেকে দিয়ে গেলেই না-হয়। বউমা ততই থেমে থেমে পিছন ফিরে তাকান আর এগিয়ে যান। কি ভাবলে সে বল্ দেখি।

গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে পারম্পর্য রক্ষা করা কঠিন। যখন যা মনে আসবে তাই বলে যাব।

গুরুদেবের টুপি ছিল নতুন ধরনের। সুতির বা ভেলভেটের বা ঘন রঙের মোটা সিল্কের টুপি পরতেন তিনি। সে টুপি অন্য কারো টুপির সঙ্গে মেলে না। একেবারে আলাদা। আকারে অনেক বড়ো, নরম। মাথায় পরলে উপরের অংশটা আপনা হতে নানান্ ভাঁজে নেমে পড়ত। বড়ো সুন্দর লাগত দেখতে। সে টুপি যেন একমাত্র গুরুদেবকেই মানাত। তিনি অনেকবার অনেক রকম করে তৈরি করার পর এ টুপির আবিষ্কার করেছিলেন।

সাজের কথা উঠল যখন তখন তাঁর সেই কথাটাই খানিক বলে নিই। যাঁর এত রূপ তাঁর আলাদা করে সাজের দরকার হত না। যা পরতেন তাই সাজ হয়ে যেত। যেখানে বসতেন শোভায় ভরে উঠত। অভিনয়কালে স্টেজের এক ধারে শুরু হতে শেষ অবধি বসে থাকতেন তিনি একখানি কৌচের উপরে। দুপাশে ফুলদানিতে থাকত গোছা গোছা রজনীগন্ধা মাথা তুলে। স্টেজের সে কোণটি আলো হয়ে থাকত তাঁর রূপের জলুসে। দর্শকের নজর সেখানেই আটকে থাকত বেশির ভাগ সময়ে। স্টেজে কোনো অনুষ্ঠান হলেই মঞ্চসজ্জায় সঙ্গে গুরুদেবের আসনও অনিবার্য ছিল সেখানে। গুরুদেব ছাড়া মঞ্চসজ্জা আমরা ভাবতেই পারতাম না। ভাবতে পারতাম না যে, কখনো স্টেজে নৃত্য অভিনয় হবে অথচ গুরুদেব থাকবেন না সেখানে। এমনটা যেন ঘটতে পারেই না, এমনিই স্থির ধারণা ছিল সকলের মনে। কি স্টেজে, কি সভায়, আসরে উৎসবে মন্দিরে গুরুদেবকে চোখের সামনে দেখার এমন একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল আমাদের যে, যখন ছাতিমতলায় গুরুদেবের শ্রাদ্ধবাসর সাজানো হল, শত শত শ্বেতপদ্মে ঢাকা হল বেদী, মন সারাক্ষণ ছটফট করতে লাগল— চোখ এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকল— কি যেন নেই, কি যেন নেই। যেন সম্পূর্ণ হল না বাসর এখনো। রথীদা বসে শ্রাদ্ধ করছেন, মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। গুরুদেব কোথায়? তিনি এই বেদীতে বসলে তবে তো এ বেদী মানায়, বেদীর রূপ পূর্ণ হয়।

গুরুদেব মন্দিরে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন।

পাজামা বা সিল্কের লুঙ্গি ব্যবহার করতেন বাইরে কোথাও গেলে। নয়তো সদাসর্বদা মোটা ছু-সুতির লুঙ্গি আর ঢিলে হাতার পাঞ্জাবি পরতেন। কখনো থাকত তা গেরুয়া রঙের, কখনো থাকত সাদা ধবধবে। তার উপরে পরতেন লম্বা জোব্বা। বাইরে বের হবার কালে ছুটো জোব্বা লাগাতেন। ভিতরের জোব্বা বুক-ঢাকা, পুরাতন কুর্তার মতো বুকের উপরে আড়াআড়ি করে কোমরে বোতাম আঁটা। আর উপরেরটি গলা হতে পা পর্যন্ত সামনের দিকে সবটাই খোলা। যেন গায়ে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকত জোব্বাটা। নানা রঙের জোব্বা ছিল গুরুদেবের। কালো ঘননীল খয়েরী বাদামী কমলা গেরুয়া বাসন্তী মেঘ-ছাই— সিল্কের, সুতোর। যখন যেটি পরতেন, মনে হত এইটিই যেন বেশি মানাল তাঁকে। দিনে দিনে মাসে মাসে রঙ বদলে বদলে সাজতে তিনি ভালোবাসতেন। কখনো নতুন সাজে সেজে বসে আছেন— ঘরে ঢুকে দেখে আপনা-আপনি মুখ হতে বেরিয়ে আসত 'বাঃ'। গুরুদেব খুশির হাসি হাসতেন। শীত সবে যাব-যাব করছে, এক বিকেলে দেখি গুরুদেব বাসন্তী রঙের জোব্বা পরে বাইরে বসে আছেন। বেলাশেষের আলো পড়ে সে রঙ যেন জ্বলে উঠল। বিস্ময় উচ্ছ্বাস দুই মিলিয়ে দেখি, দেখে হাসি; বলি, এই সময়ে এই সাজে যে? গুরুদেবও হাসেন, বললেন, বসন্তের আসার সময় হল যে। আমি যদি তাকে ডেকে না আনি কে আনবে বল্? তাই তো বাসন্তী রঙে সেজে বসন্তকে আহ্বান করছি। দেখলি নে, একটু আগে এক পলকের জন্ম দখিন-হাওয়া পরশ বুলিয়ে গেল। লিখছিলাম, উঠে জোব্বা বদলে নিলাম।

সেদিন সেই শেষবেলায় কি অপরূপ রূপই দেখেছিলাম তাঁর।

দারুণ গ্রীষ্ম; বেলা ন'টা বাজতে-না-বাজতে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েও স্বস্তি পায় না লোকে। হাতপাখা, ভিজে মেঝে, ঠাণ্ডা জল, কিছুতেই আরাম নেই। দেখেছি সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে চার দিকের দরজা জানালা খোলা, দিগন্তের হুহু হাওয়া ঝলকে ঝলকে এসে ঝলসে দিচ্ছে ঘরের ভিতরটা, গুরুদেব বসে বসে এক মনে লিখেই চলেছেন। গায়ে তাঁর মোটা কাপড়ের জোব্বা। দেখে আরো আঁত্‌কে উঠেছি। বলেছি, গরম লাগে না আপনার? হেসে বলতেন, তোমার যেমন বুদ্ধি! গরম না লাগবার জন্তই তো মোটা জোব্বা গায়ে দিয়েছি। গরম লাগে কেন? গরম হাওয়াটা

গায়ে এসে লাগে বলেই তো? মোটা কাপড় দিয়ে গা'টা ঢেকে দাও, গরম হাওয়াটা আর গায়ে লাগবে না। এই সহজ বুদ্ধিটা তোমার হল না। এখন বুঝছ তো মোটা জোব্বা পরেছি কেন? তুমিও একটা মোটা কাপড় গায়ে দাও, দেখবে গরম একেবারে টের পাবে না!

ঘন বর্ষায় পরে থাকতেন তিনি গাঢ়নীল রঙের জোব্বা। এই ঋতু ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। মেঘ দেখতে পেলে কী খুশিই হতেন গুরুদেব। একবার— এ অনেক শেষের কথা, গাঢ়নীল জোব্বার কথা বলতে গিয়েই মনে এল সে কথা, সেদিনও তাঁর গায়ে ছিল এই জোব্বা-জোড়া।

বলেছি, গুরুদেবকে গরমে কাবু হতে দেখি নি আমরা কখনো আগে। কেউ 'উঃ' 'আঃ' করলে বলতেন, এমন আর কি অসহ্য ব্যাপার? আমার তো মনে হয় না তা।

এ একেবারে শেষের দিকের কথা— গ্রীষ্মের তাপ তখন গুরুদেবকে বেশ জানান দিয়ে ছাড়ে। সে সময়ে কষ্ট হত তাঁর শান্তিনিকেতনে থাকতে। অথচ তিনি আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইতেন না বাইরে। বলতেন, ক'টা দিনই-বা— দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পরই তো বর্ষা শুরু হবে। দিগন্ত জুড়ে কালো মেঘ এগিয়ে আসবে, বাইরে চলে গেলে যে দেখতে পাব না তা।

পাহাড়ের শীতল হাওয়ার চেয়ে আশ্রমের বর্ষার উপরে টান ছিল তাঁর এত বেশি।

সেবারে প্রচণ্ড গরম পড়ল এদিকে। দারুণ অনাবৃষ্টি। মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির। ধকধক জ্বলে দিগন্তে হাওয়া। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটল। বর্ষা এই আসে এই আসে আশায় দিন কাটাতে লাগলেন গুরুদেব। এক-এক দিন এমন হয়— মেঘ করে আসে আকাশ ছেয়ে, গুরুগুরু গর্জনও করে, কিন্তু কোনো করুণা করে না শেষ পর্যন্ত। আশ্রমের উপর দিয়ে শালবীথির মাথা ডিঙিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলে যায় দূরে কালো মেঘ অতি অবহেলায়। সবাই চেয়ে থাকি আকাশের দিকে, যে, আজ বৃষ্টি হবেই, মেঘের পর মেঘ ঐ আসছে এগিয়ে, এল এল, এই বর্ষা ঝরে পড়ল; আগ্রহে উল্লাসে ছুটোছুটি করি অঙ্গনে— ক্ষণেক পরেই মলিন মুখে ঘরে ঢুকি। এই প্রহসনই চলতে থাকল রোজ।

এদিকে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গুরুদেবের জন্য। কালিম্পঙে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হল। আর অপেক্ষা নয়। আজ নয় কাল করে করে চলেছে এতদিন। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে হয়। গুরুদেব কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছেন দিন দিন। গরম যেন আরো বাড়ল। গত কয়দিন আকাশের কোনো কোণে এক টুকরো মেঘেরও আর দেখা নাই। গুরুদেব এবারে আর অমত করলেন না, যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বোঠান রথীদা আগেই গেছেন সেখানে, তবু, গুরুদেবের সঙ্গেও বেশ বড়ো দল যাবে। বনমালী মহাদেব ওরা ঘরের কাজের তিন-চার জন, মালপত্রের তদারকে জন-দুই, গুরুদেবের ওঠা-নামায় সাহায্য করতে দুজন, অনুরক্ত ভক্ত জন-তিনেক, গুরুদেবকে পৌঁছে দিয়ে দু-চার দিন থেকে চলে আসবেন তাঁরা। তা ছাড়া সেক্রেটারি তো আছেনই।

বিকেলে ট্রেন, সকাল হতে সেক্রেটারি ছুটোছুটি করছেন— স্টেশনে-আশ্রমে, আশ্রমে-স্টেশনে! তখনকার দিনে বোলপুর স্টেশন এত বড়ো ছিল না, এত সুব্যবস্থাও ছিল না। ছোট্ট স্টেশন, গাড়ি হতে নেমে অনেকখানি হেঁটে প্ল্যাটফরমে ঢুকতে হত। কখনো-বা শেষ মুহূর্তে ট্রেন উলটো প্ল্যাটফরমে এসে থামত, তখন আরো মুশকিল হত, লাইনের উপর দিয়ে পুল পেরিয়ে ওদিকে যেতে হত। অত সিঁড়ি ভাঙা গুরুদেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই কয়েক-দিন আগে হতেই স্টেশন-মাস্টারকে বলে এখানে-ওখানে খবর পাঠিয়ে ঠিক করতে হত যাতে ট্রেন এই প্ল্যাটফরমেই আসে। তা ছাড়া আর-একটা ব্যবস্থা রাখতে হত— বোলপুর হতে বহু মন চাল বাইরে যায় ট্রেনে করে, তার জন্য ছিল একটা ছোটো গেট স্টেশনের একধার দিয়ে। সেই গেট খুলিয়ে রাখতে হত গুরুদেবের জন্য। গুরুদেবের মোটর সোজা সেই গেটের সামনে দাঁড়াত, ট্রেন গুরুদেবের কামরা ঠিক তার সামনে এনে থেমে থাকত। গুরুদেবের হাঁটতে হত না বেশি। শেষ মুহূর্তে এ-সব ব্যবস্থার একচুল এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল। তাই উনি হন্তদন্ত হয়ে কেবল ছুটে বেড়াচ্ছেন। তা ছাড়া এতগুলি লোক, শীতের দেশ, মালপত্র বিছানা বাক্স— সে এক স্তূপ। আগে হতে সে-সব নিয়ে জিম্মে দিতে হবে স্টেশন-মাস্টারকে। গুরুদেবের মালপত্র থাকবে আলাদা, এর একটিও যদি ভুলে থেকে যায় তো সর্বনাশ! লেখা, ছবি আঁকার সরঞ্জামই একরাশ। কোন্‌টা যে গুরুদেবের কাজে লাগবে কোন্‌টা লাগবে না তা

জানা নেই কারো। সেখানে গিয়ে হয়তো বলে বসবেন, আমার সেই জিনিসটা কোথায়? হয়তো সামান্যই জিনিস, কিন্তু তখন তারই বিহনে গুরুদেবের যে জীবনমরণসমস্যা উপস্থিত হবে, সে সময়ে তাঁকে ঘিরে যাঁরা থাকতেন তা তাঁরাই জানতেন। পরে হয়তো হেসেছি এ ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে গুরুদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে এমন সাহস থাকে না বুকে। তাই সব-কিছুই তাঁর সঙ্গে চলেছে।

বিকেল এল। গুরুদেব আজ যাবেন কলকাতায়, কাল রওনা হবেন কালিম্পঙে। মালপত্র মানুষ সবই চলে গেছে স্টেশনে। গুরুদেব তৈরি হয়ে বসে আছেন। তখন ফোন ছিল না। ট্রেন ঠিক সময়ে আসছে কি না খবর জানতে স্টেশনেই যেতে হত। উনি এসে খবর দিলেন, ট্রেন কোপাই স্টেশন ছেড়েছে, সময় হয়েছে, এবারে গুরুদেব আপনি উঠুন মোটরে। গুরুদেব মোটরে উঠে রওনা হলেন। ছোট্ট অভিজিৎকে নিয়ে আমি শুধু রয়ে গেলাম উত্তরায়ণ তল্লাটে।

কত বারই তো গুরুদেব এমনি যান আসেন, এবারে যে গেলেন, কি জানি কেন, প্রাণের ভিতরটায় কেমন করতে লাগল। গুরুদেব তখন উদীচীতে থাকতেন, আমরা থাকি কোনার্কে; গুরুদেবকে তুলে দিয়ে আমি ফিরে এসে কোনার্কের ছাদে উঠে পায়চারি করতে লাগলাম। ঐ যে ঈশানকোণে তালগাছের সারি, তার পরে তালতোড় গ্রাম, তার ওধারে কোপাই স্টেশন, ওখান হতে ট্রেন আসে স্পষ্ট দেখা যায় ছাদে দাঁড়িয়ে। ঐ তো ট্রেন আসছে, হুইসিল দিতে দিতে এগিয়ে এসে পুবের মাঠের ধারে মাটি কেটে নিচু যে রেললাইন তার ভিতরে ট্রেন ঢুকে পড়ল। আর দেখা যায় না। এবারে সে বোলপুরে ঢুকবে। আপনা হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠি, একি, মোটরের আওয়াজ শুনি যে! তাই তো! গুরুদেবের সেই মোটরখানাই তো ঢুকছে উত্তরায়ণের গেট দিয়ে! মোটর যে চলল উদীচীর দিকে? ভিতরে কি ও? সেই ঘননীল রঙ— গুরুদেবের জোব্বার! তবে কি—। একছুটে ছাদ হতে নেমে এলাম। মোটরও ততক্ষণে এসে থেমেছে উদীচীর সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে মোটরের কাছে এসে গুরুদেবকে দেখে খুশিতে হেসেই অধীর। দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে হাসছি, আর বলছি—একি হল গুরুদেব, অ্যাঁ? গুরুদেব গাড়ির ভিতরে বসে বসেই হাসতে লাগলেন। বললেন, দেখ্ গিয়ে এতক্ষণে

স্টেশনে কি হুলুস্থুলু লেগে গেছে। আমার সেক্রেটারি হয়তো ট্রেনের এমাথা ওমাথা ছুটে ছুটে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। গুরুদেব হাসেন আর বলেন, কি কাণ্ড হল বল্ তো? লোকজন বাক্স বিছানা সব যে যার কামরায় উঠল, মায় জলের কুঁজোটি পর্যন্ত। কেবল আমার ওঠা বাকি। সেক্রেটারি আমায় নিতে এসে দেখবে আমি নেই। অবস্থাটা একবার কল্পনা করে নাও তার।

গুরুদেব মোটরে বসে বসেই বলেন আর হাসতে থাকেন।

পরে শুনলাম গল্প, গুরুদেব স্টেশনে গেলেন, গিয়ে যেমন প্রতিবারে করেন, ছোটো গেটটার সামনে মোটরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ট্রেন এল, সবাই ব্যস্ত জিনিসপত্র ট্রেনে ওঠাতে; সব-কিছু উঠে গেলে তবে এসে গুরুদেবকে তোলা হবে ট্রেনে। এমন সময়ে গুরুদেব তাকালেন আকাশের দিকে, দেখলেন এক কোণায় এক টুকরো কালো মেঘ এগিয়ে আসছে যেন। অমনি ড্রাইভারকে বললেন, মোটর ঘোরাও। ফিরে এলেন আশ্রমে।

সেই মেঘও কিন্তু জল হয়ে নামল না শেষ পর্যন্ত। দু-তিন দিন পরে আবার রওনা হতে হল গুরুদেবকে। এবারে সত্যিই গেলেন কালিম্পঙে। সেই সেবারেই— যেবারে অসুস্থ হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। শেষ অসুখ তাঁর।

এ ধরণীর আলোছায়া তাঁকে কি মোহিতই না করে রাখত! কত সময়ে ডেকে ডেকে দেখাতেন, বলতেন, এই যে শিমুলের কচি পল্লবে আলো পড়েছে, পাতাগুলি হাওয়ায় দুলছে, কি সুন্দর লাগছে— চেয়ে দেখ্। পারিস না কি একে ছবিতে ধরতে?

উদীচীর ঢাকা বারান্দায় বসে বসে দেখাতেন উদয়নে পড়েছে শরতের তরুণ রবির আলো। বলতেন, দেখ্ দেখ্, এই যে সোনার আলো পড়েছে উদয়নের উপরে, যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে কেউ? কেমন একটা অপার্থিব রূপ ফুটেছে, নয় কি?

চেয়ে চেয়ে দেখি, হ্যাঁ, সোনার আলোই তো বটে! উদয়নের এগিয়ে-আসা পিছিয়ে-যাওয়া এ দেয়ালে সে দেয়ালে সে আলো একতলা হতে তেতলা অবধি এ এক রূপকথার রাজবাড়ির রূপের বাহার। কিন্তু অপার্থিব রূপ— সে আবার কি? একবার গুরুদেবের মুখের দিকে চাই, আর বার উদয়ন দেখি।

গুরুদেব বিস্মিত হন, বলেন, দেখতে পাচ্ছিস নে? মনটা খুশি হয়ে উঠছে না? একটা আনন্দ জাগছে না প্রাণের ভিতরে?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ি। হ্যাঁ, একটা যেন কি হচ্ছে— ভালো লাগছে। হ্যাঁ, খুশিখুশি হচ্ছি। কিন্তু গুরুদেবের মুখে-চোখে উপচে-ওঠা এ কোন্ হাসিখুশির ছটা? আজও এর নাগাল পাই নি।

অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত কখনো দেখি নি গুরুদেবকে কারো সেবাশুশ্রূষা নিতে। দেহে কারো হাতের স্পর্শ তিনি পছন্দ করতেন না। বড়ো জোর পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছি আমরা, কি, লিখতে লিখতে ধরে গেছে আঙুল— দিনান্তে কখনো হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন— দে দেখি আঙুলগুলি একটু টেনে— ঐপর্যন্ত। দেহ তাঁর এত কোমল ছিল যে, প্রায় সবারই হাত তাঁর গায়ে কড়া লাগত, তাঁর কষ্ট হত। বলতেন, কেবল বউমার হাতই নরম, অন্যদের হাতে ব্যথা পাই।

স্নান করে বেরিয়ে আসতেন স্নানের ঘর হতে, দেখতে পেতাম তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। জল ঢালা, গা মোছা, কাপড় ছাড়া, কাপড় পরা একসঙ্গে এতটা হয়রানির ব্যাপার ছিল তাঁর পক্ষে। কতবার বোঠান বলেছেন, বনমালী, আলু বা আর যাকে আপনার পছন্দ সে না-হয় করুক একটু সাহায্য আপনার স্নানের সময়।

কোনোদিনও মানেন নি তিনি তা।

সেবার মাদ্রাজে গেলেন গুরুদেব, কোমরে খুব ব্যথা। সেখানকার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য একটা মালিশের তেল দিলেন। সেই তেল তেমনিই পড়ে রইল, মালিশ করাতে রাজি হলেন না। শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখনো ব্যথা তেমনি।

বোঠান অনেক কাকুতি করলেন, রানী দিক একটু মালিশ করে। দেখুনই-না একটু উপকার পান কি না।

কয়দিন সমানে বলতে বলতে শেষে তিনি রাজি হলেন। কোনার্কের পশ্চিমের ঘরে বসে তখন গুরুদেব লেখেন দিন-ভর। জানালা দিয়ে রোদ আসে ঘরে। গুরুদেব রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন, মালিশ করে দিলাম। তার পরদিনও দিলাম। ঐ হয়ে গেল। আর বসলেন না মালিশ করাতে। বললেন, বৃথা সময়ের অপব্যয় রে। ও সময়টায় আমার অনেকটা লেখা হয়ে যায়।

একা বাড়িতে থাকতেন তিনি। রাত্রেও কেউ থাকতে পেত না কাছা-কাছি। এক বনমালী থাকত বাড়িতে, তাও তাঁর ঘর হতে দূরে বারান্দায়।

একবার শ্যামলীতে একদিন গুরুদেবের জ্বর হল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। বোঠান মীরাদি সবাই ভাবিত হলেন— গুরুদেব অসুস্থ, একা থাকবেন রাত্রে, এ কেমন কথা? অথচ তাঁর বারণ না মেনে কেউ যে কাছে থাকবে এমন সাহস কারো নেই। কি উপায় করা যায়? অনেক ভেবে ঠিক হল গুরুদেব ওদিকের ঘরে ঘুমিয়ে পড়বার পর সামনের খোলা উঠোনে পালা করে তাঁরা বসে থাকবেন। তাই হল। গুরুদেব মশারির ভিতরে ঢুকবার বেশ খানিক পর মীরাদি এসে চুপি চুপি উঠোনে একটা মোড়া পেতে বসলেন। গুরুদেব ঠিক টের পেয়ে গেলেন। একটু পরে তিনিও একটা মোড়া হাতে করে এনে মীরাদির পাশে বসলেন। বললেন, মীরু, দুজন জেগে থেকে কি লাভ আছে কিছু?

মীরাদি উঠে চলে এলেন।

শেষবারের অসুখ ও একবার রিসিপ্লাস হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, এ ছাড়া গুরুদেবকে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় থাকতে দেখি নি। সামান্য জ্বর ফ্লু সর্দি এ-সব তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না।

বায়োকেমিক ওষুধ গুরুদেব পছন্দ করতেন খুব। এই ওষুধের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল তাঁর। যেবার গুরুদেবের রিসিপ্লাস হয়, আমি তখন কলকাতায়; আমার স্বামীর টাইফয়েড হয়েছে, ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত। গুরুদেব একটু ভালো হয়েই লিখে পাঠালেন, অনিলের জন্য অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন আছি। আমার বিশেষ অনুরোধ ওর টেম্পারেচর কমাবার জন্য ওকে আধ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ফেরমফস্ ও ক্যাল্কিসল্ফ খাওয়াস। তার পর টেম্পারেচর নামলে খাওয়াস নেট্রম সল্ফ। ওকে অন্য যে-কোনো ওষুধই খাওয়ানো হোক, তার সঙ্গে এটা দিলে দোষ হবে না। রোজ পোস্টকার্ডে সংক্ষেপে খবর জানাস।...

গুড়ি গুড়ি সাদা সাদা পিলভরা বায়োকেমিকের একগাদা শিশি থাকত গুরুদেবের সাথে সাথে। যেখানে যখন বসতেন বা লিখতেন শিশি সমেত ট্রে-টা পাশে থাকা চাই। আর থাকত চিকিৎসার মোটা বইখানা। যখনই সময় পেতেন মন ঢেলে বইখানি পড়তেন আর তারই ফাঁকে এক-একটা শিশি খুলে হাতের তেলোয় কতকগুলি পিল ঢেলে মুখে ফেলে দিতেন। কেউ যদি

তাঁর কোনো অসুখ বলে ওষুধ চাইতে আসতেন, তা হলে গুরুদেব অত্যন্ত খুশি হতেন। অতি আগ্রহে ওষুধ ঢেলে দিতেন, বারে বারে তাঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন রোগী কেমন আছে। ফিরে ফিরে ওষুধ বদলে বদলে পাঠাতেন। গুরুদেবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজার গুণ বেশি খুশি হতেন তিনি যদি কেউ এসে বলত যে গুরুদেবের ওষুধে তার অমুক অসুখটা সেরে গেছে। গুরুদেবের সেই খুশি-ভরা মুখ দেখবার মতো ছিল। অনেক সময়ে এমনও হত, গুরুদেবকে খুশি করবার জন্য হঠাৎ পেটব্যথা মাথা-ধরা নিয়ে গুরুদেবের কাছে কেউ কেউ উপস্থিত হতেন, আর গুরুদেবের ওষুধ খেয়ে তখুনি তখুনি ভালো হয়ে যেতেন। গুরুদেব বুঝেও না-বোঝার ভান করতেন, বরং প্রসন্নই হতেন। ওঁকেও কতবার দেখেছি এমনি, কোনো-একটা কাজে গাফিলতি করেছেন, জানেন কপালে বকুনি আছে আজ, তাড়াতাড়ি গিয়ে সর্দি কাশি এটা ওটা বলে গুরুদেবের কাছে দাঁড়িয়েছেন, গুরুদেব ওষুধ দিয়েছেন, মুঠোভরা সে ওষুধ মুখে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

বসন্ত টাইফয়েড কলেরায় ভয়ে গুরুদেবকে টিকা ইনজেকশন নিতে দেখি নি কখনো। একবার বোলপুরে ও আশেপাশের গাঁয়ে বসন্ত জলবসন্ত দেখা দিল। দেখতে দেখতে চার দিকের আবহাওয়া আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। শান্তি-নিকেতন একটুখানি পথ। রোগ চলে আসতে কতক্ষণ? ডাক্তারবাবু আশ্রম ঘুরে ঘুরে সবাইকে টিকা দিয়ে শেষে এলেন গুরুদেবের কাছে। তিনিই একমাত্র বাকি এখন। তাঁকে টিকা দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এবারকার মতো। কিন্তু গুরুদেবকে রাজি করানোই এক সমস্যা। আড়াল হতে সকলে ডাক্তারবাবুকে ইশারায় তাগিদ দিতে লাগলেন— যে করে হোক গুরুদেবকে টিকা দিয়ে দিতে। ডাক্তারবাবু ভয়ে ভয়ে গুরুদেবের কাছে এগিয়ে এলেন।

গুরুদেব একপলক তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে এসেছ কেন ডাক্তার? যাদের ফিরে ফিরে বসন্ত আসে তাদের টিকা দাও গে যাও। আমার অত বছরে বছরে বসন্ত আসে না।

এই কথা বলে হেসে পাশে দাঁড়ানো সেক্রেটারির দিকে কটাক্ষ করে লেখায় মন দিলেন।

ডাক্তারবাবু যে অবস্থায় ঢুকেছিলেন সেই অবস্থায়ই বেরিয়ে এলেন।

গুরুদেবের ছোটোখাটো খেয়ালও হরেক রকমের ছিল। বাইরে কোথাও গেলেন, সব রকমের সব রঙের পোশাকই আনা হয়েছে সঙ্গে, কেবল মেটে সবুজ জোব্বাটাই আনা হয় নি হয়তো। কয়দিনই-বা থাকা হবে, সে হিসেবে যথেষ্ট জামা জোব্বা আনা হয়েছে, কিন্তু দেখা যাবে গুরুদেবের ঠিক খোঁজ পড়বে ঐ মেটে সবুজ জোব্বাটার জন্যই। সেটাই তখন তাঁর সব চেয়ে দরকার হয়ে পড়বে। এমন দরকারি জিনিস সেটাই কেন আনা হয় নি! সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁদের তখন অপ্রস্তুত অবস্থা।

আর হতও এমন— গোছা গোছা পেন্সিল তুলি আছে হাতের কাছে, ক্ষয়ে যাওয়া হলুদ রঙের আড়াই ইঞ্চি পেন্সিলটাই ফেলে দিয়েছে কেউ টেবিল গোছাতে গিয়ে। গুরুদেবের ঝোঁক পড়বে সেই পেন্সিলটার উপরেই।— আমার সেই হলুদ রঙের পেন্সিলটা কোথায়? ওটা খুঁজে বের কর্, ওটাতেই আমার আঁকা ভালো হয়।

কত সময়ে এমনিতরো ফেলে দেওয়া জিনিসের জন্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে হয়েছে বাইরে ঝোপেঝাড়ে কত জনকে।

নানা জায়গা হতে নানারকমের অনুরোধ আসত— বক্তৃতা দিতে, কোনো-কিছু উদ্বোধন করতে; তিনি সহজেই রাজি হয়ে যেতেন। পরে হয়তো নিজেরই খেয়াল হত, কিংবা অন্যরা খেয়াল করে দিয়ে বলতেন, ও জায়গায় আপনার যাওয়া ঠিক হবে না, তখন তিনি খবর পাঠিয়ে দিতে বলতেন যে তাঁর যাওয়া সম্ভব না।

সেবার এইরকম হয়েছিল বোম্বেতে; কোনো এক সিগারেট ফ্যাক্টরির মালিক এসে ধরেছেন গুরুদেবকে, একবার তাঁর ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। গুরুদেব রাজি হলেন। ভদ্রলোক নানা জায়গা হতে বন্ধুবান্ধব আনিয়ে ঘটা করে আয়োজন করলেন। সেখানে যাবার আগের দিন রাত্রে সরোজিনী নাইডু খবর পেয়ে গুরুদেবকে বললেন, সিগারেট ফ্যাক্টরিতে যাবেন আপনি? এ কখনো হতে পারে না— absurd।

পরদিন ভোরে ফ্যাক্টরির মালিক গুরুদেবকে নিতে এসে যখন শুনলেন গুরুদেবের যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না তখন ভদ্রলোক বললেন, অগত্যা তবে

আপনার তরফ হতে আর কেউ আসুন। তা না হলে বড়ো অপ্রস্তুত হতে হবে আমাকে।

হাতের কাছে অন্য কেউ নেই। গুরুদেব বললেন, তোরা যা।

সে আবার কি? বলি, না না, গুরুদেব, এ অসম্ভব কথা।

গুরুদেব বললেন, যা না। ভয়টা কি? কিছু তোকে করতে হবে না। কেবল দেখিস হাসিস নে যেন। গম্ভীর হয়ে বসে থাকিস।

আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেব। সে এক বিপদ সেদিন। ফ্যাক্টরিতে এলাম। ফ্যাক্টরিতে ঢুকবার আধমাইল আগে হতে পথ ফুলে ফুলে ঢাকা, ফুলের মালায় ছাওয়া। তোরণ ঝালর বাঁশি সানাই; সে যেন এক রাজ-পুত্রের বিবাহ-আসর। গম্ভীর আপনা হতে হয়ে আছি ব্যাপার দেখে, চেষ্টা আর করতে হয় নি। তোরণের পর তোরণ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন পর্যন্ত ঠিক ছিলাম কিছুই তেমন মনে হয় নি। কিন্তু যখন ফুলের তৈরি প্রকাণ্ড একটা সিংহাসনের উপর উঠিয়ে রাজারানীর মতো আমাদের পাশাপাশি বসিয়ে দিল আর সামনে দাঁড়িয়ে ভাটের দল 'জয় জয় রবীন্দ্র কবীন্দ্র জয়তু' ব'লে হাত তুলে তুলে সিংহাসন দেখিয়ে গান গাইতে লাগল তখন মনে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

বাইরে কোথাও যাবেন গুরুদেব, দিন ঠিক হয়েছে, কতবার যে তিনি সেই দিন বদলাতেন তার ঠিক থাকত না। আর বদলাতেনও একেবারে শেষ মুহূর্তে। সেক্রেটারি বলতেন, গুরুদেব ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত বলা যায় না কবে তিনি যাবেন।

এই-সব খেয়াল নিয়ে পরে গুরুদেব খুব আমোদ পেতেন, বলতেন, জানিস নে, আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি, বাবু চেঞ্জেস্ হিজ মাইণ্ড। ব'লে বলতেন, দ্বারকানাথ তখন বিলেতে, সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁরা বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাতেন আজ আমরা অমুক জায়গায় অমুক সময়ে অমুক ডিউকের কাছে যাচ্ছি। অমুক জায়গায় তিন দিন থেকে অমুকদিন ফিরে আসব ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে সব চিঠিরই শেষে লিখতেন— But one can never be sure— for the Babu changes his mind so often।

গুরুদেবও হেসে বারে বারেই শোনাতেন, Babu changes his mind।

গুরুদেব বলতেন, আমি আর কি খেয়ালী রে? খেয়ালী ছিলেন আমার

বড়দাদা। খেয়াল গেল, কাপড়ের যদি জোব্বা হয় তবে কাগজের জোব্বাই বা হবে না কেন? বসে বসে নানা রঙের কাগজ জুড়ে জোব্বা বানালেন বড়দাদা; কেবল তা-ই নয়, সেই জোব্বা গায়ে দিয়ে কলকাতা শহর ঘুরেও এলেন একদিন। বড়দাদার খেয়াল হল ঘিয়ে যদি লুচি ভাজা যায় তবে জলে ভাজা যাবে না কেন? হেমলতাকে বললেন, একবার জলে লুচি ভেজে দেখোই-না বউমা।

বলেন, তেমনি হিসেবীও ছিলেন বড়দাদা। একবার জমিদারির ব্যাপারে একজনকে বারোশো টাকা দিতে হবে। রথী তখন জমিদারি দেখাশোনা করে। তিনি রথীকে লিখে পাঠালেন, অমুককে যে আমাদের বারোশো টাকা দিতে হবে, তা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? হয় তুমি দাও বারোশো আমি দিই কিছু না। তুমি দাও নশো আমি দিই তিনশো। তুমি দাও ছশো আমি দিই ছশো। তুমি দাও তিনশো আমি দিই নশো। তুমি দাও কিছু না আমি দিই বারোশো। কোন্‌টা তোমার পছন্দ?

গুরুদেব হাসেন আর বলেন, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একদিন এক ভিখিরি এসে নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে। বড়দাদা দোতলার বারান্দা হতে দেখতে পেলেন তাকে। কি দেওয়া যায় ভিখিরিকে। নীচে একটা বড়ো ট্রাইসাইকেল ছিল, বাজারের জিনিস আসত তাতে করে। বড়দা সেইটে দেখিয়ে ভিখিরিকে বললেন, নিয়ে যাও ওটা। সে তো তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে চালাতে শুরু করেছে, এমন সময়ে বাড়ির সরকার দেখতে পেয়ে 'রোকো রোকো' বলে পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

বলতে বলতে গুরুদেব হো হো করে হেসে উঠতেন। যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন সে দৃশ্য। বলতেন, জিনিয়াসে জিনিয়াসে বাড়ি আমাদের ভরা ছিল। জিনিয়াস হওয়া বড়ো বিপদের কথা। জানিস, আমি একটুখানির জন্য বেঁচে গেছি। আর একচুল বেশি জিনিয়াস হলেই বিপদ হত রে।

গুরুদেবরা ছিলেন সাত ভাই চার বোন। একে অন্যের উপযুক্ত ভাই বোন। কি রূপে, কি প্রতিভায়।

সেবার আশ্রমে মিসেস মার্গারেট সায়েঙ্গার এলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আমরা সবাই শুনলাম। শুনে সভার পরে গুরুদেবের কাছে এলাম। গুরুদেব বলেন, কি শুনলি? কি বললেন মার্গারেট

সায়েন্সার।

বললাম, উনি বললেন কি— সবারই দুটি কি তিনটি মাত্র সন্তান হওয়া উচিত। পিতামাতার যা ভালো ভালো গুণ, ভালো স্বাস্থ্য সর্বপ্রথমে বড়ো সন্তান পায়। দ্বিতীয় তৃতীয় সন্তানও অনেকটা পায়। তার পরে সব-কিছুই কমতে থাকে। বেশি সন্তান হলে শেষের দিকের সন্তানরা মা-বাবার ভালোটার কিছুই পায় না।

গুরুদেব বললেন, হুঁ, আমি আমার পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলুম।

বলেই মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

বললাম, ও, তাই তো!

দুজনেই হেসে উঠলাম।

গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে বারবার আমি এসে পড়ছি সামনে। তা হোক। শ্রাবণমেঘের জল শুকনো মাটিতে ঝরল, ঘাসফুলটি ফুটল। তবে লোকে দেখল সেই করুণাধারাকে। সাগরে পড়লে তো সেই রূপটি ফোটে না আর। আধার একটা চাই বইকি। এখানে আমি না হয়ে যে-কেউ হত পারত। এই আমি যে আমিই, তা তো নয়। যে-কোনো আমিই হতে পারে। একটি কচি প্রাণ, যে তাঁর স্নেহে আদরে মশগুল হয়ে ছিল বহুকাল, তারই ছোটো সংসারটি ঘিরে যে পেয়েছে গুরুদেবকে গুরুরূপে পিতারূপে সখারূপে সাথী-রূপে— সেই-সব ঘটনায় তাঁরই প্রকাশ, আমি কিছু নই।

মশগুল হয়ে যে ছিলাম সে কথা সত্যি। গুরুদেবও আমাদের নিয়ে তেমনি ভাবেই খেলা করতেন। তাই দিনের যত কথা ছুটে গিয়ে তাঁকে না বললে চলত না আমাদের।

ছবি আঁকি, চোখের অবহেলা করেছি, অসময়ে চশমা নিতে হল। উনি দমকা হাওয়ার মতো গুরুদেবের ঘরে ঢুকে বলে এলেন, জানেন গুরুদেব, রানী আমাকে বয়স ভাঁড়িয়েছে। ওকে চালশের চশমা দিল ডাক্তার।

ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে গুরুদেব হাসতেন। তিনি আবার আমাকে লাগাতেন ওঁর কাজের খুঁত ধরতে। দুদিন আগে গুরুদেব ওঁকে একটা জরুরি লেখা টাইপ করতে দিয়েছেন। এর আগে বার-দুই তাড়াও দিয়েছেন, লেখাটা এনে দে। উনি এই দিচ্ছি বলে এমন ভাবে ঘর হতে চলে এসেছেন যেন এখুনি সেটি আনতে গেলেন।

গুরুদেব বললেন, নিশ্চয়ই লেখে নি ও। দেখ্‌ গিয়ে এখন হয়তো তড়বড় করে টাইপরাইটারে আঙুল ঠুকতে বসেছে।

এসে দেখি ঠিক তাই। দৌড়ে আবার গুরুদেবের কাছে ফিরি, সে খবর দিতে।

তাঁকে মাঝখানে রেখে যেন ছিল আমাদের জীবন। কত সময়ে আমরা একে অন্যেকে গুরুদেবের নাম করে জব্দ করেছি, ভয় দেখিয়েছি। একবার এইভাবে ওঁকে জব্দ করতে গিয়ে আমিই ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম।

উনি রোজ সন্ধেবেলা তাস খেলে কাটান উদয়নে, আমার ভালো লাগে

না। মাঝে মাঝে কাউকে দিয়ে ওঁকে খবর পাঠিয়ে দিতাম যে, গুরুদেব ডাকছেন। যখন-তখন এমনিতরো ডেকে পাঠাতেনও তিনি। তাই গুরুদেব ডাকছেন, সত্যি মিথ্যে ভাববার অবসর নেই, উনি খেলা ফেলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন। আমি মজা পেতাম। একদিন এইরকম সন্ধেবেলা তাস খেলছেন উনি। সেদিন কি হল আমি নিজেই গেলাম ওঁকে ডাকতে। যেন খুব জরুরি তলব এমনিভাবে ভিতরে ঢুকে আদেশের সুরে গলা চড়িয়ে বললাম, ওঠো শিগগির, গুরুদেব তোমাকে ডাকছেন।

দেখি কেমন একটা চাপাহাসির দৃষ্টি নিয়ে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চেয়ে দেখি, কই, তাস তো খেলছেন না কেউ। উপরন্তু কেমন একটা শিষ্ট ভাব সকলের। সন্দেহ হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার পিছনে গুরুদেব স্বয়ং বসে। দরজা দিয়ে ঢুকেই হন্‌হন্‌ করে খেলুড়েদের কাছে এগিয়ে গেছি, সোফায় বসা গুরুদেবকে যে পেরিয়ে গেছি লক্ষই ছিল না। দেখি, গুরুদেব মিটিমিটি হাসছেন। অমনি এক ছুট্ সেখান হতে।

বাইরে এসে ধাঁধা লাগল। এই একটু আগে দেখলাম গুরুদেব শ্যামলীর আঙিনায় বসে আছেন, কখন গেলেন ওখানে টের পেলাম না তো?

শ্যামলীর আঙিনায় বসে থাকতে থাকতে আশ্রমের কি একটা কাজের কথা মনে হয়েছে। সোজা তিনি চলে এসেছেন উদয়নে, জানতেন এখানে এলেই রথীদা আর ওঁদের সব ক'জনকে পাবেন একসঙ্গে, যাদের তিনি চান এই মুহূর্তে।

তাস খেলতাম আমিও। তবে 'রামী'। শিখেছিলাম বিয়ের পর ভাশুরের কাছে। হারজিতের হিসেব পয়সা দিয়ে হত। দু-তিন আনার মধ্যেই হার-জিতের ওঠা-নামা থাকত। এ খেলাটা আমাদের বাড়িতেই খেলতাম; ছুটির দিনে দুপুরবেলা বন্ধুবান্ধব রথীদা সুরেনদা জন-কয়েক মিলে। খেলার শেষে হিসাব দিতাম গুরুদেবকে। গুরুদেব বলতেন, আমিও একরকম তাসখেলা জানতুম, পয়সা দিয়ে খেলতুম, ছেলেবেলায় বিলেতে শিখেছিলুম। দাঁড়া, মনে করে নিই, শিখিয়ে দেব'খন।

কতদিন এমন হয়েছে কোনার্কের পিছন দিকে পশ্চিম-ঘরের বড়ো ফরাশে আমাদের 'রামী' খেলা জমে উঠেছে, গুরুদেব অতর্কিতে একেবারে দোরগোড়ায় এসে কেসে উঠেছেন, মুহূর্তে যে যার জুতো চটি ফেলে উধাও হয়েছেন। খালি

ঘরে তখনো তাঁদের সিগারেটের ধোঁওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। দেখে হেসে উঠেছি। গুরুদেবের আসা দেখেই বুঝতে পারা যেত, যদি কোনো কাজের কথা থাকত তা হলে তাঁরা আবার ফিরে এসে সভ্যভব্য হয়ে বসতেন, নয়তো পালিয়েই যেতেন যে যাঁর পথে। গুরুদেব তখন ফরাশে বসে বলতেন, দে একটা কাগজ আর পেন্সিল; তোর একটা ছবি আঁকি। তুইও না-হয় আমার একটা পোর্ট্রেট্ কর।

বহুবারই এমনি হয়েছে যে, উনি আমার পোর্ট্রেট্ আঁকছেন, আর আমি আঁকছি তাঁর।

প্রায়ই তিনি এমনি অকস্মাৎ দিনে রাত্রে যে-কোনো সময়ে চলে আসতেন আমাদের কাছে। বুঝতে পারতাম, ক্লান্তি লেগেছে মনে, ছেলেমানষি খেলা খেলতে চান খানিক। সেক্রেটারি চটপট করে গল্প বলতে পারেন, এক-একদিন সেই গল্পই জমে উঠত কত, সময়ের হিসাব না রেখে।

কত সময়ে, উনি অফিসে, আমি ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত অন্য ঘরে, গুরুদেব এসে বসবার ঘরে বসে হাতের কাছে কাগজ পেন্সিল যা পেয়েছেন নিয়ে আপন মনে ছবি আঁকছেন। এ ঘর ও ঘর ঝেড়ে গুছিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে আনন্দে সংকোচে বলে উঠেছি, একটুও টের পাই নি তো কখন এলেন। সাড়া দিলেন না কেন?

একদিন, রান্না চাপিয়েছি উনুনে, তাড়াহুড়ো করেই রান্নাবান্নার কাজ সারতে হত। কোনার্কের সামনের দিকে ভাঁড়ার ঘরের গা-লাগা ছোট্ট এক-ফালি খোলা বারান্দা, সেই বারান্দাতেই উনুন পেতে রান্নাঘর বানিয়ে নিয়েছি। বারান্দার পরে এক টুকরো উঠোন, তার ধার দিয়ে সরু পথ, নিজেরা, মানে ঘরের লোকরা চলাফেরা করি সেই পথে; দরকার মতো বাইরের দরবার এড়িয়ে। গুরুদেব কখন কোথায় বসেন অতিথিবৃন্দ নিয়ে ঠিক ছিল না কিছু। আর তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে তখন মজা ছিল এই, যে-কোনো দিক দিয়ে বাড়িতে ঢোকা যেত। বেড়া ফটক এ পথ সে পথ এ-সবের বালাই ছিল না। সিক গরাদ থাকত না জানলাতে, পিছন দিক দিয়ে এলাম তো জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়লাম। অতি সহজ উপায় ছিল তখন আসা-যাওয়ার।

সেদিন সেই খোলা বারান্দায় রান্নাঘরে আমি রান্না চড়িয়েছি, ডাল

ফুটছে, উনুনের পাশে বসেই তরকারি কুটছি, মুখ তুলে দেখি, গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে; কি বলি না-বলি, কি করি না-করি, এমনি অবস্থায় আঁচলে হাত মুছতে মুছতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পিঠের দিকে জড়ো করে রাখা হাত এগিয়ে ধরলেন গুরুদেব। দেখি একটি ছবি এঁকেছেন আমারই জন্য, ছবির নীচে লেখা '৺বিজয়ার আশীর্বাদ'।

সেদিন ৺বিজয়াদশমীই ছিল। দু হাত পেতে নিলাম ছবিখানা। প্রণাম করলাম।

সহজ হৈ-চৈ তাঁকে বড়ো আনন্দ দিত। এক বর্ষায় বর্ষামঙ্গলের রিহার্সেল হচ্ছে উদয়নের পশ্চিম-বারান্দায়। নাচগানে প্রতি সন্ধ্যা জমে ওঠে সেখানে। পাশের ঘরে ওঁদের তাসের আড্ডা। একদিন ওঁদের প্রাণে বড়ো বাজল এত নাচগান অভিনয় হয়, এঁরা যোগ দিতে পারেন না কিছুতে। সুর বলে কোনো বালাই নেই এঁদের গলায়। গুরুদেব বলতেন, ওরা সব অ-সুরের দল। সেদিন ওঁরা তাস খেলতে খেলতেই ঠিক করে ফেললেন, সাধনায় কি না হয়! তাঁরাও গান গাইবেন, সুরে সুরে নাচবেন। বললেন, বর্ষামঙ্গলটা হয়ে যাক, তার পরেই আমরা করব ভরসামঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে সংঘ তৈরি হল, নাম হল 'হৈ হৈ সংঘ'। পরদিনই 'ভরসামঙ্গলে'র রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। রোজ সন্ধেয় 'হৈ হৈ সংঘের' গানের মহড়া চলে কোনার্কে। আমরাও জড়ো হই জন-কয়েকে মিলে মজা দেখতে। হাসির ধুম পড়ে যায়। গুরুদেবকে এসে পরে বর্ণনা দিই। শুনে গুরুদেবও হাসেন। বলেন, আমিও একটা গান লিখে দেব ওদের জন্য।

পরদিন বললেন, ডাক তো কাউকে ওদের মধ্যে থেকে, সুরটা শিখে নিক্ এসে।

কেউ আর আসতে চান না। সুধীর কর মশায় ভালোমানুষ, তাঁকে ধরে আনলাম; গুরুদেব গেয়ে গেয়ে তাঁকে গান শেখালেন—

আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমরা না-গলা-সাধার।
মোদের ভৈঁরো রাগে, প্রভাতরবি রাগে মুখ-আঁধার॥

পরদিন আরো ছুটো গান লিখলেন—

ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে-চারটে পাস করেছি, নই নিতান্ত মুরুখ॥

তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ ॥

আর—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।

পরে আরো একটা গান লিখলেন—

কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী
তাঁরি পদ সেবি, করি তাঁহারি ভজনা
'বদ্ধকণ্ঠ'লোকবাসী আমরা কজনা।

গান পেয়ে হৈ হৈ সংঘের উৎসাহ গেল বেড়ে, রিহার্সেল উঠল জমে।

ভরসামঙ্গলের আগের দিন বিকেলে গোরুর গাড়ি করে ছাপানো বিজ্ঞাপন বিলি করল হৈ হৈ সংঘের দল সারা আশ্রম ঘুরে। ঢোল করতাল হারমোনিয়ম বাঁশি শিঙা শঙ্খ কিছুই বাদ ছিল না সেদিন সেই গোরুর গাড়ির উপরে।

পরদিন শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতনের যে যেখানে ছিল সবাই এসে জড়ো হল সন্ধে হতে-না-হতে সিংহসদনে। দর্শকদের মধ্যেও মহা উত্তেজনা, মহাস্ফূর্তি।

হৈ হৈ সংঘ নিশ্চিন্ত ছিল, গুরুদেব আসবেন না এই হৈ হৈ-এ। দূর থেকেই তিনি উৎসাহ দিয়েছেন।

ভরসামঙ্গলের অনুষ্ঠান শুরু হল, দেখা গেল, গুরুদেব এসে ঠিক সামনে যেখানে বসেন বরাবর, বসে আছেন।

নিছক 'ভ্যারাইটি শো'। পর পর প্রোগ্রামের কোনো বালাই নেই। যার যখন সুবিধে হচ্ছে ইচ্ছে-মতো স্টেজে ঢুকে পড়ছেন। এক-এক বার ধাক্কাধাক্কিও লাগছে। গাঙ্গুলীমশায় ডুগ্‌ডুগ্‌ ডুগ্‌ডুগ্‌ ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে গান ধরলেন। গৌরদা ভীমের বেশে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজে চক্কর দিয়ে গেলেন।

সরোজদারা নাচলেন বাল্মীকি-প্রতিভার দস্যুদলের নাচ—

এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী।
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী॥

তাঁদের পায়ের দাপটে স্টেজ ভাঙে আর-কি। কিছুকাল আগে শাপমোচন হয়েছিল; ক্ষিতীশ, ডাক্তারবাবু, সন্তোষবাবু শাপমোচনে আমাদের নকল করে এ ওর গলা জড়িয়ে নেচে নেচে গাইলেন— 'ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।' নন্দদা সাদা সালোয়ার পাঞ্জাবি চিকনের টুপি মাথায় দিয়ে কালো চাপদাড়ি লাগিয়ে খলিফার সাজে সেলাম করতে করতে স্টেজ ভরে তুললেন। নন্দদা যেতে-না-যেতে গোঁসাইজি খটাখট খটাখট দুই হাতে দুই জোড়া কাঠের বাজনা বাজাতে বাজাতে এমাথা ওমাথা বিদ্যুৎগতিতে নেচে দিয়ে গেলেন।

আলুদা যাত্রাদলের সখী সাজে রথীদার হাত হাতে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগলেন, 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।' গুরুদেবের সামনে বিব্রত রথীদা এদিক ওদিক তাকান আর আলুদার পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন। সেক্রেটারি ছিলেন দলের অধিকারীমশায়— প্রধান উদ্যোগী। সেদিন গুরুদেবের কাছে একশো টাকার একখানি চেক এসেছিল আনন্দবাজার হতে তাঁর লেখার দক্ষিণা বাবদ। অধিকারীমশায় জানতেন তা। তিনি স্টেজ হতে বলে বসলেন দর্শকদের, আমাদের গুরুদেববাবু মশায় নাচগান দেখে খুশি হয়ে আজ আমাদের এক শত টাকা বকৃশিশ দিলেন।

গুরুদেব কি আর করেন, দিয়ে দিতে হল সে টাকাটা হৈ হৈ সংঘকেই।

ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি হবে বড়োদিনের উৎসব উপলক্ষে। বিদেশী যাঁরা আছেন তাঁদের আজ বিশেষ একটি দিন। তাঁদের জন্য উৎসব করতে হবে বইকি? বরাবরই সন্ধেবেলা সেদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে আলপনায় সাজিয়ে বিশেষভাবে মন্দিরে উৎসব হয়, তার পর উদয়নে হয় রাত্রের ভোজ। আশ্রমেরও অনেকে থাকেন এই ভোজে। প্রতিবারই কিছু-না-কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে এতে। এবারে হল ফ্যান্সি ড্রেসের আয়োজন। সবাইকেই আলাদা আলাদা একটা কিছু সাজে সেজে আসতে হবে খাবার টেবিলে। উদয়নের পশ্চিম-বারান্দা ঘিরে খাবার টেবিল পড়েছে। মাঝখানে গুরুদেব, দু পাশে আর সবাই। দেশবিদেশের নানা সাজে সেজেছে সকলে।

সকলেই হাসছে সকলকে দেখে। বয়সে বোধ হয় আমিই ছিলাম ছোটো সবার চেয়ে। মুখে হাতে ভুসোকালি গেরিমাটির গুঁড়ো মেখে রঙ ফেলেছিলাম বদলে। খোঁপায় দিয়েছিলাম জবা, হাতে রুপোর বালা, পরেছি সাঁওতালী শাড়ি হাঁটু অবধি খাটো; নাম দিল সবাই 'মালতী'। গুরুদেব মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, বললেন, তুই আবার হেথা কেনে এলি? হি হি করে কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে গুরুদেবের কাছে হাঁটু গেড়ে বসি। গুরুদেব বললেন, টেবুলে বসে খাবি কি তুই— নামুতে বোস্।

সেবার তাসের দেশের রিহার্সেল হচ্ছে। বোম্বের দিকে যাওয়া হবে শাপমোচন ও তাসের দেশের দল নিয়ে টাকা তুলতে আশ্রমের জন্য। দলে লোকসংখ্যা হয়ে গেল অনেক। যাওয়া-আসায় ট্রেনের টিকিটেই বহু টাকা লেগে যাবে। উনি সেক্রেটারি হিসাবে সঙ্গে তো যাবেনই, তাসের দেশের রুইতনের একটুখানি মাত্র কথা, তার জন্য আবার আলাদা করে একজনকে নিতে হবে। গুরুদেব বললেন, অনিল, তুইই চালিয়ে নে এটুকু।

উনি আপত্তি তোলেন। অনেক সময় ওঁর দু-একটা কথায় শিলেটী টান এখনো এসে পড়ে। গুরুদেব অনেক বুঝিয়ে শেষে রাজি করালেন ওঁকে। প্রথম দিনের রিহার্সেল; এক জায়গায় কথা ছিল রুইতন এসে হরতনীকে বলল— 'চলো হরতনী বেরিয়ে পড়ি। মনে হচ্ছে, আজ পর্দা খুলে গেছে, আকাশে মেঘ গেছে সরে—' বলতেই সকলে হো হো করে হেসে উঠল। কি? না— উনি নাকি 'মেঘ' বলতে 'ম্যাগ' বলেছেন। তাদের কথায় গুরুদেবও হেসে ফেললেন। উনি তো দে ছুট সেখান থেকে। আর তাঁকে পাওয়া যায় না রিহার্সেলে। বেঁকে বসলেন, কিছুতেই অভিনয় করবেন না। গুরুদেব তখন মেঘ কথাটাই পাল্টে দিলেন। বললেন, বেশ তো, মেঘ বলবার তোর দরকারই নেই, বলিস নে; বলিস কুয়াশা।

অনেকদিন অবধি গুরুদেব এই মেঘ-কুয়াশা নিয়ে তামাশা করতেন। চা খেতে বসেছেন, সঙ্গে উনিও আছেন। বনমালী কেক্ এনে রাখল সামনে। বললে, অমুকদিদি করে পাঠিয়েছেন, একটুখানি ক্যাক্ খান আপনি।

গুরুদেব বললেন, ও আমার খেয়ে কাজ নেই বাপু, যারা 'ম্যাগ' বলে তাদের 'ক্যাক্' খাওয়াও গে।

কেকের প্লেটটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে হাসলেন।

বিচিত্র রকমের অতিথি আসতেন গুরুদেবের কাছে। তাঁদের সবাইকেই তিনি সয়ে নিতেন। একবার এক মান্যগণ্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক এলেন সস্ত্রীক। গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, ভদ্রমহিলাও বুঝি ভাবলেন কিছু-একটা বলা উচিত; তাঁদের কথার মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা, রবিবাবু, আপনি এখনো কবিতা-টবিতা লেখেন?

আমরা তো শুনে থ। গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে নিমীলিত নেত্রে বললেন, তা, হ্যাঁ— এখনো একটু লিখি বৈকি।

পাগল— পাগলই আসত কত রকমের। এত রকমের পাগল যে আছে সংসারে গুরুদেবের কাছাকাছি থেকে না জানলে তা ভাবতেই পারতাম না কখনো। overজিনিয়াস, ছিটগ্রস্ত, উন্মাদ, বদ্ধ-উন্মাদ, অর্ধ-উন্মাদ, মতলবের উন্মাদ, সাজা-উন্মাদ— সে কত রকমের। কাউকে তিনি কাছে আসতে বাধা দিতেন না। সকাল হতে একদিকে চলত গুরুদেবের লেখার কাজ, আর-এক দিকে বইত লোকজনের অনবরত আসা-যাওয়ার স্রোত। বিরাম ছিল না এর। অবারিত দ্বার, কেউ দেখা করতে এসে ফিরে গেছে, শুনি নি কখনো। আশ্রমেরও ছোটোবড়ো সকলে কাজে অকাজে দিনে কত কত বার আসছে যাচ্ছে, কখনো বিরক্ত হতে দেখি নি তাতে। দূরদূরান্ত দেশদেশান্ত হতেও কতশত জন আসতেন। সময় নেই অসময় নেই হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছেন, ভালো বেসেছেন। তাঁরা আসতে তিনি হাতের কলম ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করেছেন, চলে গেলে পর আবার লিখেছেন। এমনি ভাবেই লেখা চলত সারাদিন। দুপুরে বিশ্রাম নিতেও রাজি থাকতেন না। এক-এক সময়ে ভেবে অবাক হতাম, এখনো হই যে, কি করে একজন মানুষ সকাল হতে সন্ধে অবধি এমনতরো একটানা একটা পিঠ-সোজা চেয়ারে বসে লিখে যেতে পারেন।

একবার এক পাগল এল, কিছুতেই সে আর গুরুদেবকে ছাড়ে না। অথচ কি যে তার বলবার কথা সে জানে না। গুরুদেব যতবারই লেখায় মন দিতে চান ততবারই বাধা পান। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কি-একটা

লিখে ফেলবার জন্য ব্যাকুল তিনি। বার বার বাধা পড়ায় মুখের সে ভাব করুণ হয়ে উঠছে।

সেইদিন সন্ধেবেলা গুরুদেব দুঃখ করে বললেন, সবারই সময়-অসময় আছে, নেই কেবল আমারই। আমার নিজের বলে দিনের একটুখানি সময়ও আমি পাই নে কখনো।

পরদিন হতে সেক্রেটারি তাঁর অলক্ষ্যে নিয়ম বাঁধলেন, যখন-তখন গুরুদেবের কাছে যাওয়া চলবে না কারো। আশ্রমের লোকের কথা আলাদা, তবে বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য সময় স্থির করা রইল ঘড়ির এতটা থেকে এতটা। দুদিন বেশ লোক আটকানো গেল। তিন দিনের দিন একটি লোককে বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখে গুরুদেব বুঝলেন কিছু-একটা হয়েছে যাতে করে এদের সহজ আসার পথ বন্ধ। সেক্রেটারিকে ডেকে তিনি বললেন, তোরা কি ভাবিস আমি একটা কেউ-কেটা, নবাব-বাদ্‌শা? আমার কাছে আসতে হলে সেপাই-সান্ত্রী পেরিয়ে তবে আসতে হবে? আহা, বেচারারা— দূর দূর হতে আসে, কি, না— আমায় একটু দেখে যাবে, কি, প্রণাম করবে— নাহয় দুটো কথাই বলবে। তার জন্য এত কি কড়াক্কড়ি? দোর আমার খোলা থাকবে, যার যখন মন চায় আসবে আমার কাছে, কাউকে বাধা দিস নে যেন তোরা আর কখনো।

সেক্রেটারি ইতস্তত করেন। বলেন, আপনার লেখার সময়ে বিরক্ত করলে আপনার অসুবিধে হতে পারে—

তিনি বললেন, তা হয় হোক, তবু কেউ এসে দূরে বসে অপেক্ষা করবে এ ভারি অন্যায়।

রোজ সকালে পোস্ট অফিস হতে গুরুদেবের যে ডাক আসত তা ছিল দেখবার মতো। সে এক বোঝা। দৈনিক মাসিক পাক্ষিক সাপ্তাহিক ত্রৈমাসিক যাণ্মাসিক সংবাদপত্রেরই এক স্তূপ। কত বিচিত্র নাম সে-সবের। এত কাগজও দেশবিদেশের আনাচকানাচ হতে বের হয় রোজ; না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ডাক নিয়ে এলেই আমি গুরুদেবের পিছনে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাংলা সংবাদপত্র আর গল্প-উপন্যাসের বইগুলির উপরই আমার নজর।

চিঠিগুলি নিজের হাতেই ছিঁড়তেন তিনি। নানা রকমের পাগলের

চিঠিও থাকত। অনেককে আবার নিজের হাতে চিঠিও লিখতেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ চেয়ে পাঠিয়েছেন; কেউ ছাপিয়েছেন কবিতার বই, অনুরোধ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যেন বিলেতে লিখে তাঁকে এই বছরের নোবেল প্রাইজটা পাইয়ে দেন। কেউ লিখেছেন তাঁর অনূঢ়া কন্যার জন্য সুপাত্র দেখে দিতে; কেউ-বা নিজেই পাত্রী চেয়ে বসেছেন, প্রথমা স্ত্রীকে আর সহ্য করতে পারছেন না; কেউ চেয়েছেন দেড় লক্ষ টাকা, যেন রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ এই টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করেন, এই টাকা পেলে তবেই ভদ্রলোক সংসারের ভার হতে মুক্ত হয়ে সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকতে পারবেন বাকি জীবন-ভর, নয়তো তাঁর প্রতিভার অপমৃত্যুতে যে মহা ক্ষতি সাধিত হবে সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেই জবাবদিহি করতে হবে সারা পৃথিবীর কাছে।

এরকম কত কত চিঠিই যে আসত রোজ। শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আসত আশীর্বাদী কয়েক লাইন কবিতার চাহিদা। আসত রঙে পেন্সিলে কাঁচা-পাকা হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, আবদার থাকত নাম সই করে ফেরত পাঠিয়ে দেবার। লেখা বা কবিতা সংশোধন করে দিতে হবে এমন চিঠিও আসত অগুনতি। প্রশংসাপত্র লিখে পাঠানোর অনুরোধও অজস্র। ভালো চিঠি— যা পেয়ে গুরুদেব খুশি হতেন, তা খুব কমই থাকত। চিঠিগুলি দেখে, পড়ে ভাগাভাগি করে ফেলতেন। কতকগুলি টেবিলের উপরে রাখতেন, উত্তর দেবেন। কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলতেন, উপভোগ্য পাগলামির চিঠিগুলি সেক্রেটারির হাতে তুলে দিতেন— বলতেন, নাও, সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে দিলুম তোমাকে।

এ-সব ছাড়া আসত নানা দেশের নবীন প্রবীণ নানা লেখকের নতুন ছাপা বই রোজ একগাদা। বই ম্যাগাজিন সবগুলিই গুরুদেব একবার করে হাতে নিয়ে উল্টে দেখতেন। ওতেই তাঁর পড়া হয়ে যেত বেশির ভাগ বইগুলিই। এ এক দেখবার মতো ছিল। বই একটি হাতে তুলে নিতেন, নিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে চেপে এক-এক করে পৃষ্ঠাগুলি ছেড়ে দিতেন, এক সেকেণ্ড কি দু সেকেণ্ড এক-এক পৃষ্ঠায় নজর পড়ত, তারই মধ্যে বলে বলে যেতেন, এই হল— তাই হল, সেই তো বড়ো দুর্ভোগ তো তার, আহা মেয়েটা মরেই গেল, ছেলেটা সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল;— হল— হয়ে গেল— নাও, বলে কাঁধের উপর দিয়ে

পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বইখানা নিয়ে নিতাম।

এমনি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকখানা বইই তাঁর পড়া হয়ে যেত। সে-সবের ভালোমন্দ সমালোচনাও বলে যেতেন। সময়মত ভালো করে পড়ে দেখবেন যে-সব বই সেগুলি কাছে রেখে দিতেন। অন্য বইগুলি দু হাতে বুকের উপরে জড়ো করে আমি ঘরে চলে আসতাম। নিত্য এ ছিল এক নেশার মতো আমার।

কত সময়ে গুরুদেব কারো চিঠির উল্টো পাতায় ছেঁড়া খামে টুকরো টুকরো কবিতা লিখতেন, লিখে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে রাখা ওয়েস্ট পেপারের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। বনমালী সাফ করত ঝুড়ি, বাইরে সব ঝেড়ে ফেলে দিত। তখন খেয়াল হয় নি যে সে-সব টুকরো কাগজ কুড়িয়ে রাখি। একটা-দুটো এদিক-ওদিক হতে শেষের দিকে যা পেয়েছি আজ তা নেড়ে-চেড়ে দেখি, কত ভালো লাগে।

সহজ কথাবার্তার মধ্যে সহজ রহস্যের ছলেও দু-চার লাইনের কত কবিতা লিখতেন, লিখে ফেলে দিতেন।

একবার কোনো-এক কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র এল। কন্যাটি একটু চপলা স্বভাবের ছিল। তিনি কৌতুকভরে শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের উল্টো পাতায় লিখলেন—

অবিয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দূরে রবে পড়ি,
অন্য সব বন্যমৃগী যত ছিঁড়ে দড়াদড়ি
যখন করিবে সঞ্চরণ,
মন তব উঠিবে সন্তাপি।
মায়াবনে যে করে মৃগয়া,
নাই তার দয়া।

লিখেই ছিঁড়ে ফেললেন, বললেন, দেখিস, এ যেন বাইরে না যায়।

সে আজ কতকাল আগের কথা, আজ আর কেউ ধরতে পারবে না কাকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন গুরুদেব, তাই এ গল্প বললাম।

তেমনি আর-এক দিনের বিপরীত এক ঘটনা— আঘাত পেয়েছিলেন গুরুদেব কারো অকৃতজ্ঞতায়। হাত তখনো কাঁপছে, চিঠি লিখলেন তাকে।

এমনতরো কাঁপুনি হাতের লেখা তাঁর আর দেখি নি কখনো। সেক্রেটারিকে তখুনি সে চিঠি ডাকে ফেলতে দিলেন। উনি দেখেন আর ভাবেন এ চিঠি ডাকে দেবেন কি দেবেন না। খানিকপরেই গুরুদেব ডেকে পাঠালেন, বললেন, চিঠিটা ডাকে দিয়েছিস? দিস নি? ভালোই করেছিস। ছিঁড়ে ফেলে দে।

অসংখ্য অটোগ্রাফ-খাতা আসত গুরুদেবের কাছে প্রতিদিন। শুধু নাম-সইয়ে চলবে না, কবিতাও চাই। কয়েক ঝুড়ি কবিতা হবে সব একসঙ্গে করলে। একবার কে একজন এসে বললে, গান্ধীজী তাঁর প্রতিটি নাম-সইয়ে পাঁচ টাকা করে নেন, হরিজন ভাণ্ডারের জন্য। গুরুদেব বললেন, এ তো মন্দ কথা নয়। রোজ কত কত অটোগ্রাফ-খাতায় লিখি, এবার হতে আমিও এক টাকা করে নেব দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য।

আলুদা গুরুদেবের দেখাশোনার ভার নিয়ে আছেন কিছুদিন থেকে। আলুদার উপরে ভার দিলেন এই কাজের, মানে, হিসেবমাফিক টাকা তুলবার।

ছেলেরা অটোগ্রাফ-খাতা নিয়ে আসে, গুরুদেব কবিতা লেখেন— আলুদা গিয়ে সামনে দাঁড়ান। লেখা হয়ে গেলেই টাকাটা চাইবেন। গুরুদেব ধমকে ওঠেন, এরা এখানকার ছেলে, এদের কাছ হতে টাকা নিবি কি!

বাইরের কেউ অটোগ্রাফ নিতে এলে, পাছে আলুদা টাকা চেয়ে বসেন, আগে হতে আলুদাকে গুরুদেব চোখের ইশারায় মানা করে দেন।

ছাত্রীরা কেউ এলে তাদের নিজেই সাবধান করে দেন, আলু টাকা চাইলে যেন দিস নে তোরা। দৌড়ে পালিয়ে যাস।

আলুদা বলেন, তবে নিয়ম করলেন কেন?

গুরুদেব বললেন, নিয়ম করলেই কি সব মান তোমরা? যাও, নিজের কাজে যাও।

এই আমারই হাত দিয়ে কত অটোগ্রাফ-খাতা এসেছে গেছে— কত লোকের। সে-সব কবিতা এমনিই চলে গেল। লিখে রাখি নি কখনো। কত কত কাজের জন্য কত অনুতাপ জাগে মনে ক্ষণে ক্ষণে। একজন গুরুদেবের কিছু কথা চেয়ে অটোগ্রাফ-খাতা পাঠিয়েছেন। গুরুদেব কেমন একটু উন্মনা ছিলেন, সেদিন খাতাটি সামনে এনে ধরতে বলে উঠলেন, কি হবে রে কথা দিয়ে? কেবল কথা, কথা, কথা।

ব'লে খাতাটা টেনে নিয়ে লিখলেন পাতায়—

বাজে কথার ঝুলি
যতই কেন ভর্তি কর
ধূলিতে হবে ধূলি।

ভাবলাম, তাই বুঝি-বা। ধূলিই হয়ে যাবে সব। বুঝতে পারি নি তখন যে, কোন্ কথা ধূলি হয়— আর কোন্‌টা হয় না।

এত কথা এত স্মৃতি গুরুদেবকে নিয়ে যে, মনের মধ্যে সব জট পাকিয়ে যায়। একটা বলতে না-বলতে আর-একটা এসে জায়গা দখল করে। গুছিয়ে বলা যায় কেমন করে ?

শান্তিনিকেতন আশ্রম ছিল গুরুদেবের প্রাণ। তাঁর সারা জীবনের সাধনার রূপ এ। এর এতটুকু ক্ষয়ক্ষতি তিনি সইতে পারতেন না। যেন নিজেরই একটা অঙ্গহানি হল এমনই ব্যথা পেতেন। আশ্রমের শুভাশুভ ছিল সব-কিছুর আগে। সেখানে রক্তের সম্পর্ক ব'লে প্রাধান্য পেত না কেউ। বরং পরই তাঁর এ ক্ষেত্রে আপন হত বেশি। দেশে-বিদেশে যেখানে যা-কিছু ভালো দেখেছেন, বা তাঁর ভালো লেগেছে, আশ্রমে তা চালু করতে চাইতেন। জাপানে গেলেন, জুজুৎসু খেলা দেখে জাপান সরকারের কাছ হতে তাকা-গাকিকে নিয়ে এলেন। আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল ঢিলে পাজামা কোট পরে তাকাগাকির কাছ হতে জুজুৎসুর প্যাঁচ শিখতে লাগল। শিখে যেদিন এই খেলা আশ্রমবাসীদের দেখানো হল গুরুদেব নতুন গান বেঁধে দিলেন, উদ্‌বোধন সংগীত—

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

এই গান সেদিন কি উদ্দীপনাই না এনেছিল সকলের মনে।

আশ্রমে জলের সমস্যা, কিছুতেই এর উপায় পাওয়া যায় না। একবার আমেরিকা গিয়ে তিনি টিউবওয়েলের একরকম যন্ত্রপাতি দেখতে পেলেন। তখুনি বহু টাকা ব্যয় করে গুরুদেব তা আশ্রমে আনালেন। কিন্তু বিদেশী কোনো কোম্পানিই তা চালু করতে পারল না। তারা আসে কন্ট্রাক্ট নেয়, যন্ত্রপাতি ওল্টায় পাল্টায়, কাজ শুরু করে; পরে সরে পড়ে। দু-তিনবার এমনি হল। শেষে নিরুৎসাহ হয়ে টিউবওয়েলের কাজ সেভাবেই পড়ে থাকল। কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এর অনেক পরে অমূল্য বিশ্বাস মশায় এলেন। ইঞ্জিনিয়ারিংএ টেকনিক্যাল শিক্ষা তাঁর ছিল না, ছিল তাঁর শখ। অমূল্যবাবু সেই-সব যন্ত্রপাতিগুলি দেখে উৎসাহিত হলেন, বললেন, আমি দেখি-না একবার চেষ্টা করে ?

সেই অমূল্যবাবুই একদিন ঐ টিউবওয়েল বসিয়ে তুলে ফেললেন জল মাটির তলা হতে। সেদিন গুরুদেবের কি আনন্দ। বললেন, সভা সাজাও, সকলে সমবেত হও, অমূল্যকে আমি মান দেব।

অমূল্যবাবু লাজুক প্রকৃতির মানুষ, তাঁকে পাওয়া যায় না খুঁজে, অনেক কষ্টে এক রকম ধরে-বেঁধেই এনে বসানো হল তাঁকে। গুরুদেব বিশেষভাবে সেদিন সম্মানিত করলেন অমূল্যবাবুকে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই গান গাওয়া হল—

হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল,
আছিল শৈলশিখরে-শিখরে তোমার লীলাস্থল॥

সবেতেই যে গুরুদেব সফলকাম হতেন তা নয়, তবে চেষ্টা থাকত তাঁর। সেখানে হার মানতেন না। এমন-কি অন্য কেউ যদি আশ্রমের মঙ্গলের জন্য নতুন কিছু এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাইতেন, গুরুদেব তাঁকে উৎসাহ দিতেন। অনেক সময়ে আগে হতেই তিনি বুঝতে পারতেন যে, এ এক্সপেরিমেণ্ট টি কবে না শেষপর্যন্ত, বরং ক্ষতির পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে পড়বে, তবু নিরুৎসাহ করতেন না কখনো কাউকে। নতুন কিছু নিয়ে চেষ্টা করাকে তিনি দিতেন এতখানি দাম।

শুধু আশ্রম নয়, আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরাও ছিল তাঁর অনেকখানি। কি ভালোই বাসতেন তিনি তাদের। কারো গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিতেন না। একবারের এক ঘটনার কথা বলি— লর্ড কারমাইকেলের আমল হতে বাংলার যত লাট সবাই একবার করে এসেছেন আশ্রম দেখতে। লর্ড রোনাল্ডসে যখন আসেন, ভুবনডাঙা-বাঁধের কাছে আধ মাইল দূর হতেই মোটর হতে নেমে পড়লেন, বললেন, আমি ভারতের আশ্রমে যাচ্ছি ভারতীয় রীতি অনুযায়ীই যাব; হেঁটে যাব।

গুরুদেবের আশ্রমের প্রতি ছিল সবার এমনি গভীর শ্রদ্ধা।

সেবার, জন অ্যাণ্ডারসন তখন বাংলার লাট। কাছাকাছি কোথায় যেন ঘুরে আসছেন, সেই সাথে আশ্রম দেখে যাবেন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গুরুদেব জন অ্যাণ্ডারসনকে আমন্ত্রণ জানালেন। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। তাঁর আসার দিন-কয়েক আগে একদিন জেলা-শাসক এলেন গুরুদেবের কাছে। এর কিছুকাল আগে দার্জিলিঙে রেসকোর্সে জন অ্যাণ্ডারসনের উদ্দেশে বোমা

পড়েছিল; তাই এঁরা ভীষণ সন্ত্রস্ত। ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে, এঁরা আশ্রমের তিন-চারটি ছাত্র সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে চান।

গুরুদেব শুনে রুষ্ট হলেন। বললেন, আমার ছেলেদের আমি জানি। তারা আমার অতিথির অসম্মান কখনো করবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আপনি হয়তো নিরানব্বুই জন ছেলেকে জানেন, কিন্তু একটিকে জানেন না। ঐ একটিই হয়তো এমন কিছু করে বসবে যাতে করে আপনার আশ্রমেরই ক্ষতি হবে। আপনি অনুমতি করুন, আমরা কেবল ঐ তিন-চারজন ছেলেকে দু-তিন দিনের জন্য আটক রেখে দেব।

গুরুদেব বললেন, তোমাদের হাতে ক্ষমতা আছে, যা ইচ্ছে করতে পারো এবং যা ইচ্ছে করো; আমিও আমার কর্তব্য করব, সার্ জন অ্যাণ্ডারসনকে এখুনি তার পাঠাব যেন এখানে না আসেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেলেন, ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, না, না, তার পাঠাবেন না। দেখি অন্য কি উপায় করতে পারি আমরা।

বলতে বলতে তিনি উঠে এলেন সেখান থেকে। এসে আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হল। আশ্রম-কর্তৃপক্ষরা সকলে একসঙ্গে এলেন গুরুদেবের কাছে। লাট টুরে বেরিয়ে পড়েছেন, এখন তো আর প্রোগ্রাম বদলানো যায় না। তা ছাড়া সময়ও হাতে নেই যথেষ্ট। কি উপায় করা যায়?

গুরুদেব বললেন, বেশ, লাট আসুন। তবে আমার ছেলেদের গায়ে দাগ লাগবে এ আমি হতে দিতে পারি না। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক সবাই চলে যাক সেদিন বাইরে কোথাও। জন অ্যাণ্ডারসন এসে শূন্য আশ্রম দেখে ফিরে চলে যান; বুঝুন, তাঁর পুলিসের উৎপাত কতখানি বিঘ্ন ঘটিয়েছে এখানে।

এই ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেল। যেদিন লাট আসবেন সেদিন ভোরে আশ্রমের সবাই চলে গেল শ্রীনিকেতনে সুখ সায়রের ধারে পিকনিক করতে। পুলিসের ভয় তবু ঘোচে না। সাধারণ সাজে এখানে-ওখানে ঝোপেঝাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিস ঘাপটি মেরে রইল। লাট-এর কাছাকাছি যাদের থাকবার কথা তাদের একটা করে টিকিট দেওয়া হল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আর আশ্রম-সচিবের সই-সহ। নন্দদা তাঁর ছাড়পত্রখানা পরিহাসছলে ফিতের গেঁথে গলায় ঝুলিয়ে বুকের উপর বের করে রাখলেন।

লাট এলেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষরা তাঁকে নিয়ে আশ্রম দেখিয়ে উত্তরায়ণে উদয়নের বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। গুরুদেব সেখানে বসে ছিলেন অতিথির অপেক্ষায়। গুরুদেবের রাগের একটা ভঙ্গি ছিল বসার মাঝে। বাঁ হাতে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে বসে আছেন। চাপা রাগে সারামুখ লাল, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত কোলে চেপে গুরুদেব বললেন জন অ্যাণ্ডারসনকে, আমি যদি জানতাম যে আপনার এখানে আসা নিয়ে আমাকে এতখানি বিব্রত হতে হবে, তবে আপনাকে আসতে কিছুতেই আমন্ত্রণ জানাতাম না। **I had almost decided to send you a wire requesting you to cancel your visit।**

মনে আছে বলেছিলেন, **Supercilious policemen wanted to take my students into custody to ensure your safety।**

লজ্জায় অপ্রস্তুতে জন অ্যাণ্ডারসনের মুখও লাল হয়ে উঠেছিল সেদিন।

গুরুদেব পড়াতে খুব ভালোবাসতেন। তখন, শেষ দিকেরই কথা, বয়সের ভারে দেহ ভেঙে পড়েছে, আশ্রমের দায়িত্বভার ধীরে ধীরে তুলে দিয়েছেন এক-একজনের উপর এক-একটা। তাঁরাই আশ্রম চালান।

সে সময়ে একদিন এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এলেন আশ্রমে। এঁদের ছোটোছেলে পাঠভবনে পড়ছিল, এবারে তাকে নিয়ে যাবেন এঁরা, কলকাতায় রেখে পড়াবেন। গত পরীক্ষায় নাকি সে ফল ভালো করে নি। ভদ্রমহিলা গুরুদেবকে বললেন, আশ্রমের তো সবই ভালো, তবে গুরুদেব, ছেলেদের পড়াশুনাটা কিন্তু তত ভালো হয় না এখানে।

গুরুদেব চুপ করে রইলেন। বোঝা গেল খুবই আঘাত পেলেন।

তাঁরা চলে যেতে সেইদিনই বিকেলে গুরুদেব শিক্ষকদের ডেকে পাঠালেন। ছেলেদের পড়ায় মন নেই বা মাথা নেই বা তারা ক্লাসে দুষ্টুমি করে ইত্যাদি কথা গুরুদেব মানতেন না মোটেই। বলতেন, ছাত্রদের দোষ একেবারেই নেই। দোষ শিক্ষকদের। শিক্ষকরা ক্লাসে এমন ভাবে ছাত্রদের পড়াবেন যে, পড়ার বিষয়বস্তুটা তাদের মনে আপনা হতে ঢুকে যাবে। পাঠ্য-বিষয়কে একটা আকর্ষণীয় বস্তু করে তুলবেন শিক্ষক ছাত্রের কাছে।

গুরুদেব বললেন, কি করে পড়াতে হয় তোমরাই জান না। কাল পাঠভবনের যে-কোনো একটা ক্লাসে ব্যবস্থা কোরো, আমি নিজে নেব সে ক্লাস; তোমরা দেখবে।

ক'দিন হতেই গুরুদেবের দেহ বড়ো ক্লান্ত। আশ্রমের ভিতরে যাওয়া-আসা— হোক-না তা মোটরে, তবু— ওঠা-নামার একটা কষ্ট আছে। তাই উদয়নের দক্ষিণের বারান্দায় পরদিন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক -সমেত একটি ক্লাস বসল। আমিও সেদিন ছিলাম সেখানে, জাপানী-ঘরের জানালার ধারে গুরুদেব যে চেয়ারখানিতে বসেছিলেন তার ধারে বসে।

বাংলা ক্লাস। বই খুলে বসেছে শিক্ষার্থীরা বারান্দা জুড়ে গুরুদেবকে ঘিরে। কোন্ বই কি কাহিনী তা মনে রাখি নি। মনে আছে, গুরুদেব একটি ছেলেকে পড়তে বললেন। সে উঠে দাঁড়িয়ে বই হাতে একটি প্যারাগ্রাফ পড়ল।

গুরুদেব বললেন, আচ্ছা, তুমি বোসো। পরের ছেলেটিকে বললেন, তুমি পড়ো, বইয়ের যে জায়গাটা ও পড়ল সেইটেই আবার পড়ো।

সে পড়ল।

তাকে বসিয়ে আর-একটি ছেলেকে দিয়ে সেই একই জায়গা পড়ালেন। এমনি করে পর পর পাঁচ-ছয়টি ছেলেকে দিয়ে ঐ একটি প্যারাগ্রাফই পড়ালেন। বারে বারে জোরে জোরে পড়ার দরুন যারা পড়ল না কানে শুনল, তাদেরও কথাগুলি মনে গাঁথা হয়ে রইল।

সেদিনের সেই ক'লাইনের লেখার মধ্যে একটা কথা ছিল— 'স্তম্ভিত'। গুরুদেব সেই কথাটিকে ধরলেন। স্তম্ভিত কথাটা কি, কোত্থেকে এল, এর মানে কি? মনে আছে, সেদিন গুরুদেব সেই দক্ষিণের বারান্দার 'স্তম্ভ' হতে গাছ পাহাড় নদী হাওয়া ধরে ধরে একেবারে 'স্তম্ভিত মেঘে' নিয়ে গিয়ে ঠেকলেন। সেদিনের সেই ক্লাসে ছোটো বড়ো যারা ছিল 'স্তম্ভিত' তাদের মনে স্তম্ভের মতোই অটল হয়ে রইল।

পড়ে শোনাতেও গুরুদেব ভালোবাসতেন। যেদিন সন্ধেয় কোনো মিটিং বা রিহার্সেলের ব্যাপার কিছু না থাকত, গুরুদেব সেদিন কিছু-না-কিছু পড়ে পড়ে শোনাতেন সবাইকে। এ যেন জানাই ছিল সকলের, সন্ধে হলেই ছোটো বড়ো সবাই এসে জমতেন উদয়নের পশ্চিম-বারান্দায়, কোনার্কের ঘরে, শ্যামলীর চাতালে— যখন যেখানে থাকতেন গুরুদেব সন্ধ্যাকালে। হয় সেদিনের লেখা নতুন কবিতা পড়ে শোনাতেন, নয় পুরাতন কবিতা, নয় প্রবন্ধ গল্প যেদিন যা হয়। মাঝে মাঝে ব্রাউনিং কীট্স্ থেকেও পড়ে তর্জমা করে শোনাতেন।

এ আরো শেষের কথা তখন গুরুদেব উদীচীতে থাকেন। সে সময়েও কিছুদিন তিনি নিয়মিত শিক্ষাভবনের কবিতার ক্লাস নিয়েছেন। বিকেলে ঢং ঢং করে থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়তেই উদীচীর নীচের ঘরে এসে ভিড় করত ছাত্রছাত্রীর দল, গুরুদেব আগে হতেই দোতলা থেকে নেমে এসে বসে থাকতেন; তারা এসে বসতেই ক্লাস শুরু হয়ে যেত। সে ক্লাসে শিক্ষক ও শিক্ষকের স্ত্রীরাও এসে ছাত্রছাত্রী হয়ে বসতেন।

গুরুদেব কবিতা পড়তেন, ছন্দ মাত্রা যতি বোঝাতেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একমনে শুনতাম। গুরুদেবের কথা বলার সুরেই ছিল জাদু। যা পড়তেন, বলতেন— বুঝি না-বুঝি বলার সুরেই মুগ্ধ হয়ে থাকতাম।

প্রতি বুধবারে গুরুদেব মন্দির নিতেন। গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পরে শ্বেতপাথরের চৌকির উপর বসে যখন তিনি মন্ত্র পড়তেন— 'অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি'— নিথর হয়ে বসে থাকতাম। চোখ আটকা পড়ত রূপে, প্রাণ অবশ হত সুরে। বহু কথাই বুঝতাম না, বুঝবার আগ্রহই জাগত না। শুধু ভালো লাগত। কিসে ভালো লাগত জানি না, তবে এত ভালো লাগত যে ডুবে যেতাম সে ভালোলাগায়। কোনো অভাবই যেন ছিল না জানবার, বুঝবার। তবু যখন তিনি মন্দিরে বসে বলতেন, এই যে অসীমের বোধ— তার দুটো ধারা আছে। একটা হচ্ছে অসীমের মধ্যে নিজেকে দেখা, একটা হচ্ছে অসীমের মধ্যে 'তাঁকে' দেখা।

শুনে না-বুঝেও সারা মনে ঢেউ লাগত।

গুরুদেব বলতেন, আপনার আত্মার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি করার সাধনা হচ্ছে দুরূহ সাধনা।

কি জানি কেন, চোখে জল আসি আসি করত। তন্ময় হয়ে শুনতাম কথা— বস্তুজগতে যে সীমা সেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়বোধের সীমা। কিন্তু তা নয়— তার ইন্দ্রিয়বোধই বলছে আমার আনন্দ হচ্ছে আমার ভোগ। এই নশ্বর ভোগ কাটিয়ে যদি যেতে পার— সেখানে পরমানন্দের স্থান রয়েছে।

চোখের জমা জলটা তত্‌ক্ষণে পড়েই যেত দু গাল বেয়ে।

গুরুদেব বলে যেতেন, মানুষ জন্মাল বস্তুজগতে, কিন্তু বস্তুকে সে স্বীকার করে না। বলে, এ আমার নয়— এ কাটিয়ে যেতে হবে। অথচ তার চোখ কান

সব ইন্দ্রিয় বলছে, হ্যাঁ, এই তো সব, এর বাইরে কিছু নেই। কিন্তু অন্তরাত্মা বলছে, এ নয়, আমি সীমিত নই— এর বাইরে আমার স্থান। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। এই ইন্দ্রিয়ের বাধা ভেঙে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। এ যে কি বেদনা—

ভোরবেলাকে গুরুদেব বড়ো পছন্দ করতেন। যত ভোরেই উঠি-না কেন, দেখতাম, আরো ভোরে তিনি উঠে বসে আছেন। আকাশে ভোরের আলো লাগবার কত আগে অন্ধকার থাকতে উঠে গুরুদেব হাতমুখ ধুয়ে বাইরে এসে পুবমুখী হয়ে চেয়ারে বসে থাকতেন। কত কতদিন এ ছবি দেখেছি— হাত দুখানি কোলের মাঝে জড়ো করা নিস্পন্দ গুরুদেব বসে আছেন বাইরে। ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হল, পুব দিক লাল হয়ে উঠল, রোদ্দুর এসে মুখে মাথায় পড়ল, গুরুদেব উঠে ঘরে ঢুকলেন, বা আঙিনায় কোনো গাছের ছায়ায় লিখতে বসলেন। বলতেন, সকালে খানিকক্ষণ সূর্যের আলো গায়ে না নিলে আমার ভালো লাগে না।

সূর্যস্নানই করতেন যেন তিনি রোজ ভোরে।

গুরুদেব বলতেন, রাত্রির শেষ প্রহরে যখন বাইরে এসে বসি, আকাশ শান্ত, বাতাস স্তব্ধ, পাখিরা জাগে নি, গাছগুলিতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার— সব মিলিয়ে একটা গভীর নিস্তব্ধতা। তখন যে আনন্দ অনুভব করি তার নাম শান্তি।

উপাসনাকে তিনি দিনের সকল কাজের মধ্যে বড়ো স্থান দিতেন। প্রাতে সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীরা নিত্য-উপাসনায় বসত আপন আপন কোণে নিজের আসনে। উপাসনার পরে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আলাদা আলাদা হস্টেলের আঙিনায় দল দল একত্র হয়ে মন্ত্র পড়ত। নিয়মে বেঁধে দিয়েছিলেন গুরুদেব উপাসনা সকলের জন্য। দু বেলা নিয়মিত ঘণ্টা বাজে উপাসনার।

পরে এই উপাসনা নিয়েই গোল বাধল একসময়ে। তখন কলেজে— মানে শিক্ষাভবনে— নানা দেশের ছেলের ভিড়। বড়ো হয়ে যে ছেলেরা আশ্রমে আসে আশ্রমকে মেনে নিতে তাদের সময় লাগে। এটা-সেটা নিয়ে বহু অসুবিধা হয়। উপাসনাকেও তাই নিতে পারল না প্রাণে-মনে। অধ্যক্ষমশায় এসে জানালেন, সকাল-সন্ধ্যায় পনেরো মিনিট করে চুপচাপ উপাসনায় বসে থাকতে রাজি নয় সব ছেলে।

নিয়ম সবার জন্যই। কলেজের ছেলেরা ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবে, আর অন্যরা

উপাসনায় বসবে তা হয় না। গুরুদেব খুবই ব্যথিত হলেন, বললেন, তা হলে উপাসনা বাদ দিয়ে দাও, কেবল মন্ত্রপাঠই করুক সকলে মিলে।

কলেজের হস্টেল ছিল আশ্রমের এক প্রান্তে। তারা উপাসনায় বসুক না-বসুক আশ্রমের আর-সবার তাতে ব্যাঘাত ঘটবে না। ঠিক হল, শিক্ষা-ভবনের ছেলেরা সমবেত প্রার্থনার মন্ত্র পড়বে, বাকিরা যেমন উপাসনায় বসে তেমনি বসবে। সাঁঝ-সকালে আজও তাইই বসে।

অধ্যক্ষকে ব্যবস্থাদি দিয়ে সেদিন গুরুদেব বড়ো দুঃখ করে বলেছিলেন, দেখ, এই যে দিনরাতের সন্ধিক্ষণে দুবেলা খানিক চুপ করে আপনার মনে বসে থাকা— এর যে কি মূল্য বুঝবি পরে। এখন বুঝতে পারবি নে। তাই তো বলি তোদের, ভগবানকে ভাবতে নাই-বা পারলি, কিছু না ভেবেই চুপ করে খানিকটা সময় বসে থাকার অভ্যেস কর। জীবনে কাজ দেবে।

গুরুদেব গান গেয়েছেন শুনেছি বহুবার; কিন্তু আপনমনে আত্মভোলা হয়ে গলা খুলে দিয়েছেন, সে শুধু শুনেছিলাম একবারই।

তখন আমরা সিংহলের এক গ্রামে, বন্ধু উইলমট-এর মা'য় বাড়িতে। অভিনয়ের দল নিয়ে এসেছেন গুরুদেব। নানা জায়গায় নৃত্যনাট্য বক্তৃতা ছবির একজিবিশন হয়েছে, আরো হবে। মাঝখানে গুরুদেব ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে এলেন এই গ্রামে সবাইকে নিয়ে। গ্রামের নাম পানাদুরা। সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড বাড়ি উইলমট-এর মা'র। এ মাথা ও মাথা ঘুরে ঘুরে ঘর বারান্দা। সমুদ্রের তীর হতে নারকেল গাছের সারি ছুঁয়েছে এসে বারান্দা অবধি, মাথায় তাদের সবুজ পাতার ফোয়ারা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীলে সাগরের নীলে মাখামাখি। গাছের গোড়া বেয়ে ঢেউ-ভাঙা সাদা ফেনা এগিয়ে আসে বাগানের ভিতরে।

সেই বাড়িতে একদিন ভোরে চমকে উঠলাম সুর শুনে। কোথা হতে আসে এ সুর? কে গায় গান? বারান্দা দিয়ে ছুটে চললাম সুর ধরে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম গুরুদেবের ঘরের দোরে এসে।

গুরুদেব গাইছেন গান। আকাশে বাতাসে আলোতে হাওয়াতে আজ যেন একটা কিসের মাতামাতি। মাতামাতি সামনের ঐ সবুজ পাতায়, ঐ নীল সাগরের তরঙ্গে। গুরুদেব সেদিক পানে চেয়ে গলা ছেড়ে দিয়েছেন সাগরে; সাগরের হাওয়া এসে লাগছে তাঁর মুখে চুলে। সে এক মহাবিলীন ভাব।

তখন মনে ছিল গানের লাইন ক'টি; কিন্তু লিখে রাখি নি, তাই আজ দরকারের সময়ে হারিয়ে ফেললাম। হিন্দি কথা—দু-তিনটি মাত্র লাইন, অপূর্ব ভৈরব রাগ।

দেয়ালের গা ঘেঁষে লেখার টেবিল। লিখছিলেন বসে। লিখতে লিখতে বোধ হয় মুখ তুলেছেন, খোলা দরজা দিয়ে নজর গেল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলেন গলা খুলে। হাতে তখনো কলম ধরা।

গান শেষ হলে ধীরে ধীরে পিছু হটে এলাম। দেখি, নন্দদা উনি বোঠান মীরাদি অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। অমন গান আর শুনি নি কখনো। এ যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটি প্রাণভরা সুর বেরিয়ে এসে কার সাথে খানিক কথা কয়ে নিল।

ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন গুরুদেব মৃত্যুর মাস-কয়েক আগে একদিন যে, আমি তো এত কবিতা লিখলুম, গল্প লিখলুম, ছবিও কম আঁকলুম না; কিন্তু গান গেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি সে আর কিছুতে পাই নি। গান সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। গানের সুরে যেন অসীমের সঙ্গে এক মুহূর্তে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। এমনটি আর কিছুতে হয় না।

গুরুদেব নতুন নতুন বাড়িতে বাস করতে ভালোবাসতেন। এ ছিল তাঁর একটা শখ। খুব বেশিদিন এক বাড়িতে থাকতে পারতেন না। বড়োদের কাছে শুনেছি, তাঁরা হেসে বলতেন, আশ্রমের এমন কোনো বাড়ি নেই গুরুদেব একবার না থেকেছেন যাতে। নতুন কোনো বাড়ি তৈরি হলেই সেখানে উঠে যেতেন, বলতেন, এই বাড়িই আমার পক্ষে ঠিক হয়েছে। এখন থেকে আমি এখানেই থাকব। আবার অন্য বাড়ি উঠলে সেখানে গিয়েও এই কথাই বলতেন। গুরুদেবের এই বাড়ি-বদলানোর ব্যাপার নিয়ে সকলে মজা পেতেন। আমিও দেখেছি আমার কালে, পর পর কয়েকখানা বাড়িই বদলালেন গুরুদেব।

উদয়নের এ ঘর ও ঘর, একতলা দোতলা তেতলা উল্টেপাল্টে সবখানেই থাকা হল। সে তো গেল। আমি কোনার্ক থেকেই শুরু করি।

গুরুদেব থাকেন কোনার্কে। খুব শখ করে কোনার্ক তৈরি করালেন। এমনভাবে করালেন যেন, যে ঘরে বসে তিনি লিখবেন, সেখান হতে চারি দিকের দূর দিগন্ত অবধি পরিষ্কার দেখতে পান। উঁচু ভিতের উপর ঘর উঠল একখানা, তার চার দেয়ালই খোলা, শুধু ছাদটা ধরে রাখবার জন্য চার কোনায় চার থামের মতো খানিকটা করে ইঁটের গাঁথনি তোলা। সেই ঘরের মেঝে হতে বেশ খানিকটা নীচে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটি শোবার ঘর, পাশে স্নানের ঘর, আর দক্ষিণ-পুব কোণে তেমনি ঘর আর-একখানি, এণ্ড্রুজ-সাহেব এলে থাকতেন গুরুদেবের কাছাকাছি; নইলে ঐ ঘরটিতে বসে গুরুদেব খেতেন। এই তো দেখেছি তখন। বড়োঘরের গা-লাগা শোবার ঘর ও এই ঘরে যেতে-আসতে যে জায়গাটুকু, তার গা ছিল কাচে ঢাকা, মাথায় ছিল ছাদ। উত্তর দিকেও ঠিক এমনি। মাঝের বড়ো ঘরটির সামনে দু সিঁড়ি নেমে একটি বারান্দা, সেই বারান্দা হতে আরো দু সিঁড়ি নেমে পুব দিকে এগিয়ে আসা সারি সারি থামের মাথায় কোনার্কের বিখ্যাত লালবারান্দা। পশ্চিম দিকেও তাই। গুরুদেব ঘরে বসে লিখছেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হত যেন দূরে স্টেজের উপরে তিনি বসে আছেন। গুরুদেবও সেখান হতে দেখতে পেতেন, বাড়ি বাগান পেরিয়ে পথ নেমে চলে গেল দূরে বহুদূরে।

বেশ আছেন গুরুদেব সে ঘরে। মনের আনন্দে আছেন। কখনো-বা সন্ধেবেলা ঘরে নাচ হয় জলসা হয়, গুরুদেব বারান্দায় এসে দর্শকদের নিয়ে ঘরমুখী হয়ে বসেন ; বসে দেখেন, দেখে খুশি হন। যেন স্টেজেই হচ্ছে নাচগান, এমনিই আবহাওয়া জাগে।

কিছুকাল কাটল এ ভাবে। গুরুদেবের প্রথমে ঘর একঘেয়ে মনে হতে লাগল। ঘরের আসবাবপত্র উল্টেপাল্টে সাজালেন, তার পর ঘর বদল করলেন। খাবার ঘরে শোবার খাট এল, শোবার ঘর অতিথির জন্য রইল, লেখার সরঞ্জাম বারান্দায় নামল, বারান্দার চেয়ার গাছতলায় গেল। কাটল কিছুদিন। ফিরে শোবার খাট এবারে এল মাঝের ঘরে, লিখবার টেবিল তুলে নিলেন খাবার ঘরে। জানালার ধারে যে টেবিলটা ছিল, সেটা ঘুরিয়ে রাখলেন, আলোর দিকে মুখ করে বসতেন, সেদিকে পিঠ দিলেন। বই শেলফ্‌ হাতের কাছে ছিল, দূরে ঠেললেন। দূরে যা ছিল কাছে আনলেন। বাড়ির অর্ধেক আসবাব-পত্র বাইরে বের করে ঘর ফাঁকা করলেন ; আবার সেগুলি একই ঘরে ঢুকিয়ে নিজে তার মাঝে কোনোমতে একটু জায়গা করে নিলেন। এমনিতরো চলবার পর যখন ঘরের নতুনত্ব আনা যায় না আর-কিছুতে তখন গোটা বাড়িটার উপরই মন বিরূপ হয়ে উঠল তাঁর। কিন্তু সোজাসুজি বলতেও পারেন না আর-একটা নতুন বাড়ি তৈরি করার কথা। আশ্রমে টাকার অভাব ; গুরুদেবের যা-কিছু আয় তাতেই তলিয়ে যায় সব।

গুরুদেব একটু একটু করে জানাতে থাকেন কত অসুবিধে এখানে। শেষে একদিন সুরেনদাকে ডেকেই পাঠালেন। সুরেনদা তখন আশ্রমের বাড়িঘর তোলার কর্তা। বাড়ির প্ল্যান ক'রে, কত টাকা খরচ পড়তে পারে, সেই টাকা ফণ্ডে আছে কি না দেখে অগ্রণী হলে তবেই সে বাড়ি হতে পারত। যদি দেখতেন টাকার ঘাটতি, তবে দিনের পর দিন গুরুদেবের ধার-পাশ দিয়েও আসতেন না, এড়িয়ে থাকতেন। অনেকবার দেখেছি, গুরুদেব হয়তো তাঁকে ডাকিয়ে এনে বলেছেন, সুরেন সাহেব— আদর করে এই নামেই ডাকতেন তিনি তাঁকে, বলেছেন— এইরকম একটা ঘর বানালে হয় না? তা হলে দাও-না তাড়াতাড়ি তৈরি করে।

সুরেনদা ভালো করেই জানেন টাকার টানাটানি, 'আচ্ছা গুরুদেব হবে, কাল হতেই কাজ শুরু করে দেব' বলে তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে পালিয়ে

যেতেন। গুরুদেব বুঝতে পারতেন, বলতেন, এই যে সুরেন গেল, এখন কতদিন সে এমুখো হবে না।

এইবারও সুরেনদাকে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন। যেন খুব গুরুতর একটা ব্যাপার, এমনিতরো ভাব রেখে বললেন, দেখো সুরেন সাহেব, কোনার্কের এই পশ্চিমের বারান্দাটা বৃথাই পড়ে আছে, কোনো কাজে লাগে না। আমার বইখাতাপত্তর এত বেড়ে যায়, রাখবার জায়গা পাই নে; সে-সবেই ঘর জুড়ে যায়, বসে লিখব এমন স্থান থাকে না আমার। এই বারান্দাটা যদি একটু ঘিরে দাও বেশ লম্বা ঘর হয় একটা। আমি স্বচ্ছন্দে বসে লিখতে পারি সেখানে।

সুরেনদাকে সেদিন তিনি খুব ভালো করে বোঝালেন, বললেন, ভাবনার কিছু নেই, খরচ কিছুই তেমন লাগবে না। থামগুলো তো আছেই, ফাঁকগুলোতে যদি একখানা করে ইটের গাঁথনি তুলে দাও তবেই তো হয়ে যায়। তাও পুরোটা গাঁথতে হবে না; মাঝে মাঝে কাচের জানালা বসিয়ে দাও কয়েকটা। না, সুরেন সাহেব, তাড়াতাড়ি হাত দাও এটাতে, দেরি কোরো না।

তাড়াতাড়িই হল বারান্দা গাঁথা। বেশ বড়ো ঘরই হল। গুরুদেব খুব খুশি। বললেন, দেখ্ দিকি, কত সহজে ঘর হয়ে গেল। এই ঘরে এখন আমার লেখা শোওয়া সবই হতে পারবে।

নতুন ঘরে গুরুদেব ঘুরে ঘুরে দেখেন, বলেন, বারান্দার জন্য দুঃখ করছিস? বারান্দা তো নষ্ট হল না। এই দেখ্-না, বারান্দা ঘিরে বড়ো বড়ো জানালা, আর পশ্চিম দিকে খোলা দরজা; যেমন আগে চারি দিক দেখা যেত এখনো তাই যাচ্ছে। তার উপরে ঘর হিসেবেও কাজে লাগল। কত সুবিধে হল বল্ দেখি?

গুরুদেবের পছন্দমত ঘর সাজানো হল। শৌখিন কার্নিচার গুরুদেব পছন্দ করতেন না। যত নড়বড়ে তেপায়া টেবিল, সেই তাঁর পছন্দ। বলতেন, এর একটা পা না থাকাতে বরং ভালোই হয়েছে, এই ভাঙা দিক দিয়ে টেবিলটা যত ইচ্ছে টেনে কোলের উপর এগিয়ে আনা যাবে। লিখতে আমার সুবিধে হবে। পা-টা থাকলে আটকাত।

নতুন ঘরে গুরুদেবের খুব উল্লাস। কেউ দেখা করতে এলে সর্বাগ্রে তাকে

বোঝান, এ ঘরখানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কত অসুবিধে ছিল ; এখন বেশ আরামে আছেন।

কিছুদিন বাদে সুরেন সাহেবের ডাক পড়ল আবার। বললেন, দেখ, এ তো বেশ হল, তবে দুপুরবেলা বেজায় গরম হয়ে ওঠে ঘরটা। পশ্চিমের রোদ্দুর সোজা এসে পড়ে ঘরের ভিতরে। তাই ভাবছিলেম, পশ্চিম দিকে যদি ছোটো একটা ছাদ-ঢাকা বারান্দা তুলে দাও তবে রোদ্দুরের তাপ হতে বাঁচবে ঘরটা, ঠাণ্ডা থাকবে।

ঢাকা বারান্দা হল।

গুরুদেব খুব খুশি, বললেন, বারান্দা ঘিরে একটু উঁচু গাঁথনি তুলে দাও বেঞ্চির মতো করে, বেশ বসা যাবে তাতে। কেউ এলে উঠে সেই পুবের বারান্দায় যেতে হয়— আমার কষ্ট হয়। বারান্দা ঘিরে বসবার জায়গাও হল।

গুরুদেব আরো খুশি। দিন-দুই পরে বললেন, এটা কি হল— এ দিকটার বসবার সিটটা অত উঁচু করল কেন? আমি পশ্চিম আকাশ দেখব কি করে? ঘর হতে যে ওদিকটা আগের মতো দেখা যায় না আর।

তা হয়ে গেছে তো গেছেই, কি আর করা যাবে। বললেন, বারান্দায় বসেই সূর্যাস্ত দেখব তবে।

বারান্দায়ও সুবিধে হল না। এদিককার গাঁথনিটা অতটা উঁচু না করলেও পারত। যাক, এক কাজ করলে হয়। গুরুদেব একটা খাট আনালেন বারান্দায় ; খাটে উপরে একটি চেয়ার ওঠানো হল, একটা জলচৌকি রাখা হল নীচে খাটের কাছে। গুরুদেব জলচৌকিতে পা দিয়ে খাটে উঠলেন, উঠে চেয়ারে বসলেন। বললেন, বাঃ— এবারে চার দিক কেমন সুন্দর দেখা যাচ্ছে দেখ্! যতদূর ইচ্ছে দৃষ্টি মেলে দাও, কোনো বাধা নেই। আমার বড়দাদাও এমনি করে সমুদ্র দেখতেন পুরীতে, আমিও সূর্যাস্ত দেখব এখান হতে।

গুরুদেবের কাছেই শুনেছিলাম গল্প, হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি, বড়দাদা পুরীতে গেলেন। সমুদ্রের ধারে দোতালা বাড়ি, সেই বাড়ির ছাদের উপরে তক্তা তুলে তার উপর ইজিচেয়ার পেতে বড়দাদা সমুদ্র দেখতেন। নইলে নাকি ভালো করে দেখতে পেতেন না সমুদ্র।

গুরুদেব সেই পশ্চিম-বারান্দায় পর পর কয়দিন যেন ঘড়ি ধরে সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসতেই ঘর হতে বেরিয়ে এসে জলচৌকি বেয়ে খাটে উঠে চেয়ারে

বসেন, সূর্য ডুবে গেলে পর আবার তেমনি করে নেমে আসেন।

একদিন বললেন, এই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা, তাও নিজে পারি নে, এর হাত ধর, ওর কাঁধে ভর রাখ, এত কাণ্ড করে তবে সূর্যাস্ত দেখ। দরকার নেই বাপু এর। তার চেয়ে চল্ বাগানে খানিক ঘুরে বেড়াই গে। সূর্যও দেখা হবে, পা দুটোয়ও নাড়াচাড়া পড়বে। সারাদিন একভাবে বসে থাকি, কোনোদিন-বা এরা জানান দিয়ে বসবে, বলবে, এত অবহেলা? আর আমরা চলবই না।

বারান্দা হতে খাট সরে গেল, চেয়ার ঘরে ঢুকল। পশ্চিমের রঙিন আকাশ অলক্ষ্যে কালো হয়ে আসে, গুরুদেব একমনে লিখে চলেন ঘরে বসে। বাগানে বারান্দায় কোথাও দাঁড়িয়ে আকাশ আলো দেখবার অবকাশ নেই। লিখতে লিখতেই এক-একবার মুখ তুলে তাকান তিনি পুবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে। কি যেন কি দেখেন তিনিই জানেন। বিশ্বের রহস্যভেদী দৃষ্টি। সে দৃষ্টি দেখে অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছি কখনো, কখনো কৌতুক বোধ করেছি, কখনো খুশিতে উছলে উঠেছি।

কোনার্কের পশ্চিম-বারান্দার মায়া কাটল গুরুদেবের। একটানা সে লেখারও শেষ হল। যেন আরামের নিশ্বাস ফেললেন তিনি। বললেন, এবারে কয়দিন শুধু ছবিই আঁকব। ছবি আঁকতে আমি এত ভালোবাসি, অথচ এরা আমায় ছবি আঁকতে দেবে না। কেবলি বলে, এটা লেখো, ওটা লেখো। আর নয়, এবারে আমি খুশিমত ছবি আঁকব, ইচ্ছেমত কবিতা লিখব। কারো হুকুম মানব না। আন্ তো আমার রঙের ঝুড়িটা এখানেই।

বেতের বোনা একটা জাপানী ট্রেতে গুরুদেবের রঙের শিশি তুলি থাকে। পাশের ঘরে তোলা থাকত তা। ট্রে সমেত তুলে নিয়ে এলাম তাঁর কাছে। গুরুদেব বললেন, দেখ্, কিছুই হাতের কাছে পাবার জো নেই। বেশ লম্বা একটি ঘর হয় আমার, পর পর সব জিনিস সাজানো থাকে, ইচ্ছে হল লেখার টেবিলে বসে লিখলুম, আঁকার টেবিলে গিয়ে ছবি আঁকলুম— তা নয় একই জায়গায় সব। ছবি আঁকব তো লেখার জিনিস সরাও, লিখব তো ছবির সরঞ্জাম দূর করো।

ডাক পড়ল সুরেন সাহেবের। কিছুকালের মধ্যে সেই পশ্চিমের বারান্দা -ঘেরা ঘরের গা-লাগা উত্তর-পশ্চিম দিকে লম্বা একটি ঘর উঠল 'এল্' শেপের।

রথীদাকে পরে বহুবার বলতে শুনেছি, বাবামশায় এই বাড়ি এতবার ভেঙে ভেঙে বাড়িয়েছেন যে, এই টাকায় তিনখানা নতুন বাড়ি হয়ে যেত।

আর গুরুদেবকে বলতে শুনেছি, রথীরা বোঝে না কিছু। একটা নতুন বাড়ি করতে খরচ কম? আমি ঘর বাড়াতে বললেই ওরা বলে তোমার যদি এ বাড়ি ভালো না লাগে তো নতুন একটা বাড়ি তৈরি করে দিই। কিন্তু কেন এই বাজে খরচ? এই তো এ ঘরখানা উঠছে, এদিককার দেয়াল তো আগে হতেই ছিল, বাকি তিনটে দেয়াল তোলা আর ছাদ ঢালাই করা; কত সহজ ব্যাপার, আর খরচও কত কম। তা নয়, কেবল নতুন বাড়ি করে টাকা নষ্ট করা ওদের একটা রোগ।

'এল্' শেপের ঘরে জানালা ছাড়া দরজা মাত্র দুটি দুই প্রান্তে। সে দুটি বন্ধ করলেই ভিতরের পথ বন্ধ। গুরুদেব বললেন, এ না হলে প্রাইভেসি বলে থাকে না কিছু। সবাই সব সময়ে ইচ্ছেমত ঘরে ঢুকছে, বের হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করবার উপায় নেই। এ বেশ হল। দু দিকের দরজা দুটো বন্ধ করে দেব, কেউ আর ঢুকতে পাবে না— তুমিও না।

গুরুদেব বলেছিলেন, এই একটি ঘরেই আমার সব-কিছু থাকবে।

তাই উত্তর দিক হতে ঘরে ঢুকবার দরজার কাছটা হল শোবার ঘর, দক্ষিণমুখী একটু এগিয়ে এলে বসবার ঘর, আর-একটু এগিয়ে লিখবার ঘর, সেখানে দাঁড়িয়ে পুবমুখী হয়ে চার পা এগিয়ে এলে ছবি আঁকার ঘর, সেখান হতে আর-একটু এগিয়ে খাবার ঘর, খাবার ঘর হতে দু পা এগলেই ড্রেসিংরুম, সেখানে ঢুকে বাঁ-হাতি দু সিঁড়ি নেমে স্নানের ঘর; স্নানের ঘরে নেমে এক সিঁড়ি উঠে দু পা এগিয়ে দু সিঁড়ি নেমে স্নানের জায়গা, তারও দু সিঁড়ি নেমে মুখ ধোবার বেসিন। এই একই ঘরে সকল ঘর। এই প্রান্তে আর-একটা দোর।

গুরুদেব খুব খুশি। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ করবার হাঙ্গামা নাই। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে!

বললেন, কাঠের ফার্নিচার ঢুকবে না এ ঘরে। সব-কিছু সিমেণ্টের হবে। গুরুদেব কাগজে নকশা এঁকে এঁকে দেখান, বলেন, বসবার ঘরে বসবার সিটটা জানলার গায়ে এমনি ভাবে লাগানো থাকবে, পায়ার গড়ন হবে এমনিতরো— ভিতরের দিকে দুটো পায়া আর বাইরের দিকে থাকবে দুটো; চমৎকার দেখাবে। সিটের উপরে কম্বলের আসন বিছানো থাকবে, যারা আসবে এতেই

বসবে। কেউ এলেই যে চেয়ার মোড়া টানাটানি করতে হবে— তা কেন?

গুরুদেবের ইচ্ছামত সিমেণ্টের ফার্নিচার হল সব। শোবার পালঙ্ক, পালঙ্কে উঠতে জলচৌকি, মাথার কাছে বেডসাইড টেবিল, বসবার সিট, বই-এর শেল্‌ফ্‌, লিখবার টেবিল, সব-কিছু সিমেণ্টের হল। বড়ো ছবি আঁকতে হলে বড়ো বোর্ডের দরকার, কোলের উপর বোর্ড রেখে আঁকতে গুরুদেবের কষ্ট হয়। দেয়াল হতে এগিয়ে আসা সিমেণ্টের ঢালা বোর্ড হল। সেই বোর্ডে যত বড়ো ইচ্ছে কাগজ ছড়িয়ে ছবি আঁকো, কোনো অসুবিধে নেই। বোর্ডের ডান দিকের দেয়ালে সিমেণ্টের থাকে থাকে রইল রঙ তুলি কাগজের স্টক। স্নানের ঘরে বসে স্নান করবার টুলটাও হল সিমেণ্টের।

সব তৈরি শেষ হল। ঐ একটি ঘরই গুরুদেবের সম্পূর্ণ গৃহ। নন্দদা এলেন আমাদের নিয়ে সে গৃহ সাজাতে :

গুরুদেব বলেছেন, তোশক তাকিয়া লেপ বালিশ কিছু ঢুকবে না এ ঘরে। একমাত্র কম্বলের বিছানায় শোবেন তিনি। দুখানা কম্বল গায়ে দেবেন, দুখানা পেতে শোবেন।

নন্দদা আগে বিছানা তৈরি করতে লাগলেন। একগাদা থস্‌থসে সাদা কম্বল আনা হয়েছে কলকাতা হতে। আমরা এক-একটা কম্বল ভাঁজ করে সিমেণ্টের পালঙ্কে বিছোই, নন্দদা দু হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়ে দেখেন আর বলেন, আরো দু খানা দাও, নয় তো শক্ত লাগবে।

অনেকগুলি কম্বল বিছিয়ে তোশক হল। কম্বল ভাঁজ করেই মাথার বালিশ পাশবালিশ হল। সবের উপরে সাদা চাদর ঢেকে বিছানা তৈরি হল। ঘরের এখানে ওখানে রঙিন কম্বল-আসন পাতা হল। কাপড় জামা বই খাতা ঘরের যেখানে যা থাকার কথা সেগুলি সেভাবে সাজানো হল। মেঝেতে আলপনা দেওয়া হল। ধূপ জ্বালা হল। সব শেষে নন্দদা একমুঠো বেল যুঁই ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন। হাসিমুখে গুরুদেব গৃহপ্রবেশ করলেন।

এবারে বেশ কিছুকাল কাটল।

একদিন দেখি খাটে উঠতে যে সিমেণ্টের জলচৌকিটা ছিল সেটা ভেঙে বাইরে ফেলে দিচ্ছে রাজমিস্ত্রিরা। রাত্রিবেলা খাটে ওঠবার কালে পর পর কয়দিন হোঁচট খেয়েছেন ওটাতে, হাঁটুর নীচে লেগেছে খুব, কেটে গেছে; বলেন নি কাউকে। আজ রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে চৌকিটা ভাঙা হল। বললেন,

বিছানায় উঠতে নামতে অসুবিধে হয় পায়ের কাছে এটা থাকলে ; এখানে চৌকিটা নিষ্প্রয়োজন।

কয়দিন পরে বললেন, সিমেন্টের খাটে একটা অসুবিধে কি জানিস, আর নড়ানো যায় না। যেখানে বানাবে সেখানেই থাকবে। ইচ্ছে হল খাটটা এ দিকে ঘুরিয়ে শোব তার উপায় নেই।

সিমেন্টের পালঙ্কও ভেঙে বের করে আনা হল।

গুরুদেব নতুন ঘর ছেড়ে আবার পুবের লালবারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সারাদিন প্রায় সেখানে বসেই লেখেন। খোলা বারান্দায় কুকুরের উপদ্রব, নেয়ো কুকুরগুলি উঠে আসে সেখানে, সারি সারি মাটির কলসীতে বেলফুল-গাছ লাগিয়ে তা দিয়ে ঘেরা হল বারান্দা। পাশে উঠেছে বাতাবীলেবুর একটি চারা এক বর্ষার শেষে, গুরুদেব চেয়ে দেখেন গাছ দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে হাত-দুয়েক লম্বা হয়ে উঠল দশ-বারোটি চিকন সবুজ পাতা নিয়ে। সামনে শিমুল গাছের গা কেটে কেটে মালতীলতা উঠে গেছে উপরে। দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির পাশের ছাদের কোনা ছেয়ে আছে নীলমণি লতা। নীল ফুলগুলি হাওয়ায় ঘূর্ণি খেতে খেতে লালবারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে নীলতারার আলপনা কেটে। উত্তরে মধুমালতীর লতা লাল লাল কচিপাতা নিয়ে হাওয়ায় দোলে— যেন কার অঙ্গ আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠতে চায় সে।

ভোর না হতে মশারির ভিতর মাথা তুলে জানালা দিয়ে দেখি গুরুদেব এসে বসেছেন সেখানে ; রাত্রে ঘুমতে যাই তখনো দেখি তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে বসে আছেন সব বাতি নিবিয়ে দিয়ে। কখন উঠে বিছানায় যান, টের পাই নে, বেশির ভাগ দিন। বলেন, ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না আমার। বিছানায় তো আরো নয়।

বিছানায় যেতে তিনি পছন্দ করতেন না মোটেই। দেখতাম বিছানা এড়িয়ে যতখানি সময় পারতেন ইজিচেয়ারেই কাটিয়ে দিতেন। পরেও বহুদিন দেখেছি, যদি তাঁকে বিছানায় শুইয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাছাকাছি অপেক্ষা করছি, নেহাত দয়াপরবশ হয়েই যেন বিছানায় যেতেন। অনেকবার এমনও হয়েছে যে পরে আবার উঠে এসে চেয়ারে বসেছেন। গুরুদেব বিছানায় শুতেন— এখনো চোখে ভাসে— ঠিক যেন শিশু একটি। মশারিটা তুলে সেই-খানেই একপাশ ফিরে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়তেন। গোটা বিছানাটা খালি পড়ে

থাকত। অত বড়ো মানুষটি, তাঁর শোবার ভঙ্গি ছিল এই রকমের।

তখন আমরা থাকি মৃন্ময়ীতে। বিয়ের পর প্রথম সংসার পেতেছি এখানে; মায়া পড়ে গেছে এ বাড়িতে। মাটির বাড়ি। নিত্য তাতে কত উৎপাত; এ কোনা ঝাড়ি ও কোনা মুছি, চড়ুই পাখি তাড়াই, ইঁদুরে খড়কুটো কেটে কেটে ফেলে উপর হতে, সাফ করি; রাতারাতি উই ধরে দেয়ালে, আলকাতরা কেরোসিন তেল লাগাই। যত্নে বাড়িটিকে ছবির মতো সাজিয়ে রাখি। আনন্দে আছি।

গুরুদেব আসেন, বসেন, গল্প করেন। কখনো বা সন্ধে উতরে যায়, বনমালী সেখানেই তাঁর রাত্রের খাবার এনে দেয়। আমরাও ভাগ পাই; সুখে দিন কাটে।

একদিন গুরুদেব মৃন্ময়ীতে এলেন, সেদিন আর ঘরে ঢুকলেন না, বারান্দাতেই বসলেন। বললেন, জানিস, তোদের এই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। আমার একটা নতুন বাড়ি উঠবে— ভাবছি ঐ ওখানে। তোদের বাড়িটার সামনে। তখন এ বাড়িটা থাকলে পশ্চিম দিক আটকা পড়বে, তাই ভাঙতেই হবে।

তামাশা ভেবে হেসে উঠলাম। ভাবলাম, সেকি হয় কখনো? একটা গোটা বাড়ি ভেঙে ফেলা— বিশেষ করে এখানে, কে কবে শুনেছে?

গুরুদেব বললেন, কষ্ট হবে জানি, এজন্য রোজ একবার করে এ কথাটা তোকে শুনিয়ে দেব। শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে যাবে। পরে আর কষ্ট হবে না।

এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? হেসে উঠলাম।

গুরুদেব কৌতুক বোধ করলেন। চোখে-মুখে তাঁরও হাসি ফুটে উঠল। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম গুরুদেব মজাই করছেন তা হলে। তবুও সেদিন সে রাত্তিরে বারে বারে ঘুম ভেঙে এই কথাটাই মনে হয়েছে, এ বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে— সে কি করে সম্ভব হবে? কিন্তু যদি সম্ভব হয়? না, না, এ হতে পারে না। গুরুদেব মজা করেই বলেছেন এ কথা।

এর পর কয়দিন রোজই গুরুদেব একবার করে বলেন, বেশ হবে, এই বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে।

কিছুদিন পর এ কথা তিনিও ভুললেন, আমিও ভুললাম। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সে সময়ে মাদ্রাজে বিশ্বভারতীর কাজে গুরুদেব সেক্রেটারিকে পাঠাবেন, আমাকে বললেন, যাবি তুই? যা-না, ঘুরে আয় এইসঙ্গে, যা।

দু সপ্তাহের ছুটি। গুরুদেব বললেন, দেখিস, বেশি দেরি করিস নে যেন।

বাইরে কোথাও গেলে দু দিন পরই হাঁক ধরত, ফিরে আসবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করত; করে এখনো। গুরুদেব বলতেন, এ হচ্ছে এখানকার লালমাটির টান। ঘরছাড়া বাউলের দেশ এটা। দেখিস নে এখানে যত বাউল, এমন আর কোথাও নেই। লালমাটির টানই এমন।

দু সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতে ফিরে এলাম। কোনার্কের সামনের সেই শিমুলগাছের পরেই ছিল চামেলিবিতান। দেখতে দেখতে কত বদল হল সে-সবের। আগের সেই রূপ এখন ভেবে ভেবে ধরে আনতে হয়। অথচ কয়দিনেরই-বা কথা! কিন্তু একবার তার বদল হলে আগের রূপটি ধরে রাখা— কই তত সহজ তো নয়। এই তো এই কিছুকাল আগেও হিমঝুরির সারি কত কাছে ছিল, এখন লাল কাঁকরের আঙিনা তাকে ঠেলতে ঠেলতে কোথায় নিয়ে ফেলেছে। মাথার উপরে যে সবুজ পাতার লহরী শীতল ছায়া ফেলত, সাদা ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলার পথ সাজিয়ে রাখত, হাওয়ায় হাওয়ায় যে সুরভি এসে চমক লাগাত উন্মনা সন্ধ্যায়, কোথায় গেল তারা সব আজ? সে-সব দিনের কথা লিখতে বসে যেন প্রিয়জন হারাবার ব্যথা বাজছে বুকে। কত সহজে ভুলে যেতে পারি ভেবে অবাক হচ্ছি।

চামেলিবিতান— তারই ভিতর দিয়ে ছিল তখনকার দিনে গুরুদেবের কাছে কোনার্কে আসবার একমাত্র পথ। ঐ বিতান দিয়েই আসতে হত, যেতেও হত। মেয়েরা কত সময়ে বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে এসে বিতানে বসে আপন মনে গুনগুন গাইত; কলাভবনের ছেলেমেয়েরা বসে লতার ফুলের স্কেচ করত। ভ্রমরের অবিরত গুঞ্জন উঠত। চার খুঁটির উপরে ঢাকা-দেওয়া কাঠের চাল, ভিতরে দু পাশে ডালের রেলিঙ ঘেরা কাঠের বসবার জায়গা; তারই মাঝ দিয়ে চলার পথ। চামেলিলতা উঠেছে বিতান ঘিরে। আপনাতে আপনি জড়াজড়ি করে ঘনছায়া ফেলে স্নিগ্ধ করে রেখেছে জায়গাটুকু। দুপুররোদে তপ্ত পথ পেরিয়ে ছায়ায় এসে প্রাণ বলেছে— আঃ।

সে সময়ে কলকাতা হতে শান্তিনিকেতনে আসতে সন্ধেবেলায় একটা ট্রেন ছিল। বিকেলে রওনা হয়ে সন্ধের একটু পরেই আশ্রমে এসে পৌঁছনো

যেত। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা হয়ে আমরা সেই ট্রেনে ফিরে এলাম। ততদিনে বোলপুর স্টেশনে বহু পুরাতন ঝরঝরে দুটো ট্যাক্সি হয়েছে। একটা ট্যাক্সি করে আমরা আসছি। উত্তরায়ণের গেট পেরিয়ে মৃন্ময়ীর কাছাকাছি এসেছি, ট্যাক্সির হেডলাইট পড়েছে সামনে, দেখি গুরুদেব শিমুল গাছের পাশে লতা-বিতানের ধারে একটা বেতের চেয়ারে পথের উপরে বসে। যেন পথ আগলে আছেন। গুরুদেবকে দেখে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়লাম। ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসলাম, বললাম, একি গুরুদেব, এখানে কেন আপনি? কেমন আছেন? বাইরে একেবারেই মন টিকছিল না। একদিন কি হল জানেন—

এক নিশ্বাসে বলে চলেছি।

গুরুদেব বললেন, হয়েছে হয়েছে, থামো এবারে। আগে ঘরে ঢোকো, হাতমুখ ধোও, বিশ্রাম করো, তার পর সব শোনা যাবে।

কিন্তু সে কি হয়? এবারে যে বালা সরস্বতীর অন্ধ ঠাকুরমার বীণা বাজানো শুনলাম, এক ঘণ্টা বাজাল, সে কি চমৎকার! কত লোক জমা হয়েছিল তার ছোটো ছাদখানার উপরে। শুনতে শুনতে সেখানে বসেই ভেবেছি গুরুদেবকে গিয়েই বলতে হবে সব। পাশের বাড়িতে একদিন সারারাত কে যেন গান গাইল, কি মধুর গলা। ভাবলাম কোনো কিশোরী বুঝি গাইছে। তেতলায় ছিলাম আমরা, গান হচ্ছিল পাশের বাড়ির দোতলায়। গায়ে গা লাগা বাড়ি, জানালায় দাঁড়িয়ে সারা রাত ওদের বাড়ির জানালায় আলোটুকুই দেখেছি শুধু, আর কিছু দেখতে পাই নি। পরদিন শুনি এক বৃদ্ধা বাঈজীর গান হয়েছিল সে বাড়িতে কাল সারারাত ধরে।

গুরুদেব বললেন, শুনব, সব শুনব। আগে ঘরে ঢোকো, কাপড়চোপড় বদলাও, কিছু খাওটাও, তার পরে সব শুনব। এখন ওঠো, উঠে ঘরে যাও।

জোর করেই তুলে দিলেন। কি আর করি। তাড়াতাড়ি ঘর পানে পা বাড়িয়ে দিই। ওমা— একি! আর্তস্বর বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। যেখানে আমাদের মৃন্ময়ী ছিল সে জায়গা জুড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছে মস্ত বড়ো আকাশ। মৃন্ময়ী নেই!

ছুটে এলাম গুরুদেবের কাছে।

গুরুদেব চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন আর হাসছিলেন, বললেন, তা মন খারাপ

কোরো না, তোমার ঘরবাড়ি কেমন সাজিয়ে রেখেছি দেখো গে। এখন খাবার ঘর, বসবার ঘর, শোবার ঘর— কত ঘর হল তোমার। তুমি হলে রানী ; তোমার কি সাজে একখানি ঘরে থাকা ?

গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাও, খুশি-মনে কোনার্কে গিয়ে ঢোকো। আমি চলে গেছি উদয়নে, বউমার আশ্রয়ে।

পরে শুনেছি, বোঠান হেসে হেসে বলেছেন, বাবামশায়ের নতুন বাড়ির শখ হয়েছে তা সোজাসুজি বলবেন না। তোমরা মাদ্রাজ যাওয়ার পর একদিন ওঁকে ডেকে বললেন, তোরা কারো সুবিধে-অসুবিধে দেখতে জানিস নে। আমি একলা মানুষ, কতটুকু জায়গা লাগে আমার ? অথচ আমার জন্য এত বড়ো একটা বাড়ি ! আর অনিল— ওদের কাছে কত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-পরিজন আসে, ওদের জন্য একখানি মাত্র ঘর ; কুলোয় কি করে তাতে ? এ যে দস্তুরমত অবিচার। তার চেয়ে কোনার্কে ওদের থাকতে দেওয়া হোক। আমি নাহয় উদয়নেই থাকব।

গুরুদেব উদয়নে চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ী শুধু ভেঙে ফেলা নয়, সাফ করে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা হল। গুরুদেব বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি সরাও মৃন্ময়ী ; নয়তো রানী এসে চেঁচামেচি করবে, বাড়ি ভাঙতেই দেবে না।

গাঙ্গুলিমশায় এলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কোনার্কে। ঘরদোর জিনিসপত্র সব মিলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বাপ্‌রে বাপ, যা গেছে আমার উপর দিয়ে ! গুরুদেবের কড়া হুকুম ছিল, 'যেন একটি সামান্য কিছুও নষ্ট না হয় ওদের'। মৃন্ময়ী থেকে এ বাড়িতে এনে সব গুছিয়ে রেখেছি গুরুদেবের নির্দেশ-মতো ; দেখে নিন। বিছানাও পেতে রেখেছি তাঁর আদেশে। আর আজ রাত্রের খাবার বউমা করিয়ে রেখেছেন আপনাদের জন্য, ওখানেই খাবেন। গুরুদেব সেই ব্যবস্থাই দিয়েছেন।

বাইরে কোথাও গেলে যখন ফিরে আসতাম দিনে বা রাত্রে, সেই বেলাটা বোঠানের কাছেই খেতাম। গুরুদেবের ব্যবস্থা ছিল তা-ই, তিনিই বলে দিতেন বোঠানকে। এত নিখুঁত ভাবনা ছিল তাঁর সবার সব-কিছুরই প্রতি।

কোনার্কে ঢুকলাম। ঘরে ঘরে সব সাজানো। তৈরি সংসার।

কোনার্কের ঘরগুলি আগে পরে ভাঙাগড়ার জন্যও বটে খানিকটা, খানিকটা গুরুদেবের শখের জন্যও, ঘর-বারান্দার মেঝেগুলি এক-একটার এক-

এক রকম উচ্চতা। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। এই কারণে ছাদও ঠিক তেমনি। গুনে দেখেছি উঁচুনিচু চৌদ্দটা উঠতি-পড়তি ছাদ। গুরুদেব বলতেন, এতে করে সব সময়ে ছাদে ছায়া পাওয়া যাবে। সকালে এ ঘরের ছাদের ছায়া পড়বে ও ঘরের ছাদে; বিকেলে ও ঘরেরটা পড়বে এ ঘরের ছাদে, দুপুরবেলাও কোনায় কোনায় ছায়া পড়বেই; যখন ইচ্ছে ছায়ায় বসে বই পড়, সেলাই কর, ছবি আঁক। করতামও তাই। তখনকার কালে ছাদ ছিল দুষ্প্রাপ্য। সময়ে অসময়ে মেয়ের দল ছাদে উঠে বসে থাকতাম।

কোনার্কের এই উঁচুনিচু ঘরগুলিতে ঢুকতে বের হতে অনবরত হোঁচট খাবে নতুন মানুষ। কেবলই ওঠো আর নামো। দু সিঁড়ি উঠে সামনের বারান্দা, আরো দু সিঁড়ি উঠে আর-একটা বারান্দা, আরো দু সিঁড়ি উঠলে তবে বসবার ঘর। বসবার ঘর হতে দু সিঁড়ি নামো— খাবার ঘর। সেখান হতে এক সিঁড়ি নেমে ভাঁড়ার ঘর। ভাঁড়ার ঘর হতে তিন সিঁড়ি নেমে রান্নার বারান্দা। রান্নার বারান্দার পাশে এক সিঁড়ি নীচে গুদোম ঘর। স্নানের ঘরেও ধাপে ধাপে সিঁড়ি, মুখ ধুতে চাও নামো, স্নান করতে চাও ওঠো। আমরা হাসতাম আর বলতাম, বাড়ি তো নয় যেন গোলকধাঁধা। কোথা দিয়ে যে কোন্ ঘরের পথ, পাঠ পড়ার মতো মনে রাখতে হয়।

প্রথম রাত কাটল কোনার্কে। পরদিন সকালে গুরুদেব এলেন, শিমুলতলায় বসে চা খেতে খেতে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, নতুন বাড়িতে ঘুমটুম হল ভালো?

উনি বললেন, ঘুম তো ভালোই হয়েছিল গুরুদেব, তবে মাঝরাত্রে বড়ো ব্যাঘাত ঘটল।

গুরুদেব বললেন, কেন রে?

—একটা চোর ঢুকেছিল ঘরে।

—বলিস কি! নিয়েছে কিছু?

উনি বললেন, নিত প্রায় সবই, মস্ত এক পুঁটলিও বেঁধেছিল, শেষে চোর আমাকে ডেকে তুলল, বলল, 'বাবুমশায়, আমার অপরাধ হয়েছিল, ঢুকেছিলাম; এবার আমাকে বের হবার পথটা বলে দিন দয়া করে।'

শুনে গুরুদেব হো হো করে কি হাসিটাই হাসলেন সেদিন।

গুরুদেব বললেন, এবারে যে বাড়ি করব তাতে মেঝে থাকবে সব সমান। ঘরে চৌকাঠ বলেও কিছু থাকবে না। সিঁড়িও নয়। পথ আর ঘরের তফাতই বোঝা যাবে না। পথ আপনি এসে ঢুকবে ঘরে। কিন্তু সে কি আমার হবে? দেখ্‌ না, তোদের সকলেরই বাড়ি আছে, ঘর আছে, থাকবার একটা স্থায়ী বাসস্থান আছে। আর আমার? নিজের বাড়ি বলে কিছুই নেই, আমি তো বেশি কিছু চাই নে; একখানা শুধু মাটির ঘর— এমন আর কি? তোমাদের মতো বড়োলোকি চাল তো আমার নেই। দালানকোঠা তোমাদেরই মানায়। আমি গরিব মানুষ; মাটির কুড়েঘরই আমার ভালো। আর— দুদিন পরে তো মাটিতেই মিশব। সম্বন্ধটা এখন থেকেই ঘনিষ্ঠ করে রাখি।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুদেবের মাটির বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল। সাঁওতালী মাঝি-মেঝেন লেগে গেল একদল মাটি কাটতে, মাটি মাখতে।

গুরুদেব সকাল বিকেল শিমুলতলায় বসে বসে দেখেন, আর খুশি হয়ে ওঠেন। বলেন, এ একটা চমৎকার জিনিস হবে। মাটির দেয়াল কি কম শক্ত হয় ভেবেছিস? কত ঝড়-ঝাপটা বৃষ্টির ধারা এর উপর দিয়ে যায়, ভাঙে কি? তবে ছাদই বা মাটির হতে পারবে না কেন? একটু ঢালু করলেই তো হল, জলটা গড়িয়ে যাবে, ভয়ের কিছু থাকবে না। সুরেন বলেছে সেই রকমটিই সে চেষ্টা করবে এতে। এ যদি সাকসেস্‌ফুল হয়, তবে কত লোকের উপকার হবে। গ্রামের লোকেরা কত সহজে বাড়ি তুলতে পারবে, বাঁশ-খড়ের জন্ম ভাবতে হবে না।

মুখে মুখে রটে যায় কথা, মাটির ঘরে মাটির ছাদ তোলা হচ্ছে। হাটের পথে যেতে আসতে গাঁয়ের লোক এসে থামে সেখানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে, মাঝে মাঝে বাবুদের এটা ওটা শুধিয়ে জেনে নেয়। ঘুরে ফিরেই আসে তারা। সকলেই এক অপেক্ষায় আছে— কবে বাড়ি শেষ হবে, কবে মাটির ছাদ দেখবে।

গুরুদেব বলেন, আমার এত আনন্দ হয় যখন ওদের দেখি কত আগ্রহ নিয়ে এসে ওরা দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। কত উৎসুক ওরা, বাড়িটা কতক্ষণে

শেষ হবে— মাটির ছাদ উঠবে। একটা যেন কি আশা ওদের মনে। না, সুরেনকে বলতে হবে যেমন করেই হোক মাটির ছাদ টেকসই করে তুলতেই হবে। মাটিতে গোবর মেশালে, কাঁকর মেশালে, তুষ মেশালে— চাই কি আলকাতরাও মেশানো চলে; উই ধরবে না তবে। এই-সব মেশানো মাটিতে ছাদ মজবুত হবেই। বালিমাটি বলে বড়ো ছাদে যদি ফাটবার ভয় থাকে ছোটো ছোটো ছাদ করলেই হবে। তা ছাড়া ছোটো ঘরই আমি ভালোবাসি যে। বেশ ছোটো ছোটো ঘর হবে, এক জায়গায় বসে হাত বাড়িয়ে এদিককার ওদিককার জিনিস নাগাল পাব। ঘরের জিনিসপত্র কাছে কাছে থাকলে মনে হয় যেন ঘরটি আমার আপন ঘর। নিচু ছাদ কাছে নেমে আসে, চার দিকের দেয়াল কাছে কাছে ঘিরে থাকে, বড়ো আরাম লাগে মনে। নয় তো কি সব বড়ো বড়ো ঘর, উঁচু উঁচু ছাদ, জিনিসপত্র ঐ কোণে সেই কোণে, একটি বই দরকার তো উঠে গিয়ে শেল্‌ফ্‌ থেকে পেড়ে আনো— সে যেন নিজের ঘরেই পর হয়ে থাকা। আমার এই মাটির ঘরে তা হবে না। ছোটো ছোটো ঘর হবে সব।

মাটির বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ঘর হল মাটির হাঁড়ি দিয়ে। সারি সারি হাঁড়ির উপর হাঁড়ি সাজিয়ে দেয়াল উঠল। ছাদের উপরেও মাটির হাঁড়ি সারি সারি উপুড় করা হল।

গুরুদেব আগে বহুবার বহুজনকে বুঝিয়েছেন যে, গ্রীষ্মকালে ঘর গরম হয়ে যায় বল তোমরা, একটা কাজ করলেই তো পারো; অতি সহজ উপায়। ঘরের চার দিকে মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে তার উপরে চুনবালির পলস্তারা দিয়ে দাও। দেয়ালের মাঝখানে হাওয়া থাকার দরুন ঘরের ভিতরটা আর গরম হতে পারবে না। তোমরা একজন কেউ প্রথমে করে দেখো, পরে অনেকেই করতে পারবে। কিন্তু সেই 'প্রথম একজন' আর কাউকেই পাওয়া যায় নি এ যাবৎ।

এবারে গুরুদেব নিজেই সেই 'প্রথম একজন' হলেন। সুরেনদা ইতস্তত করেন। গুরুদেব বলেছিলেন, বেশ তো সুরেন সাহেব, সব ঘর যদি না-ই করতে চাও তবে একটি ঘর অন্তত আমার মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে করে দাও। আমি বলছি খুব ভালো হবে।

নন্দদা আসেন, গাছতলায় বসে জাফরির নকশা কাটেন; কলাভবনের দল নিয়ে মাটির দেয়ালে মাটির মূর্তি গড়েন। বাড়ির সামনে দক্ষিণমুখী

অর্ধচন্দ্রাকার খোলা আঙিনা। পথ হতে মাটি উঁচু হতে হতে উঠে এসেছে আঙিনায়, আঙিনা গেছে ঘরের ভিতরে ঢুকে। বাড়িতে উঠতে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না মোটে। ঘর হতে বেরিয়ে আঙিনা বেয়ে এলেই পথ, সেই পথই উত্তরায়ণের ফটক পেরিয়ে সোজা চলে গেছে আশ্রমে।

বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এল। সে বছর জন্মদিনে গুরুদেব গৃহপ্রবেশ করলেন। বললেন, শ্যামল মাটির বাড়ি, এ আমার 'শ্যামলী', আমার শেষ আশ্রয়। একখানা কাগজে লিখে রেখেছিলেন পেন্সিল দিয়ে—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।
...
সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত,
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি
সব কলঙ্কের মার্জনা...

গান্ধীজী সেবার এলেন, গুরুদেব এই শ্যামলীতেই তাঁকে থাকতে দিলেন। গান্ধীজীকে আলিঙ্গন করে বললেন, এই রইল তোমার বাড়ি এখানে। যখনই ইচ্ছে হবে চলে এসো, বিশ্রাম নিয়ো— আমি যখন থাকব না তখনো।

গুরুদেব চলে যাবার পরও গান্ধীজী দু বার এসেছেন আশ্রমে; থেকেছেন শ্যামলীতেই।

শ্যামলীর টুকিটাকি আরো কিছু কাজ বাকি। সেগুলি সারা হলেই সম্পূর্ণরূপে বাসোপযোগী হয় বাড়ি। গুরুদেব অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন, এখানে থাকলে কেবলই মনে হতে থাকবে কাজ আর এগচ্ছে না। তার চেয়ে গরমের সময়, বোট আছে ঘাটে বাঁধা, দু মাস গঙ্গায় স্বচ্ছন্দে কাটানো যাবে। ফিরে এসে নিশ্চিন্তে শ্যামলীতে থাকতে পারব।

সেই সেবারেই চন্দননগরে যাই, বলেছি সে কথা আগে।

গরমের শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন গুরুদেব। আনন্দ আর ধরে না। মহা উৎসাহে শ্যামলীকে সাজাতে লাগলেন। বসবার ঘরে মাটির বেদীর উপরে খেজুর-পাতার চাটাই পাতা হল। বাঁশের মোড়া, সরকাঠির চেয়ার

দিয়ে গৃহসজ্জা হল। কোনার্কের বারান্দায় রাখা বেলফুল গাছ-সমেত মাটির কলসীগুলি আনা হল শ্যামলীর সামনে। যেন ভুলে-যাওয়া কথা হঠাৎ মনে পড়ল, গুরুদেব বলে উঠলেন, আর আমার ঐ বাতাবিলেবু গাছটি? তাকেও আমার সঙ্গে চাই, আমার কাছাকাছি থাকবে সে।

সেইদিনই আড়াই হাত মাটি খুঁড়ে অতি যত্নে কচি গাছটি তুলে এনে পোঁতানো হল শ্যামলীর পাশে। এই গাছ একদিন বড়োও হল। ঘন সবুজ মোটা পাতায় ভরা তার কয়েকটি ডাল ঝিরঝিরে ছায়া ফেলল মাটিতে। কত সকালে গুরুদেব চেয়ার টেবিল আনিয়ে সেই ছায়ায় খাতা খুলে খুশি মনে বসে লিখতেন। ছোট্ট গাছটুকু ডিঙিয়ে সূর্য এসে পড়ত তাঁর কপালের উপরে, গুরুদেব গ্রাহ্য করতেন না; বলতেন, সকালের এই রোদের তাপটুকু বরং ভালোই শরীরের পক্ষে। বড়ো বড়ো গাছের নীচে বসলে এ সুবিধেটুকু পাই নে। বাতাবিলেবু গাছটি যেন ছোট্ট মেয়েটি, পাছে সে ব্যথা পায় তাই কত সহজে রোদের তাপ মেনে নিতেন মনে।

শ্যামলীর চার দিকে অনেকগুলি পাতিলেবু ও বাতাবির গাছ লাগানো হল। গুরুদেব বললেন, লেবু ফুলের গন্ধ আমি বড়ো ভালোবাসি। যখন ফুল ফুটবে দেখিস কি তার সৌরভ।

বর্ষায় যেখানে যে চারাগাছ উঠল শ্যামলী ঘিরে, তা আর সরাতে দিলেন না, বললেন, ওরা ঠিক জায়গা বেছেই উঠেছে, ও আর নড়িয়ো না।

এক পাশে উঠল জাম, বেল, মাদার, কুরচি; আর পাশে তেঁতুল, আতা, শিরিষ, ইউক্যালিপটাস্। পিছনের আঙিনায় আম, কাঁঠাল, সামনের আঙিনায় রইল ফুলে-ভরা গোলঞ্চের বাহার। গোবর-মাটিতে নিকোনো আঙিনা, গুরুদেব কখনো আমগাছের তলায় বসে লেখেন, মাদার কুরচি-তলায় বসে চা খান, কখনো গোলঞ্চের তলায় ছড়িয়ে-পড়া সাদা ফুলের মাঝে বসে বই পড়েন। শ্যামলীর চার দিক ঘিরে সে যেন এক ছোটো ছেলের খেলা। আজ দেখি গুরুদেব সকালে এখানে বসে লিখছেন, চন্‌বন্ করে মাথার উপরে সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত লিখেই চলেছেন; কাল দেখি জামতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো দেখি জামের কচি পাতা তার মুখে গালে হাত বুলোচ্ছে, কখনো আবার আমের বোল মাথার উপরে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে; হাজার মৌমাছি মেলা জমিয়েছে সে তল্লাটে।

ঘরের ভিতরেও তাই, দুপুরে এ কোনায় আছেন তো বিকেলে ঐ কোণে গেলেন; ছবি আঁকতে হলে আর-এক কোণ বেছে নিলেন। দিন-ভর চলে এমনি। সন্ধের পরে এসে বসেন শ্যামলীর সামনে খোলা অঙ্গনে। কত রাত অবধি থাকেন বসে একাকী স্তব্ধ হয়ে দু চোখ বুজে। কত কি ভাবেন, হয়তো কত কি দেখেন; কি জানি। চুপ করে পাশে বসে থাকি, ধীরে ধীরে হয়তো পায়ে হাত বুলিয়ে দিই; শেষে এক সময়ে নিজের চোখই জড়িয়ে আসে ঘুমে— প্রণাম করে পা টিপে টিপে চলে আসি ঘরে।

রকম রকম অতিথি আসেন, তাঁরা শ্যামলীর ফোটো তোলেন, ঘুরে ঘুরে দেয়ালের মূর্তিগুলি দেখেন, মাটির ছাদের কথা শুনে অবাক হন।

হতে হতে বারো মাস পূর্ণ হয়ে গেল শ্যামলীতে। এক বর্ষা গিয়ে আর বর্ষা এল। এবারে বর্ষার বড়ো ভীষণ রূপ। বৃষ্টির বিরাম নেই। তার উপরে এলোমেলো হাওয়ার দাপট। বীরভূমের বালিমাটি অল্পেতেই জল টানে, অল্পেতেই গলে। শ্যামলীর মাটির ছাদে ফাটল ধরেছিল, বর্ষার জল ভিতরে ঢুকে ছাদের মাটি ভিজিয়ে দিতে দিতে পুরো ছাদটাই ভিজিয়ে দিল। উপরে অবিরাম ধারা। আরো কিছুক্ষণ এইভাবে চললে ছাদ গলে ধসে পড়বে। সকলেই ভয়ে ভাবনায় অস্থির। গুরুদেব এক মনে লিখে চলেছেন, কারো উৎকণ্ঠায় তাঁর কান নেই। বিকেলের দিকে আর যেন ভরসা রাখা যায় না। আকাশ আরো ঘন হয়ে এল। বিদ্যুতে হাওয়াতে বজ্রে বৃষ্টিতে এক দারুণ আতঙ্ক সকলের প্রাণে। রথীদা বোঠান ওঁরা পর পর এক-একজন আসেন, গুরুদেবকে বোঝান, কাকুতি মিনতি জানান— 'অন্তত আজকের রাতটা আপনি উদয়নে এসে থাকুন'। গুরুদেব ধীরভাবে তাঁদের কথা শোনেন, ছাদের দিকে তাকান আর মৃদু মৃদু হাসেন। কিছুতে তাঁকে নড়ানো গেল না সেখান হতে। রাত এল। গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সবাইকেই চলে আসতে হল। শ্যামলীতে রয়ে গেলেন গুরুদেব একা। সারারাত চমকে চমকে উঠি, বিদ্যুতের ঝলকে জানালা হতে বারে বারে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। ভয় প্রাণে, না জানি কি দেখব সকালে। সন্ধে হতে বসবার ঘরের ছাদ গলতে শুরু করেছিল দেখে এসেছি।

ভোর হতে-না-হতে ছুটে এলাম শ্যামলীতে। গুরুদেব সেই বসবার ঘরে সেই মারাত্মক ছাদের নীচে ঘরের ঠিক মাঝখানে বসে বসে হাসছেন।

বললেন, জানিস, কাল রাতে ছাদ চাপা পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এত বড়ো খবরটা খবরের কাগজে উঠতে উঠতে ফসকে গেল— কি দুঃখের কথা বল্ দেখি! আচ্ছা, কাল যে এত ভয় পেয়েছিলি সবাই, ছাদ ভেঙে পড়বে মাথায়— এ হবে সে হবে, কি হল? কিছুই নয়। বেশ আছি, আমার জায়গায় আমি, ছাদের জায়গায় ছাদ, মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলি সব আমার জন্য।

সেদিনের ফাঁড়া কাটল। গুরুদেব বোঠানকে সন্তুষ্ট করতে দু দিন উদয়নে থাকতে এলেন। সেদিনই ছাদটা ধসল। বাকি যেটুকু রইল, তাড়াতাড়ি তিরপল দিয়ে ঢেকে দেয়াল বাঁচানো হল, নয়তো দেয়ালও গলে যাবে।

বর্ষার শেষে ফিরে আবার ছাদ মেরামত করা হল। এবারে কেবলমাত্র মাটি নয়, মাটির উপরে তিরপল দিয়ে তার উপরে আবার মাটি আলকাতরা লাগানো হল।

এবার আবার বাড়ি বদলাবার পালা। গুরুদেব দেখলেন, শ্যামলীর গেটটা যেন বেশি বড়ো, দূরের পথ দেখতে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং গেটটা ভেঙে ফেলা হল। বাঁশের বেড়া তুলে দেওয়া হল, ওটা এখানে একেবারে অকারণ। মাটির কলসীর বেলফুলের গাছ মাটিতে ছাড়া পেল।

গুরুদেব বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, চার দিক জিনিসে পত্রে ঠাসা, এর মাঝে আমি যেন বন্দী হয়ে আছি। একটু হাত-পা ছড়াবার জায়গা নেই। আমি চাই খোলামেলা একটি ঘর; তা নয়— যেখানেই যাব এগুলি সব আমার চার দিক ঘিরে থাকবে। বনমালী বলে, এগুলো সবই যে আপনার দরকারে লাগে, সরাব কি করে?

—কি মুশকিল, ছোটো ছোটো ঘরে বই টেবিল বোঝাই, তার মধ্যে থাকতে গিয়ে আমি যে হাঁপিয়ে উঠি। না, না, এ হয় না। আমার জন্য একটি ঘর করে দাও— এর পাশেই। একখানি মাত্র ঘর, চার দিকে খোলা বারান্দা।' জিনিসপত্র কিছু যাবে না সে ঘরে, সব থাকবে এখানে। আমার বইয়ের দরকার পড়ে, বলব কাউকে, 'যাও তো আমার অমুক বইটা এনে দাও দেখি শ্যামলী থেকে।' রঙের দরকার, নিয়ে আসবে রঙ; আবার কাজের শেষে যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দেবে। নতুন ঘরে থাকব কেবল আমি আর আমার হাতের একটি খাতা কি বই।

ঘর আরম্ভ হল— শ্যামলীর পুবে, হাত-কয়েক তফাতে।

গুরুদেব বললেন, এই ঘরে বিছানা বলেও থাকবে না কিছু। ঘরের মেঝে-জোড়া শোবার খাট, দিনরাত বিছানা পাতা থাকে, ভালো লাগে না দেখতে। এবারে খাট হবে তিন টুকরো তক্তা দিয়ে। রাত্তিরে টুকরো-কয়টা জোড়া দিয়ে খাট হবে, তার উপরে বিছানা থাকবে, সকালে আবার আলাদা করে তা দিয়েই ঘর সাজানো চলবে। কত সহজ ব্যবস্থা। রাতের খাট সকালে ভেঙে ঘরের তিন দিকে ঠেলে দাও, বসবার সিট হয়ে গেল, যারা দেখা করতে আসবে তাতেই বসতে পারবে। মিছিমিছি কতকগুলি আসবাবপত্রের কোনো দরকার নেই।

ঘর তৈরি হল, খাটও হল; তিনটে বড়ো বড়ো কেরোসিন কাঠের বাক্সের মতো, গায়ে খোপ খোপ কাটা, বাক্সের ভিতরে থাকবে রাতের বিছানা, খোপে থাকবে বইখাতা, ওষুধপত্তর দু-চারটা হাতের কাছের দরকারি জিনিস যা।

দেখেশুনে গুরুদেব খুব খুশি। বললেন, এই এতদিনে ঠিকটি হল— যেমনটি চেয়েছিলুম। এ ঘরে আর ভিড় নয়— পালাও সব। কেউ ঢুকতে পাবে না। ঐ শ্যামলীতে গিয়ে দেখাশোনা করব দুবেলা সকলের সঙ্গে। তবে, হাজির থেকো কাছাকাছি, শ্যামলী হতে বইটই এনে দিতে হবে মাঝে মাঝে।

খান-কয়েক বই নিয়ে গুরুদেব নতুন বাড়ি 'পুনশ্চ'তে এলেন। বললেন, টেবিলটাও না-হয় আনো এখানে। ওষুধের শিশিগুলিও তো চাই। আচ্ছা, ছবির রঙগুলো যে ও বাড়িতে রইল, আমার যদি রাত্তির বেলা ছবি আঁকতে ইচ্ছে যায়, তখন তো ঘুম ভাঙিয়ে তোমায় তুলে আনতে পারি নে, আমার অমুক অমুক রঙটা দিয়ে যাও বলে। রঙগুলি বরং তুমি এই ঘরেই এনে রাখো।

এটা-ওটা আনতে আনতে কয়েকদিনের মধ্যেই শ্যামলী খালি হয়ে গেল। গুরুদেব বললেন, পুনশ্চ'র এই পুব দিকের খোলা বারান্দাটা যদি কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেয় তবে কাঁচের ভিতর দিয়ে আমার দেখারও কোনো অসুবিধে হয় না, উপরন্তু ঘরের কিছু কিছু জিনিস ওখানে রাখতে পারি।

পুবের বারান্দা কাঁচ দিয়ে ঘেরা হল। গুরুদেব বললেন, দক্ষিণের বারান্দায় বৃষ্টির ছাট আসে। সারাদিন সেখানে বসে লিখি, জলের ছাটে অসুবিধে হয় কত।

দক্ষিণের বারান্দাও কাঁচ দিয়ে ঘেরা হল। পশ্চিম বারান্দায় উত্তুরে হাওয়া লাগে, তাতেও কাঁচ ঘেরা হল।

পুনশ্চ'র বারান্দায়

ীচী'র
প্রবেশ-অনুষ্ঠান

গুরুদেব বললেন, একটি ঘরে ভদ্রতা রাখা যায় না। কেউ এলে বসতে জায়গা দিতে পাই নে। এই দিকে একখানা ঘর যদি তোলা হয়, কেউ এলে অনায়াসে সেখানেই দেখাশোনা কথাবার্তা হতে পারে।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘর উঠল। গুরুদেব ঢাকা বারান্দা ছেড়ে সামনের খোলা বারান্দায় এলেন। সকালবেলা কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতে মাথার উপরে রোদ এসে লাগে; গুরুদেবের কষ্ট হয়। সুরেনদাকে বললেন, বারান্দার পুব দিকে যদি একটা খাড়া দেয়াল তুলে দাও তবে রোদ আটকায় খানিকটা। সকালে বেশ কিছুক্ষণ এখানে বসেই কাটিয়ে দিতে পারি তা হলে। নয়তো তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়তে হয়— আমার ভালো লাগে না।

বারান্দার পুব দিক জুড়ে খাড়া দেয়াল উঠল। পশ্চিম দিকের রোদ সারাটা বিকেল বারান্দা তাতিয়ে রাখে, বিকেলে বাইরে এসে বসা যায় না। এ দিকেও এমনি একটা দেয়াল তুললে ক্ষতি কি?

পশ্চিম দিকেও খাড়া দেয়াল উঠল। গুরুদেব সকালে বিকেলে দুই দেয়ালের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেন। দিন যায়। একদিন বলে উঠলেন— এ কি হল? আমি কি এ-ই চেয়েছিলুম? আমি খোলামেলা নীল আকাশ দেখতে ভালোবাসি, আর আমাকেই কিনা এমনি করে চার দিক হতে ঘিরে রেখেছে! একটু আকাশ দেখতে পাই নে আমি— এমন দুরবস্থা হল আমার! রথী, এবারে আমায় একটি ঘর করে দে, যাতে করে আমার আকাশ দেখায় বাধা না পড়ে। এক কাজ কর, চারটে উঁচু থামের উপরে একটা ঘর তোল। আমি সেখানে বসে বসে চার দিক দেখব।

সিঁড়ি উঠতে নামতে গুরুদেবের কষ্ট হয়। পাছে কেউ দোতলা ঘরের আপত্তি তোলে, গুরুদেব আগে হতেই ইঙ্গিতে তার সমাধান করলেন। বললেন, এ বাড়িতে একবার সিঁড়ি বেয়ে ঐ যে উঠব আর নামব না; ওখানেই থাকব।

বিকেলে বিকেলে গুরুদেব পায়চারি করেন, উত্তরায়ণে আশেপাশে জায়গা খুঁজে বেড়ান; শেষে বললেন, না; এবারে আর জায়গা ঠিক করে বাড়ি করব না, বাড়ি তুলে তার পর জায়গা ঠিক করব। এই কঙ্করকুঞ্জই ভালো, কি বলিস? কত গাছ— কাটা পড়বে ভয়? না, না, এগুলি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বাড়ি উঠবে, গাছগুলি বাড়ির গায়ে গায়ে থাকলই বা, ক্ষতি কি?

পুনশ্চের পুব দিকে কঙ্করকুঞ্জে চার থামের উপরে ঘর উঠল। সেঁজুতি বই বের হল; গুরুদেব বললেন, এ বাড়ির নাম হবে সেঁজুতি। পুনশ্চ বইয়ের সঙ্গে পুনশ্চ বাড়ি হল, সেঁজুতির সঙ্গে সেঁজুতি বাড়িও হবে। এক-একটা বইয়ের সঙ্গে এক-একটা বাড়ি; বিশ্বভারতী কতুর হয়ে যাবে, কি বলিস?

পরে সেঁজুতি নাম বদলে বাড়ির নাম দিলেন উদীচী; বললেন, পুব দিকের বাড়ি আমার— এই নামই ঠিক।

উদীচীতে গিয়ে গুরুদেব খুব খুশি। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চার দিক খোলা যতদূর দৃষ্টি যায়— কোনো বাধা নেই। গুরুদেব বললেন, এত বলে বলে ঠিক বাড়িটি হল এতদিনে।

এক সকালে গুরুদেব উপরের ঘর হতে নীচে নেমে এলেন, বাগানে বেড়াবেন একটু। বললেন, মাটি না ছুঁয়ে থাকতে কি পারি কখনো? মাটি যে আমি বড়ো ভালোবাসি।

খানিক পায়চারি করে গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। থামের গোড়ায় গোড়ায় চওড়া করে সিমেন্টের যে সিট করা হয়েছিল তার উপরে বসে পড়লেন। সোজা সোজা থামগুলি, দেখে দেখে বললেন, এগুলি এমনিই পড়ে আছে, কোনো কাজে লাগছে না। অথচ এই থাম কয়টাকে ঘিরে দিলেই উপরের মতো বেশ একখানি ঘর হয়ে যায়। তা হলে আর কষ্ট করে বারে বারে আমায় উপরে উঠতে হয় না। কোনোদিন ইচ্ছে হল নীচে নামলুম, নীচেই রয়ে গেলুম।

কয়দিন বাদে নীচের ঘরখানাও তৈরি হল। উপরে নীচে দুখানা ঘর, যখন ইচ্ছে গুরুদেব নীচের ঘরে থাকেন, যখন ইচ্ছে উপরে ওঠেন।

মনে মনে অপেক্ষা করছি, এই উদীচীও বদলাবার দিন হয়ে এল বলে। দেখি, এবারে কি অজুহাত তোলেন গুরুদেব।

সময় পেলেন না।

সেই যেবারে— যে বছর শ্যামলীর ইউক্যালিপটাসে থোকা থোকা ফুল এল, লেবুগাছে লেবু ধরল, জামের বোলে গাছ ভরল, ডালে ডালে আতা ফলল, পাতা ছেয়ে তেঁতুলের ছড়া নামল, গুরুদেব একদিন কালিম্পঙে রওনা হয়ে গেলেন— অসুস্থ হয়ে ফিরে এলেন— উদীচীতে আর এলেন না।

গুরুদেবকে হাতে খেতে দেখি নি কখনো, কাঁটা-চামচে খেতেন। অত্যন্ত মিতাহারী ছিলেন। সব মিলিয়ে দু-তিন চামচ পরিমাণ খাবার খেতেন। তাই বলে তাঁকে কম করে খাবার দেওয়া চলত না; অসন্তুষ্ট হতেন। থালায় বাটিতে নানা রকমের খাবার সাজিয়ে সামনে ধরা হত, তিনি বাটিগুলির ঢাকা খুলে খুলে আগে দেখতেন কি কি আছে। তার পর অমুকে মাংস ভালোবাসে তার বাড়িতে মাংসের বাটিটা গেল, অমুকে মাছ ভালোবাসে তাকে মাছের বাটি পাঠালেন। এমনিতরো কারো জন্য চপ্‌টা, কারো জন্য পায়েসটা, কারো জন্য বড়ির ঝোল; এই করে প্রায় সবটাই বিলি হয়ে যেত। কাছে কেউ থাকলে তাকে সেখানে বসিয়েই খাওয়াতেন। খাওয়াতে, খাওয়া দেখতে গুরুদেব খুব ভালোবাসতেন।

নিশিকান্ত কলাভবনের ছাত্র, খুব খেতে পারতেন; প্রায়ই গুরুদেব তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর নিশিকান্তবাবু দুলতে দুলতে— তাঁর চলার ভঙ্গিই ছিল অমনি— যখন গুরুদেবের ঘর হতে বেরিয়ে আসতেন, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন, আজ তিন দিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছি। আর সত্যিও তাই; পরের তিন দিন নিশিকান্তবাবু কিছু না খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।

অন্ধকার থাকতে উনুন ধরিয়ে বনমালী চা করে আনত। এক-একদিন অন্ধকার থাকতেই চা খেয়ে গুরুদেব লেখায় মগ্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই উনি ও আশেপাশের দু-চারজন জড়ো হতেন সেখানে, গুরুদেব নিজের হাতে চা ঢেলে খাওয়াতেন। তাঁদের আসতে দেরি হলে তিনি অপেক্ষায় বসে থাকতেন, এমনও দেখেছি কতদিন।

সকালবেলা মানুষ ছাড়াও আরো প্রাণী আসত তাঁর চা-এর আসরে। বোঠান একটি ময়ূর কিনে বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলেন— বাগানে ঘুরে বেড়াবে, সুন্দর লাগবে দেখতে। ময়ূর বাগানের শোভা বাড়াল ঠিকই কিন্তু বাগানে কেউ আর ঢুকতে পারে না। যে আসে তাকেই ময়ূরটা তেড়ে এসে নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়। অনেকে ক্ষতবিক্ষত হলেন। ছোটোদের বারণ করে দেওয়া হল বাগানে ঢুকতে; যদি ময়ূর চোখ উপড়ে নেয়!

চোখের উপরেই নাকি ঝোঁক বেশি ময়ূরের।

গুরুদেব তখন মৃন্ময়ীর চাতালে বসে চা খেতেন; ময়ূরটি রোজ এসে সামনের আলসেয় লম্বা পেখম ঝুলিয়ে গুরুদেবের অতি কাছাকাছি রঙের ছটা ছড়িয়ে বসে থাকত। ময়ূর দেখে ভয়ে একপায়ে দুপায়ে সবাই সরে পড়তাম। তফাত হতে দেখতাম গুরুদেব কবিতার খোলা খাতা কোলে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন ময়ূর; ময়ূর দেখছে গুরুদেবকে। মিনিটের পর মিনিট চলে যেত এইভাবে। সে যে কি সুন্দর— মনে হত রঙিন মোগল-ছবি একটি। কোনো-কোনোদিন গুরুদেব লিখেই যাচ্ছেন, চেয়ে দেখবার অবসর নেই, ময়ূর কিন্তু তেমনি ভাবেই কাছে এসে বসে থাকত; থাকতে থাকতে এক সময়ে কঁ্যা কঁ্যা করে ডেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত নীচের বাগানে। গুরুদেব মুখ তুলে দেখে আবার চোখ নামিয়ে নিতেন লেখার পাতায়।

লালু— দেশী কুকুর এক, ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা। কখন কোথায় থাকে জানে না কেউ। সে এসে ঠিক হাজির হত এই সময়ে। গুরুগম্ভীর চাল তার; এসে যখন গুরুদেবের পায়ের কাছে সামনের দুপায়ে ভর রেখে বসত, দেখাত ঠিক যেন পাথরে-খোদাই মন্দিরের সামনের সিংহমূর্তিটি। গুরুদেব চেয়ে দেখতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন; লালু স্থির হয়ে বসে মুখে গঁ-গঁ শব্দ করে লেজ নাড়ত। গুরুদেব পাঁউরুটিতে পুরু করে মাখন লাগিয়ে লালুকে দিতেন। লালু খেত। খাবার সময়েও লালুর এতটুকু চপলতা প্রকাশ পেত না। গুরুদেব বলতেন, এর কি ডিগনিটি দেখেছিস? এমন ভদ্র কুকুর দেখা যায় না বড়ো।

বনমালীর খুব লাগত। একটা কুকুর খায় এতখানি করে মাখন রোজ! এক-একদিন লালুকে আসতে দেখলেই বনমালী তাড়াতাড়ি আগে হতেই লালুর প্রাপ্য রুটিখানা মাটিতে রেখে পেয়ালা প্লেট মাখন চিনি সব-কিছু তুলে নিয়ে চলে যেত। লালু এসে শুঁকে শুঁকে দেখত মাখন নেই, স্পর্শও করত না, গম্ভীরভাবে হেলতে দুলতে গুরুদেবের আরো পা ঘেঁষে এসে বসত। গুরুদেবের খেয়াল হত, চেয়ে দেখতেন লালুর রুটি মাটিতে পড়ে, বুঝতেন কি ব্যাপার, বনমালীকে বলতেন, লালু খায় নি আজ, দেখেছ?

বনমালী বলত, তা এজ্ঞে কি করব আমি। রুটি তো হোথায় ঐ দিয়ে রেখেছি, দেখুন-না কেন?

গুরুদেব বলতেন, সে তো জানি, আর এও জানি তুমি শুকনো রুটি দিয়েছ

সকালে চায়ের টেবিলে

খেতে। জানো, লালু মাখন ছাড়া রুটি খায় না। নিয়ে এসো মাখনের বাটি এখানে, আমি নিজে মাখন লাগিয়ে দেব।

কোনোদিন আবার লেখায় ডুবে গেছেন লালু আসবার আগেই। লালু এসে অভ্যেসমত বসে, কিন্তু গুরুদেবের নজর কাড়তে পারে না। সেদিন বনমালী পিছন দিক হতে ইশারায় ডাকে লালুকে, লালু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুড়্‌সুড়্‌ করে উঠে আসে, বনমালী শুকনো রুটি একখানা ছুঁড়ে দেয়, যেন শোধ নেয় এতদিনকার মাখন খাওয়ার; বলে, খা আজ এই-ই, দেখি মাখন ছাড়া কেমন না রোচে। খেয়ে চলে যা এখান থেকে।

লালু যেন বুঝতে পারে ব্যাপার বেগতিক। কিছুমাত্র আপত্তি না জানিয়ে সেদিন কিন্তু সে মাখন-ছাড়া রুটিই খেয়ে নেয় খুশি মনে। অথচ গুরুদেবের কাছে কখনো এমন রুটি খেত না, শুঁকে মুখ সরিয়ে নিত। এ মজা কতবার দেখেছি। এই লালুকে নিয়েই গুরুদেব লিখেছিলেন কবিতা—

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।

শেষে আছে—

ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না—
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়॥

এ ছাড়া ধান চাল মুড়ি ছড়িয়ে দেবার বরাদ্দ ছিল রোজ সকালে শ্যামলীর সামনে। কাক শালিক পায়রা ঘুঘুর মেলা বসত গুরুদেবকে ঘিরে। সকালের কাজ শুরু হত গুরুদেবের এইভাবে।

সকালে গুরুদেব চা পাঁউরুটি-টোস্ট খেতেন, কোনোদিন বা একটা আধসেদ্ধ ডিম। আমের দিনে আম খেতেন, আম তিনি খুব ভালোবাসতেন খেতে। চুপিঠ কেটে চামচে দিয়ে তুলে নিতেন মাঝখানটা। অন্য ফল কখনো খেতেন একটু-আধটু।

গুরুদেবের চা খাওয়াটা ছিল বড়ো মজার। চা নামেই থাকত শুধু। কেটলিভরা গরম জলে কয়েকটা চা-পাতা ফেলে দিতেন, জলে রঙ ধরত কি না ধরত তারই আধপেয়ালা ঢেলে নিয়ে বাকিটা দুধ দিয়ে ভর্তি করে নিতেন, দু চামচ চিনি দিতেন; এই হল তাঁর চা। চা-এর জন্তই যে চা খেতেন, তা নয়। গরম পানীয় একটা খেতে হবে তাই নামেমাত্র চা খেতেন। 'চীনে চা'ই পছন্দ করতেন তিনি। সে চা'ও শুকনো বেল, যুঁই-এর। গরম জলে পড়লেই শুকনো পাপড়িগুলি খুলে ফুলের আকার নিত, আমরা দেখে চিনতাম এটা যুঁই, এটা বেলি। কখনো থাকত শুধুই চন্দ্রমল্লিকা খুদে খুদে আকারের। শুকনো ফুল, গুরুদেব বোধ হয় এই ফুলকেই বলতেন সেঁজুতি।

বেলা নটা নাগাদ খেতেন এক পেয়ালা শ্যানাটোজন কিংবা হরলিক্স কিংবা ঐ জাতীয় কিছু পানীয় বস্তু।

বেলা দশটা সাড়ে-দশটায় স্নানের ঘরে যেতেন। এগারোটা সাড়ে-এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতেন। দুপুরে দিশি ধরনের রান্না হত, শ্বেতপাথরের থালা-বাটিতে খাবার সাজিয়ে আনা হত। খাবার শেষে এ বেলায় একটু দই রোজই খেতেন।

বিকেলে চা; সঙ্গে নোস্তা মিষ্টি যা থাকত একটু হয়তো বা মুখে দিতেন কখনো, কখনো কিছুই খেতেন না, চা ছাড়া।

রাত্রের রান্না বিলিতি মতে হত। সুপ, মাছ বা মাংস, পুডিং— এইরকম।

যেখানে বসে লিখতেন সেখানেই লেখার টেবিল সরিয়ে অন্ত টেবিল লাগিয়ে বনমালী খাবার এনে দিত। কখনো কখনো রাত্রে উদয়নে গিয়ে খেতেন। পায়ে চলার এই একমাত্র সময় ও স্থান। কোনার্ক উদীচী পুনশ্চ শ্যামলী— যেখানে থাকতেন সেখান হতে সন্ধের দিকে উদয়নে যেতেন, ঐটুকু পথ হেঁটেই যেতেন। বিশেষ অতিথি-অভ্যাগত এলে তাঁদের নিয়ে উদয়নের খাবার-ঘরে টেবিলে বসেও খেতেন। সন্ধেরাত্রেই খেতেন তিনি। খাবার সম্বন্ধে কোনো-কিছুর প্রতি আকর্ষণ দেখি নি কখনো তাঁর। তবে চই সম্বন্ধে আগ্রহ দেখেছি। যশোরে হত; কচি বাঁশের গুঁড়ি নাকি, আমি কখনো দেখি নি হতে, গুরুদেবের কাছেই প্রথমে এর নাম শুনি, তিনি খেয়েছেন বহুবার। একবার একজন এনে দিলেন, ডাল দিয়ে রান্না হল, গুরুদেব আমাদেরও খেতে দিলেন; ডাঁটার মতো খেতে খানিকটা। খুব বেশি স্বাদ-সোয়াদ পেলাম না। গুরুদেব কিন্তু

বেশ আগ্রহ নিয়েই খেলেন। চই নিয়ে গুরুদেবের আগ্রহ দেখে বোঠান আড়ালে হাসতেন, বলতেন, বাবামশায়ের শ্বশুরের দেশের জিনিস কিনা তাই তাঁর এত ভালো লাগে।

কোথাও যেতে আসতে, পথে বা ট্রেনে, গুরুদেবের খাবার এমনভাবে সঙ্গে দেওয়া হত যাতে তাঁর সঙ্গে যাঁরা চলেছেন সবাই খেতে পারেন ঐ খাবার। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি অতিশয় রুষ্ট হতেন।

একবার কলকাতা হতে আশ্রমে আসছি গুরুদেবের সঙ্গে; গুরুদেব আছেন ফার্স্ট ক্লাসে, আমরা ইন্টারে লেডিজ কামরাতে। আমার সঙ্গে এক ফরাসী মহিলা, কিছুকাল হল আশ্রমে এসেছেন, শ্রীভবনের ভার নিয়ে আছেন। কলকাতা বেড়াতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। সেক্রেটারি ও আর দু-চার জন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব আর-এক কামরায়। সে ট্রেনটা রাত্রের ট্রেন ছিল। কতটুকুই বা পথ, সাড়ে-দশটার মধ্যে আশ্রমে পৌঁছে যাব, যে যার বাড়িতেই খাব; তাই ভেবে মামাবাবু জোড়াসাঁকো হতে কেবল গুরুদেবের মতো খাবার তৈরি করিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। গুরুদেবের খাবার সময় হয়ে যাবে, পথেই খেয়ে নেবেন, যেমন অন্যান্য বারে হয়। একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে বনমালী গুরুদেবের কামরায় উঠে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরল। গুরুদেব দেখে বলে উঠলেন, কে দিয়েছে খাবার করে?

বনমালী বললে, এজ্ঞে, মামাবাবু।

গুরুদেব কিছু না বলে বনমালীকে আদেশ দিলেন খাবারগুলি ফিরে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরতে। ভরা হলে বললেন, যা, রানীদের দিয়ে আয়।

আর-একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে বনমালী ছুটতে ছুটতে এসে খাবার-সমেত টিফিন ক্যারিয়ার কামরাতে ঢুকিয়ে দিল, বলল, বাবামশায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিছুই জানি না কি ঘটনা। গুরুদেব খাবার পাঠিয়ে দেন, খেয়ে নিই, এই তো জানি বরাবর। আমি আর ফরাসী বন্ধুটি মিলে খুব তৃপ্তিভরে সেই খাবার খেয়ে নিলাম।

পরের দিন জানলাম, সে রাত্রে আশ্রমে এসে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছেন গুরুদেব বোঠানের কাছে, বলেছেন, যারা আমার খাবার ব্যবস্থায় থাকে, তাদের এটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত যে আমার সঙ্গে সর্বদাই কেউ-না-কেউ থাকে। কেবল আমার আন্দাজ খাবার দেওয়া হল কোন্ আক্কেলে? ওরা সঙ্গে

আছে, ওদের ফেলে কি করে খেতে পারি আমি?

সে রাত্রে তিনি রাগ করে আর কিছুই খেলেন না, উপবাসী রইলেন।

বাড়ির মতো খাবার নিয়েও ছিল গুরুদেবের বিচিত্র খেয়াল। কোনো খাবারই একটানা বেশিদিন খেতেন না। বেশ চলছে, একদিন এক পণ্ডিত অতিথি এলেন, কথায় কথায় বললেন, আমাদের দেশে হবিষ্যান্নই একমাত্র উপযুক্ত আহার, শাস্ত্রে পুরাণেও সেই কথাই বলে; ব'লে কতকগুলি আখ্যান ও উপমার উল্লেখ করলেন। গুরুদেব মন দিয়ে শুনলেন। অতিথি চলে যেতে তিনি বললেন, ইনি যা বলে গেলেন ঠিক কথাই, আমাদের দেশ গরম দেশ। এ দেশে দেহমন ঠিক রাখতে হবিষ্যান্নই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। কাল থেকে আমাকে তাই দিয়ো বউমা। আমি কিছুকাল থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যা খাচ্ছি তা আমার দেহ ঠিকমত নিতে পারছে না। অথচ বুঝতে পারছিলাম না কি করা যেতে পারে। এবারে ঠিক আহার্য বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল।

তখুনি লোক ছুটল হাটে, কুমোরের ঘর হতে সদ্য-পোড়া লাল মাটির মালসা এল এক ঝুড়ি। এবেলা ওবেলা হবিষ্যান্ন রান্না হয় নতুন নতুন মালসায়; গুরুদেব খেয়ে খুব খুশি। বললেন, এই এতদিনে ঠিকটি হল। মাছ মাংস সাত-পাঁচ জিনিস, এতে করে পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া হয়, অপকারই ঘটে শরীরের। এই খাবার খেয়ে বেশ বুঝতে পারছি, কাল হতে খুব ভালো বোধ করছি আমি।

কিছুদিন গেল। এলেন এক বিদেশী বন্ধু, বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ডিমে সব রকমেরই খাদ্যগুণ আছে।

পরদিন হতে চাল কাঁচাকলা সরে গেল, ডিম এল। গুরুদেব কাঁচা কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে। গুরুদেব ভালো বোধ করেন। বলেন, এই খাবারই চলবে আমার এখন থেকে।

কয়দিন যেতে-না-যেতে এক অতিথি এলেন, আয়ুর্বেদে তাঁর বিশেষ অধিকার, বললেন, নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। রোজ কিছুটা করে খেলে শরীর সুস্থ না থেকেই যায় না।

গুরুদেব শুরু করে দিলেন নিমপাতার রস খেতে। সে কি একটু-আধটু? বড়ো একটা কাঁচের গ্লাসভর্তি রস, সবুজ রঙের থকথকে রস দেখে

আর নিমপাতার তেতো গন্ধে আমাদের গা গুলিয়ে উঠত। গুরুদেব তা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেন, যেন পেস্তাবাটা শরবত খাচ্ছেন। বলেন, জানিস— কি ভালো জিনিস এটা। এ খেয়ে অবধি আমি এত ভালো বোধ করছি, এমনটি কখনো করি নি। বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়; বেশি কেন— ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।

সেবাগ্রাম হতে একজন এলেন। বললেন, রসুন খুব উপকারী— বিশেষ করে বৃদ্ধলোকের পক্ষে। এতে হাত-পায়ের বাতের বেদনা ইত্যাদি যায়, আরো বহুরকম উপকার হয়। বাপুজি রোজ রসুন খান।

গুরুদেব শুরু করলেন রসুন খেতে; বাটা রসুনের ডেলা ডেলা বড়ি দু-বেলা।

এক বিদেশী ডাক্তার এলেন, তিনি জানালেন, আগুনে সিদ্ধ-করা রান্না তরকারিই আমাদের যত সর্বনাশের মূল। আগুনের তাত লাগল কি খাদ্যের সকল গুণ নষ্ট হয়ে গেল। সব-কিছু কাঁচা খাওয়া উচিত।

পরদিন হতে আগের ব্যবস্থা পালটে গেল। গুরুদেব বললেন, তাই তো, এরা আমায় কেবল যা-তা খাওয়াচ্ছে এতদিন ধরে। আজেবাজে সতেরো রকমের তরকারি— এ রাঁধতে-বাড়তেও তো কম ঝঞ্ঝাট নয়। অথচ কি উপকার এতে! তার চেয়ে কাঁচা সবজি কেটে কুচিয়ে খাও, একটু নুন দাও, লেবুর রস দাও— ব্যস্! খেতেও সুস্বাদু, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। এখন থেকে আমি এই খাব।

তিনি নিজেই বলে দিলেন, কি কি সবজি চাই; সেই-সব কুচোনো সবজি এল— মায় আলু পর্যন্ত। এ জিনিস কয়েক রকমেরই কাঁচা খাওয়া যায়। আলু লাউ কুমড়ো সে আবার কাঁচা খায় কি করে? গুরুদেব সব সবজি একটা বড়ো বাটিতে নিয়ে নুন লেবুর রস মিলিয়ে নিজে খেলেন খানিকটা, বাকিটা বাটিতে বাটিতে বেঁটে দিলেন স্নেহভাজনদের। আমার হাতেও দিলেন এক বাটি, বললেন, তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ, এখন থেকে এইরকম খাবার খাবে। এতে মোটা হবার ভয় থাকবে না। যত ইচ্ছে খাও— পেটও ভরবে, আলাদা একটা শক্তিও অনুভব করবে।

এ-সব তো গেল, কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হল যখন এক গুজরাটি অতিথি

এসে বললেন, ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দিয়ে পরোটা বানিয়ে খেলে জীবনে আর ডাক্তার ডাকতে হয় না। গুরুদেবের খাবার সময়ে যারা ধারে-কাছে থাকি, সেদিন তাদের মধ্যে এক আতঙ্ক ছড়াল। খাবার সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা যেন একটা নিয়মের মতোই ছিল। গুরুদেব খেতেন, খেতে খেতে গল্প করতেন, মন হালকা থাকলে হাসিঠাট্টাও জমত। কিন্তু ক্যাস্টর অয়েলের পরোটা শুরু হতেই কেউ আর আসি না সাহস করে গুরুদেবের খাবার সময়ে। প্রথম দিনই প্রমাদে পড়েছিলাম যখন গুরুদেব মোটা পরোটার আধখানা ভেঙে হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খা-না, খেয়ে দেখ্— অতি উপাদেয় এ।

মনে কেবল এক ভরসা— শিগগিরই আবার আর-একজন এলেন বলে, আর-এক ধরনের খাবারের গুণ ব্যাখ্যা করতে।

গুরুদেব কিন্তু খুব খুশি ক্যাস্টর অয়েলের পরোটা খেয়ে। বললেন, এই এতদিনে ঠিকটি হল— যেমনটি নাকি আমি চাইছিলুম।

কি জানি কি ছিল গুরুদেবের মধ্যে, তাঁর কাছে গেলেই যেন তখনকার মতো একটা পূর্ণতা আসত প্রাণে। মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-বেদনার তো অন্ত নেই কোনো, এটা-ওটা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, হাবুডুবু খাচ্ছি; গুরুদেবের কাছে গিয়ে প্রণাম করে পায়ের কাছে বসেছি, গুরুদেব হয়তো মাথাটা ধরে সস্নেহে নাড়া দিলেন, বহুবার বহুক্ষণে দেখেছি— অমনি নরম হয়ে এসেছে ভিতরটা। বসে থাকতাম, দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তা বলতেন, আসবার সময়ে হাসিমুখে চলে আসতাম। কেন যে গিয়েছিলাম, কি কথা যে বলতে চেয়েছিলাম, কিছুই মনে থাকত না আর। না-বলা-কওয়ার মধ্যেই একটা স্থির প্রশান্তি এসে যেত।

তাঁর কথাই ছিল মন্ত্র। একদিনের এক ছোট্ট ঘটনা, তখন আমি শ্রীভবনে থাকি, কলাভবনের ছাত্রী। এক দুপুরে কি জানি কি এক অজ্ঞাত বেদনায় অন্তর টলমল হয়ে উঠল। বৈশাখের তপ্ত দুপুর, সেই গন্‌গনে রোদ্দুরে গুরুদেবের কাছে ছুটে এলাম। গুরুদেব তখন থাকতেন উদয়নের নীচের ঘরে। সেই ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে লিখছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, এই একটু আগে একখানা ছবি এঁকেছি দেখ্, ব'লে টেবিলের দেরাজ টেনে একখানি ছবি বের করলেন। ছোট্ট ছবিখানি, নীল সবুজ সাদা রঙে মিলেমিশে কয়েকটা ঢেউ, যেন তুফান উঠেছে সাগর-জলে। উত্তাল তরঙ্গ। গুরুদেব ছবিখানি দেখিয়ে বললেন, মানুষের বেলায়ও এমনি, কেবলই তরঙ্গ। তরঙ্গ আছে বলেই সে বেঁচে আছে। এই তরঙ্গ যেদিন থামবে সেদিন জীবনেরও শেষ হবে। সে হবে তখন মৃত।

মনে মনে চমকে উঠেছিলাম সেদিন তাঁর কথা শুনে। ভাবলাম গুরুদেব কি করে জানলেন আমার ঠিক সেই সময়ের মনের অবস্থা। সেদিন হতে প্রতিটি তরঙ্গে তাঁর এই দিনের কথাগুলি স্মরণ করি।

ত্রুটিবিচ্যুতিতে শাসন ছিল গুরুদেবের; কিন্তু ব্যথা সামলাতে পারি নি— স শুধু ঘটেছে একবারই জীবনে।

বিকেলের দিকে গুরুদেব যেমন প্রায়ই যান উদয়নে, সেদিনও হেঁটে হেঁটে লছেন পিছন দিকে হাত দুখানি জড়ো করে। যেমন আমিও চলি রোজ

সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি যাচ্ছি পাশে পাশে; কি যেন কি হয়েছে আজ গুরুদেবের, সকাল হতে থম্‌থমে ভাব, একটুও কথা কইছেন না চলতে চলতে; বরং পা যেন জোরে জোরেই ফেলে চলেছেন কাঁকরের উপরে। উদয়নের কাছাকাছি আসতে বোঠানরা এগিয়ে এলেন। ঠিক কি কথা, সেদিনও শুনি নি, আজও জানি না, কিন্তু মনে হল যেন গুরুদেব রাগ করেই বলে উঠলেন— অনেকটা এই ধরনের কথা— 'পরের জন্য করা বৃথা'; আর মনে হল যেন আমাকেই ইঙ্গিত করলেন। মনে হতেই দুঃখে বুকটা মুচড়ে উঠল; পিছন ফিরেই এক ছুট লাগালাম। খেয়াল ছিল না কি করছি, কোথায় যাচ্ছি। ছুটতে ছুটতে আশ্রমের বাইরে একেবারে খোয়াইর ধারে গিয়ে পড়লাম।

আশাদি তখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ করেন, মাস-কয়েক হল আরিয়ামদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, নতুন ঘরকন্না পেতেছেন; আমাকে ছোটো বোনের মতো স্নেহ করেন। আশাদি আমাকে ওভাবে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে দেখে পিছু পিছু এসে আমায় জাপটে ধরলেন। আমি কাঁদছি তো কাঁদছিই— সে কান্নার আর বিরাম নেই। আমার উপরে রাগ করলেন গুরুদেব? আমায় বললেন এ কথা? কাঁদতে কাঁদতে সন্ধে উতরে গেল। আশাদি বললেন, এবারে ঘরে চলো।

আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।

বললেন, তা হলে আমাদের বাড়ি চলো।

চার দিক অন্ধকার। উঠে আশাদির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে এলাম। বেশ রাত হয়ে গেছে, খাবার ঘণ্টা পড়ে গেছে, আরিয়ামদা অপেক্ষা করছেন। আশাদি খাবার বাড়লেন, আমিও খেলাম, খেয়ে আশাদির কাছেই শুয়ে রইলাম।

ও দিকে সন্ধে হয়ে আসতেই গুরুদেব উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, রানী গেল কোথা? বনমালীকে পাঠালেন আমাদের বাড়ি খুঁজতে। আমি নেই।

তখন মৃন্ময়ীতে আমাদের বাস। উনি আমি দুজন কেবল পরিবারে। সপ্তাহ দুই হল উনি গেছেন কলম্বোতে। গুরুদেব যাবেন সিলোনের আমন্ত্রণে, সঙ্গে যাবে অভিনয়ের দল। আগে হতে ব্যবস্থাদি করে রাখার জন্য ওঁকে চলে যেতে হয়েছে সেখানে। গুরুদেব আমাদের নিয়ে রওনা হবেন পরের সপ্তাহে।

গুরুদেবের ব্যবস্থায় স্বামী যখন বাইরে কোনো কাজে যেতেন, আমি

থাকতাম বোঠানের কাছে। কোনোদিন তাই কোনো অসুবিধে গায়ে লাগে নি আমার।

গুরুদেব রাত দশটা পর্যন্ত বসে রইলেন উদয়নের বারান্দায়। জানেন, আমি ঘুমতে আসব উদয়নে।

তখনো যখন এলাম না, গুরুদেব অস্থির হয়ে উঠলেন। আলুদাদের দিয়ে আশপাশ খোঁজাচ্ছিলেনই, এবারে বনমালীকে দিয়ে লণ্ঠন হাতে বাড়ি বাড়ি খুঁজতে পাঠালেন। খুঁজতে খুঁজতে বনমালী এল আশাদির বাড়ি। শুনলাম গুরুদেব বসে আছেন এখনো। বড়ো লজ্জা হল। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলে গেছে বুঝতে পারছি, এ মুখ গুরুদেবকে আমি দেখাব কি করে? বনমালীকে বললাম, আমি কাল সকালে যাব।

বনমালী গিয়ে গুরুদেবকে খবর দিল। গুরুদেব আবার পাঠালেন বনমালীকে আমায় নিতে। বনমালীর সঙ্গে উদয়নে এলাম, শুনলাম গুরুদেব নিশ্চিন্ত হয়ে এইমাত্র শুতে চলে গেলেন।

ভালোই হল।

আমি উদয়নের দোতলায় পুপুর ঘরে গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ভোর না হতে বনমালীকে গুরুদেব পাঠিয়ে দিলেন— রানী যেমন আছে তেমনি তাকে একবার আসতে বল আমার কাছে। কোনার্কে ছিলেন গুরুদেব, আমি আসতেই উঠে দু হাতে আমাকে কাছে টেনে নিলেন।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, কেন তুই এত ব্যথা পেলি? আমি তো তোকে কিছু বলি নি। তোকে বলতে যাবই বা কেন? হয়তো হবে— কারো উপরে রেগে ছিলাম, তোর উপরে সেইটে গিয়ে পড়ল। আমার এমন হয় আজকাল, একের উপরে রাগ করি, পড়ে গিয়ে অন্যের ঘাড়ে।

গুরুদেবের সঙ্গে চা খেলাম, তিনিই ঢেলে ঢেলে দিলেন। চায়ের পরও ছাড়লেন না আমাকে, তাঁর পাশে বসিয়ে রাখলেন সারাদিন। দুখানি ছবি আঁকলেন পেন্সিল দিয়ে— অনেকখানি সময় নিয়ে। সন্ধের কিছুটা আগে শেষ হল ছবি, দুখানিই আমার হাতে তুলে দিলেন, বললেন, এই নাও, একটা আমার মুখ— রাগী রাগী ভাব; আর একটা তোমার মুখ— কেঁদে কেঁদে চোখ গাল ফুলিয়েছ, কেমন।

সত্যিই তাই, গুরুদেবের মুখই বটে, খুব সুন্দর হয়েছে। গুরুদেব নিজের

পোর্ট্রেট নিজে বেশ আঁকতে পারতেন মনে হতে। আর এখানা ঠিক আমারই মতো না হোক— ফোলা ফোলা চোখ গাল তো বটেই। হেসে ফেললাম দেখে।

গুরুদেব বললেন, চলো এবার রিহার্সেলে যাই। সময় হল।

গুরুদেবের সঙ্গে রিহার্সেলে এলাম উদয়নের বারান্দায়। সিলোনের জন্য শাপমোচন তৈরি হচ্ছে। ঐ ফোলা ফোলা মুখ নিয়েই ইন্দ্রাণী সেজে বসলাম, সখীর দলে নাচলাম আর ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে গুরুদেবের কাছে এসে বসে রইলাম। সবাই আমার মুখের দিকে যে তাকাচ্ছে— কেন, কি হয়েছিল —আমার সে-সব কথা আর মনেই রইল না। গুরুদেবের স্নেহে সব ভেসে গিয়েছিল।

দুই রানী— রানীদি আর আমি। গুরুদেব বলতেন, তুমি হলে 'নয়-রানী'; ও রানী হল 'হয়-রানী'।

নতুন নামকরণে খুশি হয়ে হাসি।

গুরুদেব বলেন, তুমি তো নয়-রানীই বটে, আর হয়-রানী হল সত্যিই 'রানী'। ওর স্বামী প্রশান্ত— দেখ তো কত বড়ো কাজ করে, কত টাকা মাইনে পায়। আর তোমার স্বামী কি, না, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। আরে, তুমি আবার 'রানী' কি? তুমি নয়-রানী।

গুরুদেব কখনো বলতেন 'তুই', কখনো বলতেন 'তুমি' আমাদের। যখন যে মনে থাকতেন আর-কি!

দিনে রাতে কাজে, বিনা কাজে কতবারই-না যেতাম তাঁর কাছে। লিখছেন, গাইছেন কি ছবি আঁকছেন, কথা যদি-বা না বলতেন কখনো, মুখ তুলে তাকাতেন বা হাসতেন— কিছু একটা করতেনই। কিন্তু এবার দু-তিন দিন পর পর কি যে হয়েছে, গুরুদেব কোনো সাড়াই দিচ্ছেন না। মৃন্ময়ীর ভাঙা-ভিত্ বাঁধিয়ে সুন্দর চাতাল তৈরি হয়েছে, এক কোণে ছাদ দিয়ে ঢাকা বসবার ব্যবস্থা; গুরুদেব সকালবেলা সেখানে বসে লেখেন, গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াই— গুরুদেব লিখতেই থাকেন, মুখ তোলেন না। ফিরে আসি। আবার কিছু একটা অজুহাতে কাছে যাই, হয়তো তখন সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। ফিরে আসি। খাবার সময়ে যাই— নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করেন। ফিরে আসি। ছটফট করি সারাদিন,

মনে হয় আমিই বুঝি-বা কোনো অপরাধ করে ফেলেছি। দুঃখে অভিমানে গুমরে উঠি। গুরুদেব কেন কথা বলেন না, কেন তাকান না, হাসেন না? এ কোন্ গুরুদেব? সেই গুরুদেব তো নন? কি হল? কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়।

সেদিন সন্ধেবেলা আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম দোষ যদি করে থাকি তো ক্ষমা চাইব তাঁর কাছে। গুরুদেব কৌচে শুয়ে বই পড়ছিলেন, ধীর পায়ে কাছে গিয়ে 'গুরুদেব' বলতে গিয়েই কেঁদে ফেললাম; তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিলাম।

গুরুদেব যেন বুঝলেন সব, বললেন, অভিমান করিস নে, ব্যথা পাস নে। তোদের আমি দূরে সরিয়ে রাখি নে, রাখতে চাইও নে। আমিই আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি সব জায়গা থেকে। যাবার সময় তো হল, কি হবে আর নিজেকে ছড়িয়ে রেখে? তৈরি হয়ে থাকি, সময় যখন হবে যেন সহজে চলে যেতে পারি। তাই বাঁধন সব আলগা করে রাখছি। আর কতকাল— অনেক তো হল, অনেক করেছি, গেয়েছি—

দুপুরবেলা কৌচে গা এলিয়ে বসে কোনো কোনো দিন বই পড়তেন, সেই হত তাঁর বিশ্রাম। মাঝে মাঝে গিয়ে কাছে বসতাম। বিজ্ঞান, ভ্রমণ-কাহিনী এ-সব বই তিনি পড়তে ভালোবাসতেন। কখনো কখনো আমাকেও বিজ্ঞান বোঝাতেন— যেন জল, হাওয়া, মাটি, আকাশ বিচরণ করাতেন। বলতেন, কোনো মেয়ে যখন বিজ্ঞানে ইণ্টারেস্ট নেয়— দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। কখনো কারো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতেন গল্প করে করে। জন্মমৃত্যুর রহস্যও বোঝাতে চেষ্টা করতেন; বলতেন, কত রকমের মৃত্যু আছে সংসারে। একটা বিলিতি কাগজে পড়ছিলুম খানিক আগে, গরম জলের টবে বসে হাতের নাড়ী কেটে দাও, আস্তে আস্তে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে শরীরটা ক্রমশ ঝিমিয়ে আসবে। কত সহজ মৃত্যু! জলে ডোবা মৃত্যুও সহজ। কেন যে লোকেরা ভীষণ ভেবে ভয় পায়! কথা হচ্ছে সেই যে একটা অতল অন্ধকার— সেইটেকেই ভীষণ ভেবে ভয় পায়। নয়তো দম আটকে আর কয় মিনিট ছটফট করতে হয়— সে কিছুই নয়। ওটুকু মৃত্যুযন্ত্রণা যেরকম করেই হোক সইতে হবেই।

বলেন, দেখ, আমি এক-এক সময়ে কল্পনা করি যে আমায় একটা সাপে কামড়াল। আচ্ছা বেশ; দেখতে দেখতে আমার সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে এল,

তার পরে মৃত্যুটা পর্যন্ত অনুভব করতে পারি। অবশ্য কল্পনাতেই। কিন্তু বেশ জানি— মৃত্যুটা কিছুই নয়।

একদিন দুপুরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, বললেন, জানিস, আজ একটা মজার খবর বেরিয়েছে। ব'লে পড়ে শোনাতে লাগলেন, একটি সাত-আট বছরের মেয়ে, জাতিস্মর, সে বলেছে গতজন্মে বৃন্দাবন-পরিক্রমার সময়ে পায়ে হাড় ফুটে সেপটিক হয়ে মারা গিয়েছিল। সে নাকি মথুরায় চৌবেদের ঘরের বউ ছিল। পুলিস ও পণ্ডিতের দল সবাই মিলে তাকে নিয়ে গেল মথুরায়। মেয়েটি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে, সদর দোরে শ্বশুরকে দেখেই চিনল। শ্বশুরকে প্রণাম করে গটগট করে ভিতর-বাড়িতে চলে গেল— ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই মেয়েকে দেখলাম এবারে দিল্লীতে পঁচিশ বছর পরে। এতকাল বাদে মনে পড়ল এ কাহিনী। মনে হল গুরুদেব আজ জীবিত থাকলে দৌড়ে গিয়ে বলতাম, গুরুদেব, সেই মেয়েটিকে— সেই চৌবে-ঘরের বধূকে— দেখলাম আজ।

আর-এক দুপুরে গুরুদেব কৌচে চোখ বুজে বসে আছেন, ডান হাতখানি কোলে এলানো। চেয়ারের হাতলের উপর কনুই ভর-দেওয়া বাঁ হাতখানি থুঁতনির নীচে। মৃদু মৃদু পা নাড়াচ্ছেন দেখে বুঝলাম ঘুমোন নি। কাছে গেলাম। গুরুদেব তেমনি ভাবেই বললেন, আচ্ছা রানী, বল্ দেখি— ধর তোর মৃত্যুর পরে— মরতে আমি তোকে বলছি নে— তবে মরতে তো হবেই একদিন—

শুনেই হেসে ফেলি। গুরুদেবও হাসলেন। বললেন, তা হলে তোর মৃত্যুর পরে— অবশ্য মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি না জানি নে, ধর্ যদি কিছু থাকে— আর যদি কিছু পুণ্য করে থাকিস, সেই জোরে বিধাতা যিনি, তিনি যদি তোকে বর দেন যে, এবারে পুরুষ কি নারী, যা তোমার ইচ্ছে তাই হয়েই জন্মগ্রহণ করো। তা হলে তুই কোন্‌টা বেছে নিবি?

গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ভাবলাম, ভেবে বললাম, মেয়ে হয়েই জন্মাব। গুরুদেব বললেন, ভালো করে ভেবে বল্।

ভালো করে ভাবলাম, বললাম, মেয়েই হব গুরুদেব।

গুরুদেব সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, অবাক করলি আমায়। নারীজন্মে এমন কি পেলি তুই ?

আপন মনে যেন বলে যেতে লাগলেন— সুখ, সৌভাগ্য, কর্ম, যশ, কত সীমাবদ্ধ ; কোনো দিকেই তো তোদের মুক্তি নেই। তবু বলবি মেয়ে হয়েই জন্মাই যেন। কিসের জন্য ? কি সুখ পেয়েছিস নারীজন্মে ?— আমায় ভাবনায় ফেললি যে। মেয়েদের কাজে এত বাধাবিঘ্ন, তাদের আছে ঘরকন্না, আছে মাতৃত্বের গৌরব। যে যা-ই হোক-না কেন— এ-সবের হাত হতে কোনো মেয়ের রেহাই নেই। আমি একে খারাপ বলছি নে, এরও একটা দাম আছে কিন্তু কোনো মেয়ে তার প্রতিভায় দশজনের একজন হয়েছে— খুব কম দেখা যায়। এটা মানতেই হবে পুরুষের ও মেয়েদের 'বিল্ড' সব দিক হতেই আলাদা। পুরুষের 'ব্রেন', তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর্‌-না কেন, আমি যদি আমি না হয়ে আমার ন দিদি হতুম তবে কি আমি এই আমি হয়ে উঠতে পারতুম ? ন দিদিও তো লিখতেন, প্রতিভা ছিল তাঁর ; তিনি থেমে গেলেন। সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের 'ব্রেন' এতটা কাজ করতেই পারে না। তবু বলবি তুই মেয়েই হবি ?

বললাম, হু।

আরো কত কথা, কেন যে তিনি এত-সব কথা বলতেন, কি জানি। কিছুই বুঝতাম না তখন।

কখনো-বা রাত্রিবেলা বাইরে খোলা আকাশের নীচে বসে থাকতেন— বলতেন গ্রহনক্ষত্রের কথা, বলতেন আকাশের কথা, বলতেন আরো উপরে আরো উপরে তারও উপরের কথা। আজ ভাবি, এখন যদি শুনতাম আবার তাঁর মুখে ঐ-সব কথা— হয়তো-বা বুঝতাম কিছুটা।

কারো সামান্যতম সেন্টিমেন্টেরও গুরুদেব মূল্য দিতেন অনেকখানি।

তখন গুরুদেব রোগশয্যায়, রাশি রাশি চিঠি আসে রোজ, পড়ে শোনানো হয় বেছে বেছে। গুরুদেবের ভাবনা জাগে বা ব্যথিত হন— এমন-সব চিঠি সম্বন্ধে সাবধানতা নেওয়া হত। সহজ সুন্দর চিঠিগুলিই শোনানো হত তাঁকে। কখনো-বা দু-একটি হাসিকৌতুকের চিঠিও পড়া হত তাঁর শারীরিক অবস্থা বুঝে। অনেকেই গুরুদেবের অসুখের খবরে নানা বিধানপূর্ণ চিকিৎসার উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতেন, তা আর তাঁর কাছে আনা হত না বড়ো।

একদিন বাংলাদেশের কোনো এক গ্রাম হতে এক প্রৌঢ়া ধাত্রীর চিঠি এল আঁকাবাঁকা অক্ষরে। গুরুদেবের অসুখ শুনেছেন, তাই লিখে পাঠিয়েছেন এই পাঁচনটা বানিয়ে দু বেলা খেলে ভালো হয়ে যাবেন। পাঁচন তৈরি করতে অমুক গাছের পাতা, অমুক গাছের ছাল, অমুক লতার শিকড়— সে প্রায় গোটা-পঞ্চাশেক নাম। সেক্রেটারি হেসে হেসে সে লিস্ট পড়ে শোনালেন। পরে অন্য চিঠিও পড়লেন। সেক্রেটারি চলে যেতে গুরুদেব বললেন, কাগজ কলম দাও।

সে সময়টায় লিখতে বা পড়তে গেলে গুরুদেব খুব দুর্বল বোধ করতেন। শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ত ঐটুকু পরিশ্রমেই। কিন্তু গুরুদেব এমন গম্ভীর সুরে কাগজ কলম চাইলেন, না দিয়ে উপায় ছিল না, দিলাম; দেবার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে খবর পাঠালাম রথীদা সেক্রেটারি ওঁদের এখুনি একবার আসতে। উনি ত্রস্তেব্যস্তে এলেন, গুরুদেব চিঠি লিখছেন দেখে ছুটে কাছে গেলেন, বললেন, আপনি কেন লিখছেন গুরুদেব, দিন্ আমিই লিখে দিই, কাকে লিখতে হবে বলুন।

গুরুদেব বললেন, না, এ চিঠির জবাব আমি নিজের হাতে দেব।

গুরুদেবের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সকলেরই আতঙ্ক।

গুরুদেব বললেন, কোন্ এক অজানা গাঁয়ের অচেনা মেয়ে আমার অসুখের খবর পেয়ে উতলা হয়ে ওষুধ লিখে পাঠিয়েছে, কি, না, আমি ভালো হব। কত মমতা! তোরা কারো সেন্টিমেন্টের মূল্য দিতে জানিস নে।

শেষে সবাই মিলে তাঁকে বুঝিয়ে কথা দেন যে এখুনি খুব ভালো করে চিঠি লিখে মহিলাকে পাঠানো হবে, তখন গুরুদেব তাঁদের কথায় রাজি হলেন।

মেনে নিলেন চিঠি সেক্রেটারিই লিখে পাঠাবেন।

কুলবধূ অপরাজিতা দেবী গৃহকোণে বসে লুকিয়ে কবিতা লিখে পাঠান গুরুদেবকে ছদ্মনামে। গুরুদেব কত যত্নে তার সেই আবরণটি রক্ষা করে রাখতেন। গৃহকোণের বধূ কবিতা লিখে পাঠান, গুরুদেব দেন তার জবাব কবিতায় 'প্রবাসী'র পাতায় পাতায়। কোনোদিন জানতে চান নি কে এই বধূ।

রোগশয্যায় সেই বধূ এসেছিলেন স্বামীকে নিয়ে গুরুদেবের কাছে। স্বামী বললেন গুরুদেবকে, যদি তিনি অপরাজিতা দেবীকে দেখতে চান তবে আজ দেখতে পারেন।

গুরুদেব কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। যে বধূ তাঁর মনে ঘরের কোণে বসে লুকিয়ে তাঁকে কবিতা লিখেছে, সে বধূকে বাইরে নিয়ে আসতে তাঁর মন চায় নি সেদিন।

কিন্তু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন কে সেই বধূ।

সেবার কি-একটা উৎসব উপলক্ষে নতুন নতুন নাচ গান হবে, যেমন হয় প্রতিবার। তখনকার দিনে নাচের সঙ্গে নতুন নতুন গানের জন্য ভাবনা ছিল না কোনো, গুরুদেবকে আবদার করলেই হত, অমুক তালের নাচ শিখেছি গান চাই; সঙ্গে সঙ্গে গান তৈরি হয়ে যেত। কখনো-বা পুরোনো গানের সুরও বদলে দিতেন তালে তালে নাচবার মতো করে। যেমন দিলেন একবার 'আর নাই রে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে', বা 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে'। তা ছাড়া তখন যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মুঠো মুঠো নতুন গানের হরির লুঠ পড়ত। এ তো সবাই জানে।

সেবার ঠিক হল, 'বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস, স্বচ্ছসলিলা বরুণা' কবিতাটি নাচে ফোটাতে হবে; একটু নতুন রকম হবে। বড়ো কবিতা, একটি পূর্ণ গল্প। ঠিক হল কবিতাটি আগে আবৃত্তি করে পরে নাচ হবে। কিন্তু আবৃত্তি করবে কে?

গুরুদেব বললেন, তুই করবি।

জীবনে আমি কখনো আবৃত্তি করি নি! জানি, আবৃত্তির কণ্ঠ আমার নয়।

গুরুদেব বললেন, আমি শিখিয়ে দেব, আয় বই নিয়ে।

ভয়ে ভয়ে বলি, যদি না পারি!

গুরুদেব বললেন, সে ভার আমার, আমি দেখব তা।

বই নিয়ে এলাম তাঁর কাছে, তিনি কবিতার উপরে মাত্রা দিয়ে দিয়ে দাগ কেটে দিলেন। পড়ে শোনালেন, পড়িয়ে শুনলেন। বললেন, এবারে মুখস্থ করে ফেল, আর রোজ একবার করে আমায় শোনাতে থাক।

সবাইকে লুকিয়ে রোজ গুরুদেবকে একবার দুবার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাই; আর সন্ধের চলে নাচের রিহার্সেল। গুরুদেব দেখে দেখে বললেন একদিন, ঠিকই তো হচ্ছে, ঘাবড়ে গিয়েছিলি কেন মিছে?

গুরুদেব খুশি হয়েছেন, আর কি চাই।

উৎসবের রাত এল। সিংহসদনে স্টেজ সাজানো হয়েছে। আমরা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছি কে কি রঙের শাড়ি পরব, কোন্ খাঁচে চুল বাঁধব, হাতে কোন্ দেশের বালা থাকবে। কথা হল, যে যার বাড়ি হতেই সেজে আসব।

সেদিন দুপুর থেকে গুরুদেবের কেমন জ্বরজ্বর ভাব হতে হতে বিকেলের দিকে জ্বর এসেই গেল।

আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সব উৎসাহ দমে গেল। নতুন নাচ, প্রথম আবৃত্তি, গুরুদেবই যদি না শুনলেন, না দেখলেন, তবে কাকে শোনাব, দেখাব?

উৎসব বন্ধ হবে না। যা ঠিক হয়ে আছে তা হবেই। সন্ধেবেলা ঘর হতে সেজে তৈরি হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আজ যেতে পারবেন না সিংহসদনে; কিন্তু তাঁকে প্রণাম না করে আমি যাই কেমন করে?

শ্যামলীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনের খোলা আঙিনায় কৌচে বসে আছেন গুরুদেব। দেহ যেন এলিয়ে দেওয়া, ঘুমের ভাব। গাঙ্গুলিমশায় গুরুদেবের কৌচের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ইশারায় জানালেন গুরুদেব ঘুমচ্ছেন। পা টিপে টিপে গুরুদেবের পায়ের কাছে ভুঁইয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম; করে তেমনি পা টিপে টিপে চলে এলাম।

সিংহসদনে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের আইটেম সকলের শেষে। আমি ভিতরে না ঢুকে স্টেজের পিছনে বাইরে খোলা আকাশের নীচে ঘুরছি আর ভাবছি কেন আমি আবৃত্তি করতে রাজি হলাম। যতই একটার পর একটা প্রোগ্রাম শেষ হয়ে আসছে ততই বুক দ্রুততর দুরু দুরু করছে। কি জানি কি হল, কিছুতেই থামে না তা। খুবই কি ঘাবড়ে গেছি?

তবে ? প্রোগ্রামের শেষ আইটেম এসে গেল, সময় নেই, একা উঠে আসতেই হল স্টেজে। কোন্ দিকে যে তাকিয়ে ছিলাম জানি না, হয়তো কোনো দিকেই তাকাই নি, দৃষ্টি ছিল সোজা— দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে দূরে পিছনে অন্ধকার জায়গা যেখানটা জুড়ে, সেখানটায়।

আবৃত্তি করে গেলাম। শেষ লাইন শেষ হতেই সর্বপ্রথম 'সাধু' 'সাধু' বলে উঠলেন যিনি— তিনি গুরুদেব। দেখি স্টেজের সামনে কৌচে বরাবর যেখানে বসেন সেইখানে বসে আছেন গুরুদেব। খুশিতে উপচে উঠল প্রাণ। মনে হল স্টেজ হতে লাফিয়ে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসি।

পরে শুনলাম গল্প, গাঙ্গুলিমশায় বললেন, সন্ধের সময়ে আপনি তো প্রণাম করে চলে গেলেন, খানিক পরে গুরুদেবও জাগলেন। বললাম, এইমাত্র রানীদেবী আপনাকে প্রণাম করে গেলেন। শুনে বললেন, রানী চলে গেছে ? বললাম, হ্যাঁ, এতক্ষণে সিংহসদনে পৌঁছেও গেছেন।

গুরুদেব বললেন, গাড়ি আনতে বলো।

গুরুদেব মোটরে করে সিংহসদনে চলে এলেন। গুরুদেব আসবেন না সবাই জানে, তাঁকে দেখে তো সকলে অবাক। তাড়াতাড়ি ছুটোছুটি করে তাঁর কৌচ নিয়ে আসা হয় উত্তরায়ণ হতে, সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। আমি এ-সব কিছুই জানতে পারি নি, প্রথম থেকেই বাইরে ছিলাম। গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে যত শুনি তত চোখ ভিজে ভিজে ওঠে।

আমার নীরব বেদনাটুকু গুরুদেবকে সেদিন বিচলিত করেছিল নিঃশব্দে মাটিতে প্রণাম রেখে চলে আসায়। এত দরদ— এ কেবল তাঁরই ছিল।

আরো একদিনের ঘটনা ; ঘটনা তো সব ছোটোই, কিন্তু তাঁর কাছে তা কত বড়ো রূপ নিত তাই বলতেই বলছি এ-সব।

সেই যেবারে শ্যামলীতে গেলেন, বললেন, এবার মেলা থেকে আমায় কিছু মাটির ঘটি-বাটি কিনে দে দেখি, শ্যামলী সাজাব।

আমি যত রকমের যত গড়নের পারলাম মেলা ঘুরে ঘুরে লাল কালো মাটির ঘড়া ঘটি সরা বাটি পিদিম পুতুল কিনে শ্যামলীতে জড়ো করলাম। কিছু সাজিয়ে কুলুঙ্গিতে রাখলাম, কিছু ছবি-আঁকার টেবিলে তুললাম— জল তুলি থাকবে, রঙ গোলার কাজে লাগবে। আর বাকিগুলো সারা শ্যামলীতে ছড়িয়ে দিলাম্ নানা রঙের ফুল সাজিয়ে।

গুরুদেব বললেন, বাঃ, কোণে কোণে শ্যামলীতে যেন ফুল ফুটে আছে। এই তো চেয়েছিলুম আমি।

কিছুদিন বাদে দেশে না কোথায় যেন গেলাম আমি দিন-কয়েকের জন্য। কেউ আর তেমন করে টাটকা ফুল সাজায় নি, সময়মত জল বদল করে নি। শুকনো ফুল কোনায় পড়ে পড়ে থাকে। গাঙ্গুলিমশায়কে গুরুদেব একদিন বললেন, এগুলো সরিয়ে নাও এখান থেকে।

গাঙ্গুলিমশায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ঘর ভালোবাসেন। আমি ফিরে আসতে সেগুলো সব আমার কাছে চালান করে দিলেন। বললেন, নিন, গুরুদেবের শখ মিটে গেছে, আর দরকার নেই এ-সবের।

রেখে দিলাম তুলে ঘড়াগুলো ঘরে ; সারা বছরে সংসারের নানা কাজে লাগতে পারে ভেবে।

তার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে, একদিন গাঙ্গুলিমশায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, বললেন, আপনার কাছে সেই ঘড়াগুলো আছে তো? দিন্‌-না শিগগির বের করে। ভেবেছিলাম কর্তার শখ মিটে গেছে, তাই ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ খেয়াল হয়েছে, জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কোথায়? বললাম, রানীদেবীকে ফিরিয়ে দিয়েছি। শুনে সে কি রাগ! দিন তাড়াতাড়ি, না নিয়ে গেলে শান্তি নেই।

হাঁড়িঘড়াগুলো বের করে দিলাম। গাঙ্গুলিমশায়, মহাদেব, বনমালী সবাই হাতে হাতে নিয়ে চলল। পিছনে পিছনে আমিও চললাম। দোরের কাছাকাছি যেতে শুনতে পেলাম গুরুদেব গাঙ্গুলিমশায়কে বলছেন, কোন্‌ আক্কেলে তুমি এগুলি রানীকে ফিরিয়ে দিতে গেলে? আমি সরিয়ে নিতে বলেছিলুম— তোমার জঞ্জাল সহ্য হয় না— বাড়ির পিছনে গর্তে ফেলে দিলেই তো পারতে। রানীকে ফিরিয়ে দিলে কেন? বেচারা শখ করে কিনে দিয়েছিল, সে কি ব্যথাটাই না পেল এতে।

ভিতরে আর ঢুকলাম না। নিঃশব্দে পিছিয়ে সেখান হতেই ফিরে চলে এলাম। সেদিন হাঁড়িগুলো ভাঁড়ার-ঘরে তুলে রাখতে রাখতে হয়তো একটু ব্যথা বেজেছিল বুকে, কি বাজেও নি, খেয়াল করি নি। গুরুদেবের কথা শুনে দু চোখ ছেপে জল এল— ব্যথায় কি আনন্দের আজও জানি না।

বলেছি আগে যে, অবাধ গতি ছিল সকলের গুরুদেবের কাছে। ক্ষণে ক্ষণে লেখা বন্ধ করে কথা বলেছেন, আবার সেই অর্ধসমাপ্ত কথা থেকে লেখা লিখে গেছেন। ভাবের বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক হত না। গুরুদেবও বলতেন, দেখো, লেখাটা যেন আমার বড়োগিন্নি, আটপৌরে। সে সব সময়ে সকলের সামনেই বের হয়। কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই। ছবি হল আমার ছোটোগিন্নি, তাকে একটু তোয়াজ করলেই সে ভোলে। কিন্তু আমার মেজোগিন্নি— আমার গান, সে যখন আমার কাছে আসে তখন কাউকেই সে সইতে পারে না। বড়ো অভিমানী। কেউ এল কি, অমনি সে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল —কত সাধ্যসাধনা করে তবে আবার ফিরিয়ে আনতে হয় তাকে।

তাই দেখতামও, গুরুদেব যখন গানে স্থুর দিতেন, তখন কেউ কাছে গেলে স্থুর কেটে যেত। বড়ো কষ্ট হত তাঁর। গানে স্থুর দেবার সময় ধারে-কাছে কেউ থাকলে চলবে না। স্থুর দেওয়া হয়ে গেলে সেই মুহূর্তে ডেকে পাঠাতেন হাতের কাছে যে গাইয়ে পেতেন তাকে। তাড়াতাড়ি সে স্থুর অন্য কণ্ঠে দিয়ে দিতে না পারলে বিপদ ঘটত। নিজের দেওয়া স্থুর তিনি নিজেই ভুলে যেতেন।

আর, ছবির বেলায়— চৌরঙ্গিতে সেই যে ছবি আঁকার সময়ে তাঁর কাছে কাছে থাকতাম, সেই হতে আমাকে গুরুদেবের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। অন্য একজন কেউ সেখানে আছে বলে মনে হত না। তাঁর ভাবে কাজে বিঘ্ন ঘটত না। শেষে এমন হয়ে গিয়েছিল, ছবি আঁকতে মন হলেই আমাকে ডেকে পাঠাতেন; আমি পাশে দাঁড়িয়ে হাতের কাছে রঙ তুলি এগিয়ে দিতাম। আমারও কেমন যেন জানা হয়ে গিয়েছিল। কাগজের আকার ও নমুনা দেখেই বুঝে নিতাম, এতে কি আঁকবেন। বুঝে নিতাম, এ ছবি প্যাস্টেলে আঁকবেন, কি, পেন্সিলে রাখবেন; টেম্পারা করবেন, কি, লিকুইড রঙ লাগাবেন। সব বুঝে ফেলতে পারতাম, আর সেই বুঝে সেই-সব রঙের শিশি এগিয়ে ধরতাম। গুরুদেব যখন ছবি আঁকতেন এত দ্রুত তাঁর মন চলত যে কোন্ রঙে তুলি ডোবাচ্ছেন দেখে নেবার সময় হত না। পাশে যা রঙ আছে তাতেই তুলি ডুবিয়ে কাগজে পোঁছ লাগাতেন। এমন যে সুন্দর

ঢলঢলে মুখখানি ঘিরে হলদে শাড়ির ঘোমটা দেবেন তিনি বলছিলেন, কালো রঙে একেবারে একাকার হয়ে যেত। দিনান্তের আকাশের লাল ছটা সবুজে ঢাকা পড়ত। পলকে ঘটত তা। দেখে দুজনেই হেসে উঠতাম। তার পর সেই ছবিকে ফিরে আবার ধাতে আনা সে ছিল এক ব্যাপার। সেইজন্যই সাবধান থাকতাম আমি। আকাশ যখন হচ্ছে তখন আকাশের রঙগুলিই রাখতাম কাছে, বাকিগুলি সরিয়ে ফেলতাম। আবার মুখ যখন আঁকতেন সিপিয়া ব্রাউন ইয়েলোওকারের শিশিগুলিই এগিয়ে দিতাম। এ অভ্যেসের কথা। দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে গিয়েছিল নজর।

পাহাড়ে গেলেন, সেখানে হরেক রঙের পাহাড়ি ফুল। একবার সেই-সব রঙিন ফুলের পাপড়ি ঘষে ঘষে ছবি আঁকলেন অনেকগুলি। এঁকে কি খুশি গুরুদেব। অনেককে দিয়েছিলেন সেবারকার সে-সব ছবি। বেশির ভাগ রঙই তার উবে গেল পরে, কেবল হলুদ সবুজ এমনিতরো দুটো-একটা রঙ থেকে গেল টিকে। তা হোক, তখন সে সময়ে ছবি আঁকবার কালে তাঁর যে আনন্দ দেখেছি ফুলের রঙ নিয়ে, তা বর্ণনাতীত।

ছবি আঁকবার সময়ে গুরুদেবের ব্যস্ততা ছিল দেখবার মতো। আমরা ছবি আঁকি জলরঙে। জলরঙ শুকতে সময় নেয়, কিন্তু গুরুদেবের সময় নেই রঙ শুকিয়ে রঙ দেবার। রঙের উপর রঙ লাগাতে হয়, তবে তো ছবি হয়। অনেক রঙ ব্যবহার করে করে শেষে পেলিক্যান স্পিরিট রঙই পছন্দ হল গুরুদেবের। স্পিরিট রঙ কাগজে লাগাতে-না-লাগাতে শুকিয়ে যায় হাওয়ায়। ছোটো ছোটো রঙ-ভরা শিশিগুলি রাশি রাশি ফেলা থাকত। সেই রঙেই ছবি আঁকতেন বেশির ভাগ।

দৈবাৎ যদি-বা জলরঙে ছবি আঁকলেন কখনো, থেকে থেকে হাতের তেলো ছবির উপরে চেপে ধরতেন, বলতেন, বল তো কি করছি? বলতেন, হাতের তেলোটা গরম থাকে কিনা তাই ছবির উপর চেপে ধরছি, তাড়াতাড়ি রঙটা শুকিয়ে যাবে।

রঙিন পেন্সিলে আঁকা ছিল আরো বিড়ম্বনার। কাগজের উপরে পেন্সিলের দাগ কাটতে একটা নির্ধারিত সময় লাগে। কিন্তু গুরুদেবের সে অবসর নেই। হয়তো গাছের গুঁড়িতে দাগ কাটছেন; মন ততক্ষণে চলে গেছে গাছের আগডালে। অত দ্রুতগতি পেন্সিলে তা সইবে কেন? পটাপট্‌ শীস ভাঙত,

আর ছুরি দিয়ে একই রঙের এক এক গোছা পেন্সিল কাটতে কাটতে হয়রান হয়ে পড়তাম।

গুরুদেব বলতেন তিনি নাকি রঙ-কানা, বিশেষ করে লাল রঙটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না। অথচ দেখেছি অতি হালকা নীলও তাঁর চোখ এড়ায় না। একবার বিদেশে কোথায় যেন ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখেছেন অজস্র ছোটো ছোটো নীলফুল ফুটে আছে রেল-লাইনের দুধারের ঘাসে। গুরুদেব বলতেন, আমি যত বউমাদের ডেকে ডেকে সে ফুল দেখাচ্ছি তারা তা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম এমন রঙও লোকের দৃষ্টি এড়ায়!

দেখেছি গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য, তবু নাকি লাল রঙ তাঁর চোখে পড়ত না। আর নীল রঙ দেবার বেলায় কত কার্পণ্য করতেন। সে কথা বলাতে কয়েকটা ছবিতে নীল রঙ ঢেলে দিলেন, যেন জোর করেই লাগালেন রঙ।

কত সময়ে তাঁর হাতে কাগজ-পেন্সিল দিয়ে সামনে পোজ দিয়ে বসতাম। বলতাম, আঁকুন আমাকে। এক মিনিটের বেশি চুপ করে বসতে হত না। তারই মধ্যে পেন্সিলের লাইন ড্রইং হয়ে যেত। তার পর চলত তার উপরে রঙের পর রঙের ঢালাঢালি। হতে হতে ছবিতে আমার মুখ এক-একবার এক-এক মূর্তি ধরত। একবার তো চুলের কালো রঙ তুলি হতে টপ্‌টপ্‌ মুখের উপরে পড়ে গেল; সেই কালো রঙ ঘষে মেজে আকার বদলাতে বদলাতে গোঁফওয়ালা ভোজপুরী দরোয়ান হয়ে গেল। গুরুদেব আমি দুজনেই হেসে উঠলাম। গুরুদেব বললেন, তোর মনে গর্ব হওয়া উচিত। দেখ্‌ তো—আমি কত রূপে দেখছি তোকে।

ছবি আঁকতে আঁকতে ছবির সঙ্গে কথা কইতেন কত: কি গো, মুখ ভার করে আছ কেন? আর-একটু রঙ চাই তোমার? সবুজ রঙটা তোমার পছন্দ হল না বুঝি? আচ্ছা, এই নাও লাল। দেখো তো, কত করে তোমার মন পাবার চেষ্টা করছি, তবু তোমার চোখ ছলছল করছে। তা থাকো ছলছল চোখেই; আমি আবার একটু জলভরা চোখই ভালোবাসি দেখতে।

কত যে মজা লাগত আমার! ইচ্ছে করেই চোখমুখের এমন ভঙ্গি করতেন তা দেখে আরো মজা পেতাম, আরো হাসতাম। আজ ভাবি সে-

সব দিনের কথা— ভাবি, এমন করে কথা কইতে না পারলে কি ছবিও কথা কয়ে ওঠে ?

কত খেয়ালই ছিল গুরুদেবের। বলতেন, আচ্ছা, তোরা যে আলপনা দিস —একটা থেকে আর-একটা রিপিট্‌ করিস— তা কেন হবে ?

টেবিলে একটা বাটির মতো ফুলদানি ছিল— ফুল ছিল না তাতে। সেই জলে বনমালীকে দিয়ে একটু তেল আনিয়ে একফোঁটা ফেলে দিয়ে দেখছিলেন আপন মনে। বললেন, এই দেখ্‌, জলের উপরে তেলটা বাড়তে বাড়তে ছড়াতে ছড়াতে কত ভঙ্গি কত আকার নিল ; কত রেখা পড়ল। কই, একটুও তো তাল কাটল না। আলপনাও হবে ঠিক এমনি। রেখার সামঞ্জস্যে বাড়তে বাড়তে চলবে তা।

নিজে কালি কলম দিয়ে আঁকলেনও নকশা কয়েকটা।

ছবি আঁকাটা ছিল যেন তাঁর একটা খেলা। লেখার মাঝে মাঝে যেন নিশ্বাস ফেলে হালকা হওয়া। দেখেছি, সারাদিন লিখেই চলেছেন, লিখেই চলেছেন ; বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল— লেখার খাতা সরিয়ে সেই আবছা আলোতেই একমনে একখানা ছবি এঁকে ফেললেন। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, রবিকাকার ছবি তো নয়, যেন আগ্নেয়গিরির ভল্‌কানিক্‌ ব্যাপার এক-একটা। না বেরিয়ে এসে উপায় নেই।

গুরুদেব শুনে হাসতেন, বলতেন, দেখ্‌, প্যারিসে যখন ওরা আমার ছবির এগজিবিশন করল, ওখানকার ক্রিটিক্‌রা বললেন, আশ্চর্য, আমরা যা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে মরছি, তুমি দেখছি তা পেয়ে বসে আছ।

গুরুদেব বলতেনও, আমার ছবি আঁকতে এত ভালো লাগে অথচ আমায় এরা ছবি আঁকতে সময় দেবে না। কেবলই ফরমাশ করবে এটা লেখো, ওটা লেখো।

কতবার এমনও হয়েছে গুরুদেব দিনে দু-তিনখানা বড়ো বড়ো ছবি এঁকে ফেলেছেন। বলতেন, আমি যদি সত্যি সত্যিই আর্টিস্ট হতুম তবে দিনরাত এই নিয়েই পড়ে থাকতুম।

ড্রইং তিনি শেখেন নি কখনো। হাত-পায়ের গড়নে তাই খুঁত থাকত ছবিতে। নন্দদাকে একদিন বললেন, নন্দলাল, আমায় কতকগুলি নানা ভঙ্গির হাত-পায়ের ড্রইং করে দিয়ো তো একটা খাতায় ; দেখে দেখে আঁকব।

নন্দদা একটা খাতা ভরে দেশী বিদেশী পুরাতন ছবি মূর্তি হতে বহুরকম হাত-পায়ের ড্রইং করে এনে দিলেন। গুরুদেব ছেলেমানুষের মতো— পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে— লুকিয়ে লুকিয়ে সে খাতা বের করে দেখেন একবার দুবার; আবার তাড়াতাড়ি দেরাজে ঢুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু তাঁর ছবিতে রঙে-রেখায় মুহূর্তে কোথায় যায় সেই ডেলিকেট ড্রইং, কোথায়-বা সেই কোমল ভঙ্গিমা হাতের! আগ্নেয়গিরির আগুন ছিটকে বের হবার মুখে সে-সব তলিয়ে যেত। ছবি আঁকার সময় সে যেন একটা প্রলয়। প্রলয়ের শেষে যে রূপ নিত ছবি— তা শান্ত সমাহিতের।

গুরুদেবের ছবি আঁকা তাই দেখবার মতো ব্যাপার ছিল। এই তোড়ের মুখে কত অদ্ভুত সৃষ্টি করেছেন, কত জীব-জানোয়ার, কত রেখার ছন্দ, কত রঙের বিন্যাস। গুরুদেবের প্রতিটি ছবি তার নিজের নিজের কথা কয়— সে কথা শুনে গেঁথে রাখলে গ্রন্থ হয়; এটুকুতে তা আর কত বলব।

রোগশয্যায়ও যখনই একটু উঠে বসতে পেরেছেন, ছবি এঁকেছেন। দূরে আকাশের গায়ে গাছের মাথা ডালপালা মেলেছে— দেখে দেখে বলতেন, দেখ, কেমন মনে হচ্ছে-না বিরাট একটা জন্তু যেন— অনেকটা ঘোড়ার মতো —তার উপরে যেন বিরাট এক মানুষ বসে আছে। দে-না একটা কাগজ পেন্সিল— আঁকি ছবি।

বলতেন, দেখ— ঐ গাছ, যেন একটা হাঙরের মতো। হাঙরের মুখ কিরকম বল তো? একটা ছবি আঁকা যায় তা হলে ঐ রকম। আচ্ছা, এন্‌সাইক্লোপিডিয়াটা আন।

হাঙরের মতো জীববিশেষের মুখ দেখে ঐ গাছের সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত জীব সৃষ্টি করলেন ক্রেয়ন পেন্সিলে এঁকে।

যখন ছবি আঁকতে পারতেন না— দূরের গাছে ছবি দেখতেন, বলতেন, আজকাল আমি গাছের ডালে নানা রকম ছবি দেখতে পাই, এটা আমার আগে ছিল না।

কবিতা লেখার সময়ে গুরুদেবের এক ভঙ্গি। সে বেশ সহজ সুন্দর গভীর উদাস ভঙ্গি। কোনো ভয়-ভাবনা হত না কাছে যেতে। কিন্তু গল্প লেখার সময়ে বেশির ভাগ— অবশ্য শেষ দিকেরই কথা এ-সব— যা ভাব দেখতাম মুখে-চোখে, অনেক সময়ে ভয় পেতাম; টিপে টিপে পা ফেলতাম শব্দ হয় পাছে।

সেবারে সিলোনে— কলম্বোতে সমুদ্রের ধারে বিজয় বর্ধনের বাড়িতে আছেন গুরুদেব, বোঠান, উনি আর আমি। দলের আর-সকলে অন্য বাড়িতে শহরের ভিতরে। গুরুদেব জাহাজ হতেই কি যেন একটা লেখা শুরু করে-ছিলেন, গম্ভীর গম্ভীর ভাব তাঁর। কলম্বোতে নেমে দোতলায় সমুদ্রের ধারের বারান্দায় বসে সেই লেখা নিয়েই আছেন সারাক্ষণ। যত-না লেখেন, তার চেয়ে বেশি সময় তাকিয়ে থাকেন সমুদ্রের দিকে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ভ্রূক্ষেপও করেন না। যে গুরুদেব সদা সচেতন থাকতেন কৌতুকে পরিহাসে আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে, তিনি একবার চেয়েও দেখছেন না। বরং একটুতেই কেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। অহেতুক ভাবনায় ব্যস্ত করে তোলেন। আমাদের দলের কার ব্যবহারে কোথায় কি ত্রুটি ঘটতে পারে, কার স্বভাবে চপলতা প্রশ্রয় পেলে শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে ইত্যাদি নিয়ে অল্পেতেই উষ্মা প্রকাশ করেন।

আমরা যারা কাছাকাছি আছি ভীত হয়েই আছি। বোঠান বহুকাল গুরু-দেবের সঙ্গ পাচ্ছেন— বোঠান বললেন, নিশ্চয়ই বাবামশায় গল্পের কোনো ক্যারেক-টার নিয়ে গোলমালে পড়েছেন, তাই এমন মেজাজ হয়ে আছে তাঁর।

লিখতে লিখতে গুরুদেবের খাতা শেষ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আর-একটা খাতা চাই, এক্ষুনি। বাড়তি খাতা ছিল না। দরকারমত কিনে নেওয়া যাবে এই ছিল ধারণা। গুরুদেব রাগে গুম হয়ে গেলেন। আর রক্ষা নেই। সেক্রেটারি এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করতে লাগলেন। বাইরে বেরিয়ে দোকান হতে খাতা কিনে আনতে কিছুটা তো সময় লাগবে, সে সময় কই? ভাগ্য ভালো, হলুদ মলাটের শান্তিনিকেতনের একটা এক্সারসাইজ খাতা ছিল আমার সঙ্গে স্কেচ্ করবার জন্য। তাড়াতাড়ি সেইটে নিয়ে দিলাম। গুরুদেব লিখতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে উনি ডজন-খানেক খাতা কিনে এনে হাতের কাছে রেখে দিলেন।

কলম্বোতে ও আরো কয়েক জায়গায় বক্তৃতা শো দিয়ে বিশ্রাম নিতে গুরুদেব যখন সবাইকে নিয়ে পানাদুরায় এলেন, একদিন সকালে নন্দদা বোঠান মীরাদি ইত্যাদি দলের বড়োদের ডেকে একটা ঘরে বসে পড়ে শোনালেন গল্প, যার নাম 'চার অধ্যায়'। এই 'চার অধ্যায়ে'র এলাকে নিয়েই সমস্যায় পড়েছিলেন, সেই তখন বুঝলাম। পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে

একদিন গুরুদেব হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাড়ি এসে গম্ভীরভাবে বললেন, নাও, তোমার জিনিস তুমিই ফিরিয়ে নাও, আমি চাই নে তোমারটা, বলে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে রাখা হাত সামনে এগিয়ে ধরলেন। দেখি, আমার সেই হলুদ মলাটের খাতাটা।

'চার অধ্যায়' কয়েকবারই তিনি ফিরে ফিরে লিখেছিলেন, একটিবারের লেখা আছে এই খাতায়।

গুরুদেবকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, দেখ্— একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর-এক রকম ভালোবাসা আছে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়। আমাদের দেশের মেয়েরা বেশির ভাগ ঐ শেষের ভালোবাসাটাই জানে। তাদের ভালোবাসা দিয়ে তারা লতার মতো জড়িয়ে থাকে, পুরুষকে বাড়তে দিতে পারে না; তা কেন হবে?

এই নিয়ে পর পর কয়েকটি গল্পই লিখলেন তিনি। 'শেষ কথা' 'ল্যাবরেটরি'— সব শেষে রোগশয্যায় পড়েও লিখলেন 'বদনাম' গল্পটি। মেয়েদের ভালোবাসাকে গণ্ডি ভেঙে পুরুষের কর্মের ভিতরে ছড়িয়ে দিলেন।

'ল্যাবরেটরি' লিখবার সময়েও দেখেছি গুরুদেবের সেই রকম গম্ভীর ভাব। সোহিনীকে নিয়ে বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে। উদীচীর দোতলার ঘরে নন্দদা, ক্ষিতিমোহন ঠাকুর্দা ও আশ্রমের বিশেষ বিশেষ জনকয়েক প্রবীণ-প্রবীণাদের ডেকে সেই প্রথম সে গল্প পড়ে শোনালেন। পড়বার আগে পর্যন্ত তাঁর যা ভাব ছিল চোখেমুখে, দেখে সবাই ভয়ে যেন কাঠ হয়ে বসেছিলেন। অথচ কিসের যে ভয় কেউ জানে না, কিন্তু হয়েছিল অমনিতরো সকলের অবস্থা। আমারও।

সত্নকে নিয়ে বদনাম গল্পটি যে লিখলেন, সে সময়ে ছিল আর-এক ভাব। তখন তিনি রোগশয্যায়; গল্প লিখবেন, নিজে লিখতে পারেন না, একসঙ্গে বেশি ভাবতেও পারেন না, কষ্ট হয়, কপাল ঘেমে ওঠে। অল্প অল্প করে বলতেন, লিখে নিতাম। কখনো বা স্নান হচ্ছে তাঁর, কি খাচ্ছেন, কি চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন; হঠাৎ হঠাৎ ডেকে পাঠাতেন। এক লাইন কি দু লাইন কথা বললেন। বললেন, লিখে রাখো— মনে পড়ল কথা কয়টা। পরে সত্নর মুখে এক জায়গায় জুড়ে দেওয়া যাবে।

রোগশয্যায় শেষের দিকে গুরুদেব আর নিজে লিখতে পারতেন না, বলে

যেতেন, লিখে নিতাম। তবে, কবিতার বেলা তিনি নিজের হাতেই কলম ধরতেন, বলতেন, এ যেন হচ্ছে কুঁজো হতে জল গড়িয়ে নেবার মতো ; নিজে কলমটি না ধরলে কবিতা বের হয় না।

একেবারে শেষের দিকে কিন্তু সেই কবিতাও আর লিখতে পারতেন না ; বলে যেতেন, লিখে নিতাম।

একদিন, তাঁর রোগশয্যার কালেরই কথা— শান্তিনিকেতনে গুরুদেব তখন একটু ভালোর দিকে, উদয়নে থাকেন, একঘেয়ে দিন ; বাগানের কোণে বোঠানের একটা স্টুডিয়ো ছিল দোতলার উপর একখানি ঘর কাঁচে-ঘেরা ; গুরুদেব নাম দিয়েছিলেন চন্দ্রভানু। সেই চন্দ্রভানুতে গুরুদেবকে আনা হল, একটু তো পরিবর্তন হবে তাঁর।

চন্দ্রভানুতে আছেন গুরুদেব, মাঝে মাঝে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয় কৌচে। কাঁচে-ঘেরা ঘর, শুয়ে-বসে সব সময়েই তিনি দেখতে পান বাইরেটা। বেশ খুশিতে আছেন।

এক দুপুরে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন আমায়। দৌড়ে এলাম। গুরুদেবের কাছে পালা করে আমরা থাকি তাঁর সেবার কাজে। এখন আমার থাকার সময় নয়, অসময়ে কেন ডাক পড়ল আমার ? তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়েছিল ঘরের বাইরে, ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার ?

সে ঘাড় নাড়ল, জানি না।

ঘরের ভিতরে বুড়ি টুকটাক ওষুধপত্র গোছ-গাছ করছিল, গুরুদেব বসে আছেন এক কোণে জানালার ধারে। গুরুদেবের মুখের দিকে চাই— তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। বুড়ির দিকে তাকাই, সে পিছন ফিরে টেবিল সাজায়।

কি হল, কেন ডাকলেন ? হতভম্বর মতো দাঁড়িয়েই থাকি।

খানিক বাদে বুড়ি কাজ সেরে নীচে নেমে গেল।

গুরুদেব এবারে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি কথা ? ঘাবড়ে গেলাম।

গুরুদেব বললেন, খোঁজ পড়ে গেল মশারির চাল পর্যন্ত।

স্তম্ভিত, বিস্মিত, ভীত যা-কিছু, তখন আমি সব রকমেরই।

গুরুদেব গম্ভীরতর হয়ে বললেন, আচ্ছা, এই কলমটাই নাও।

নিলাম।

বললেন, দেখছ কি? লিখে ফেলো। 'নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজ পড়ে গেল মশারির চাল পর্যন্ত।'

বাঁচলাম। দম বন্ধ হয়ে এসেছিল প্রায়। গুরুদেবের মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল, বলে যেতে লাগলেন— ডেকে পাঠালেন পাড়ার মাধুবাবুকে। বললেন, 'ওহে মাধু, আমার কলমটা?' মাধুবাবু বললেন, 'জানলে খবর দিতুম।' ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারু নাপিতকে।

গুরুদেব বলে যেতে লাগলেন আমি লিখতে থাকলাম। তখনি তখনি তৈরি হয়ে গেল গল্প— 'বিজ্ঞানী'। গুরুদেব বললেন, যাও, বাইরে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দাওগে এটি।

ক্ষিতীশ এসেছিল গল্প চাইতে, বিশ্বভারতীর কি একটা কাগজে ছাপতে চায়। তাকে হ্যাঁ না, কিছু আর কথা না দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আমাকে ডেকে পাঠালেন; সঙ্গে সঙ্গে গল্প লিখে দিলেন। গল্পসল্পের শুরু হল এমনি করে।

এর পর হতে এক মজাই হয়ে দাঁড়াল। রোজ সকালে আমার ডিউটির সময়ে তাঁর ঘরে ঢুকলেই এমন ভাবে গল্পের লাইন শুরু করতেন, যেন কিছু বলছেন আমাকে। আমিও মন দিয়ে শুনতাম। গুরুদেব বলতেন, হাঁ করে শুনছ কি? লিখে ফেলো।

গল্পের শেষও হত তেমনি— যেন হঠাৎ থেমে যেতেন। আমি কলম ধরে বসে আছি— আরো কি বলবেন গুরুদেব। গুরুদেব হেসে বলতেন, আর কি, শেষ তো হয়েই গেল।

তখন চমক ভাঙত, হেসে ফেলতাম। এই চমকটুকু তিনি আমাকে প্রতি গল্পের শুরুতে ও শেষে দিতেন।

কোনোদিন হয়তো সকালে এসে প্রণাম করে মাথা তুলেছি, গুরুদেব বললেন, ইরু ছিল আমার চেয়ে বছর-খানেকের ছোটো; কিন্তু আমি তার বয়েসের নাগাল পেতুম না।

কে বুঝতে পারে যে তিনি গল্পের কথা বলছেন, লিখতে হবে। আমি আরো তন্ময় হয়ে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসতে থাকি,

গুরুদেব বলতেন, বসছ কি, কাগজটা হাতে তুলে নাও।

আশ্রমে কোনো এক বিভাগে দুই শিক্ষকের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল কিছুকাল হতে। সেটা বাড়তে বাড়তে গুরুদেবের কাছ পর্যন্ত এল। দুজনেই আলাদা আলাদা এসে নালিশ দুঃখ জানিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতে গুরুদেব বললেন, এতদিন শান্তিতে কাজ চলছিল, আজ গোলমাল বেধে গেছে। মহাজনী নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলেছে— বলতে বলতে বললেন, 'দাঁড়িয়ে থেকো না, লিখে নাও।' গল্পসল্পের 'বড়ো খবর' গল্প লেখা হয়ে গেল। মাঝি একবার 'দাঁড়গুলোকে শান্ত করে, একবার পালকে শান্ত করে।' বললেন, দাঁড় পাল, দুইয়েরই দরকার যে নৌকো চালাতে।

একদিন বললেন, যা তো, একটা অ্যাট্‌লাস্ নিয়ে আয়। সেদিন অ্যাট্‌লাস্ খুলে মনে-মনে একটা উটের পিঠে চড়ে বসলেন, বসে ইয়াংসিকিয়াং নদী ধরে ফুচুং হ্যাংচাও চুংকিং পেরিয়ে ফুচাও নদীর ঘাটে দেখা হ্যাংচাও শহরের রাজকন্যা আংচনীকে বিয়ে করে হাচাং গাছে ফুসুং পাখির গান শুনে ফিরে এলেন। সেদিন উং, চাং নিয়ে দুজনে যেন 'হাসি হাসি' খেলা খেলেছি।

আর নাজেহাল হয়েছিলাম 'বাচস্পতি'র ভুণ্ডুম্মানিত ভাষা লিখতে গিয়ে— সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাক্কষ্ট ত্বরিৎত্রম্যস্ত পর্যুগাসন উথ্‌্রংসিত নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যম্মিত গর্গরায়ণকে পরমস্তি শয়নে সমুসদ্‌গারিত করিয়াছিল— পর্যন্ত তো হল। গুরুদেব বললেন, আর ইংরেজিটা শোনা যাক একবার।

এক ভুণ্ডুম্মানিতেই আমার অবস্থা ঘায়েল, বারে বারে গুরুদেব বানান বলে বলে দিয়েছেন। তার উপরে আবার বাচস্পতির ইংরেজি!

গুরুদেব বললেন, আচ্ছা দে, আমি লিখে দিই। লিখলেন— বাচস্পতি পড়ে গেলেন— দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজড্‌ দি গর্ব্যাণ্ডিজ্‌ম্ অফ হুমায়ুন।

লিখছেন আর হাসছেন— বলেন, বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে অটলদার ভাষা এতদিনে ওঁদের মুচকঞ্চল শব্দে সুধব্ধানিত হয়ে উঠত।

এমনি করে চলত রোজ গল্প লেখা। অতি সহজ কথায় লেখা। বাচস্পতির মুখের কথা আলাদা। নয় তো যেখানেই যুক্তাক্ষর বা শুদ্ধ ভাষা এসে যেত— তা কেটে কেটে তিনি বলার ভাষায় বদলাতেন। 'রাজরানী' গল্পে যেমন

শুরুতে হয়েছিল— 'আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— হীরের হার, সূর্যকান্তমণির মুকুট আর প্রবালখচিত কঙ্কন, আর গজমোতির কুণ্ডল'। তা কেটে কেটে করলেন ; চুনি-পান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন, আর গজমোতির কানবালা।

তেমনি— পরলেন কৌপীন নয় কপনি, গায়ে মাখলেন ভস্ম নয় ছাই, ললাটে আঁকলেন ত্রিপুণ্ড্রক নয় তিলক, আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বিল্ব নয় বেলকাঠের দণ্ড।

এইভাবে চকিতা হরিণীর চাহনি হল হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি, অঙ্গরাগ হল সাজ, কিঙ্করী হল বাঁদী, উর্ণজাল হল মাকড়সা-জাল, অপরূপ হল চোখ-ভোলানো। খ্যাতি— নাম-ডাক, বাক্যচ্ছটা— মুখের কথা, অন্তঃপুর— অন্দরমহল, প্রস্তুত— তৈরি, খাদ্য— খাবার, দরিদ্র— গরিব, সর্বমারী— দেশ-জ্বালানো, অরণ্য— বন। সব কথাই অতি যত্নে দেখে দেখে কেটে দিয়ে সহজ করে দিলেন।

তাঁর শেষের দিকে, আমি নিজে যে লেখাগুলি লিখে নিয়েছি এইরকম সহজ ভাষাই ছিল সব। যখন 'বদনাম' গল্প লেখেন এমনি করে একটি-একটি করে ভারী কথা কেটে হাল্কা করেছেন। এক জায়গায় ছিল 'শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল', মনে আছে শুধু এই 'রোমাঞ্চিত' কথাটিই কাটতে গিয়ে কতখানি সময় নিলেন গুরুদেব, কত ভাবতে হল তাঁকে, কত কাটাকুটি হল, শেষে 'শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল'র জায়গায় লিখলেন, 'গা কাঁটা দিয়ে উঠল'। বললেন, সহজ কথা বলা অতি অসহজ।

গল্পসল্পের গল্পগুলি লেখা হয়ে যাবার পর কুস্‌মিকে এনে ঢোকালেন তাতে, গল্পের শুরুতে ও শেষে তাকে নিয়ে গল্পগুলি কিছুটা করে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, নয়তো নেহাতই ছোটো গল্প হয়ে থাকত এগুলো।

সেই রোগশয্যাতেই— কবিতা, লেখা, গান যখন চলত— গুরুদেব কালিদাসের 'শকুন্তলা' বইখানি আনিয়ে নিয়ে কয়দিন নাড়লেন চাড়লেন ; কোলের উপরে বইখানা রেখে চুপ করে রইলেন। বললেন, শকুন্তলাকে নৃত্যনাট্য করব ভাবছি চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকার মতো। প্রথম দৃশ্যেই থাকবে সখীরা ছুটে আসছে শকুন্তলার কাছে, 'হলা পিয়োসহি' গানের সঙ্গে নাচতে নাচতে। এটাতে সংস্কৃত কথা যত পারি রেখে দেব।

সময়ে কুলোল না।

যোগাযোগের শেষের প্লটটা শেষ করবেন, বলেওছিলেন যে, এই-এই হবে, এইভাবে যাবে ধারাটা। কুমুর ছেলেকে দিয়ে বিপ্লব বাধাবেন গোঁড়া সংস্কারের বিরুদ্ধে। দু-একজন লেখক যাঁরা আসতেন দেখা করতে, তাঁদেরও বলতেন, তোমরা লেখো 'যোগাযোগে'র শেষের প্লটটা। তাঁরা ঘাবড়ে যেতেন, বলতেন, গুরুদেবের গল্পের শেষ আমরা করব এত সাহস আমাদের নেই। সুধাদা একদিন বললেন, তার চেয়ে আপনিই বরং শেষ করুন ; আপনার 'দ্বিতীয়া'ই তো আছে লিখে নেবে।

গুরুদেব ইদানীং আমাকে দ্বিতীয়া বলে ডাকতেন। বললেন, তা যা বলেছিস। দ্বিতীয়া যে লেখে— চমৎকার! যা বলি হুবহু লিখে যায়। ব'লে চাপা কৌতুকের উপর বিস্ময়ের ভান আনলেন। তিনি হাসলেন, সবাই হাসল, আমিও হাসলাম। ঐখানেই সব থেমে থাকল।

কতদিনের কত ঘটনা— কত কথা, ক্ষণে ক্ষণে তারা মাথা তোলে আর ডুব দেয়। কতক ধরে রাখি, কতক তলিয়ে যায় তখনকার মতো, আবার একসময়ে ভেসে ওঠে। সব কি ধরা যায় একসঙ্গে? তবু যেটুকু লিখলাম— আমার কথাটুকুই আমি লিখলাম। তাও কি সব পারলাম?

গুরুদেব বলতেন, কবে যে ছুটি পাব— কোনো কাজ থাকবে না, বসে বসে শুধু আকাশ দেখব, গাছ দেখব, পথ দিয়ে লোকজন যাচ্ছে— এই দেখে দেখে কাটিয়ে দেব। তা নয়, কেবল লেখা লেখা লেখা। আর ভালো লাগে না। ছবিও আঁকতে পারছি নে। যখনই ভাবি আঁকি এইবারে— অমনি মনে হয় এই-এই কাজ বাকি আছে, সে-সব সেরে আঁকব। কিন্তু সেই বাকি বাকিই থাকে।

দেশে গিয়েছিলাম সেবারে, গুরুদেব লিখলেন চিঠি—

...বর্ধমান থেকে ফিরে আসার পর থেকে শরীরটা একটুও ভালো বোধ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন স্বাস্থ্যের ভিত্‌ গেছে ভেঙে। রোজ বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি, তার পরে সেটা কেটে যায়। হয়তো দলবল নিয়ে পশ্চিম প্রদেশে গেলে সেই উপলক্ষে হাওয়া বদল হতে পারবে। ডাক্তারের মত এই, যকৃৎটা অসদ্‌ব্যবহার করছে; খাওয়া-দাওয়া যে বাদ্‌শাহী চালে, তা বলতে পারি নে, তবে কিনা কিছুদিন স্পর্ধাপূর্বক দুধ খেতে লেগেছিলুম, সেটা এখন বর্জন করাই স্থির করেছি, তার স্থলে অর্জন করব কী তা ভেবে পাই নে। মনটা এখন শুধু পথ্যে পরিবর্তন নয়, পথ পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকেছে। যে-সমস্ত কাজে-অকাজে এতকাল জড়িত বিজড়িত ছিলুম তার জাল কেটে একেবারে ফাঁকায় বেরিয়ে পড়বার জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালা মেসেজ চায়, কবি চায় অভিমত, জননী চায় কন্যার নাম, মুসলমান চায় তাদের প্রভুর নামে স্তবগান, মাদ্রাজি গ্রন্থকর্তারা চায় গ্রন্থের ভূমিকা, ডাকযোগে পত্র আসছে প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায়, মাসিকপত্র গদ্যে পদ্যে রসদের নিয়মিত বরাদ্দ দাবি করে, পাতানো নাতনীরা অভিমান করে, সুধীর কর আসেন পা টিপে টিপে প্রুফ নিয়ে, নানা প্রস্তাব নিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুরুদেব বলতেন, জানিস, এ হল আমার বড়ো হবার শাস্তি। বেশ ছিলেম পদ্মার তীরে তীরে নদীর স্রোতে। সহজ আনন্দের দিন ছিল তখন। সেই-দিন কি আর ফিরে পাব?

বলতেন, দেখ্-না, কেমন সুন্দর মেঘলা করেছে, টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে,

এমন দিনে কোথায় চুপটি করে বসে বসে এই-সব দেখব, না, কাজ আর কাজ— লেখা আর লেখা। বিধাতা যিনি— যখন পারে টেনে তুলবেন— নাকালের একশেষ করে এপারের যত ঢেউ খেতে খেতে তার পরে তুলবেন, আর, কি হবে তোমাকে এ-সব কথা শুনিয়ে। এই দেখ্-না, জরুরি তাগিদ এসেছে 'বাণী' দিতে হবে, সেটা সেরে ফেলি আগে— এখন সরো তুমি এখান থেকে। ব'লে লেখার টেবিলে ঝুঁকে বসতেন।

তাঁর নিজের মনের উপর আশ্চর্য রকমের অধিকার ছিল। গভীর তত্ত্ব— সে অন্য কথা, আমি বাইরের কথাটাই বলি। বহুবার দেখেছি, গুরুদেবের জ্বর এসেছে, কি, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ভোর না হতে খবর নিতে গেছি কেমন আছেন; দেখি উঠে নিত্যকার মতো চেয়ারে বসে লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন হয়তো যে, মাথাটা একটু টলমল করছে, নয়তো ভালোই আছি এমনিতে।

তিনি বলতেন, দেখ্, শারীরিক কষ্ট আমি পাই নে মোটেই। একবার আমায় বিছে কামড়েছিল— সে কি যন্ত্রণা! হঠাৎ আমার মনে হল— এ তো আমি কষ্ট পাচ্ছি নে, রবীন্দ্রনাথ বলে একজন কবি আছে তাকে বিছে কামড়েছে। এই বলে আমিই আমাকে আলাদা করে দেখতে লাগলুম। চট্ করে আমার যন্ত্রণা কোথায় গেল— সব ভুলে গেলুম। মনে এমন একটা আনন্দ হল যে, এমনি একটা উপায় থাকতে লোকে কেন কষ্ট পায়। এ উপায়টি আমার আগে জানা ছিল না। সেই অবধি আমার শারীরিক কষ্ট হলে যে-আমি কষ্ট পাচ্ছি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দেখি, কাছে আসতে দিই না।

দেখতামও তাই, জ্বর হয়েছে গুরুদেবের, তাই নিয়েই কলকাতা এলেন। জ্বর বাড়ল, জ্বরের প্রকোপও বাড়ল, গুরুদেব উঠে দাঁড়াতে পারছেন না, সেইদিনই বিকেলে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা। কাছে যাঁরা ছিলেন, ভাবলেন, খবর পাঠিয়ে দেওয়া হোক, আজ বক্তৃতা হবে না। গুরুদেব বললেন, সে হয় না, ব্যবস্থা হয়ে আছে, সকলে অপেক্ষায় থাকবে— আমি যাব।

গুরুদেবকে বাধা দেবে কে? তিনি উঠলেন, সাজপোশাক বদল করলেন, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন।

ফিরে এসে সেক্রেটারি বললেন সবাইকে যে, এমন বক্তৃতা আর শোনেন নি গুরুদেবের। হলের এ প্রান্ত ও প্রান্ত সমান সুরে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি কথায়। বলেন আর বিস্ময় মানেন। বাড়ি হতে বের হবার আগের মানুষ বক্তৃতা দেবার কালে কি করে আমূল বদলে গেলেন! এক ঘণ্টার মধ্যে এমন পরিবর্তন দেহে মনে কি করে সম্ভব?

কর্মে অবহেলা দেখি নি কখনো তাঁর। অন্য কেউ করলেও সইতে পারতেন না। চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটতে পারত না। যেগুলি সেক্রেটারির উত্তর দেবার কথা, পাশাপাশি বাড়িতে থাকি, মুখে তাগিদ দিয়েও শান্তি থাকত না, মুহুর্মুহু ছেঁড়া কাগজে স্লিপ লিখে পাঠাতেন— 'আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ১লা নভেম্বরের কথা। এরকম চিঠির দেরিতে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে রূঢ়তা।'

আবার স্লিপ আসত— 'গবর্নরের চিঠিটা অবিলম্বে পাঠানো কর্তব্য মনে করি। যারা অনশনে মরছে তাদের জন্যে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।'

এমনিতরো আসতেই থাকত স্লিপ।

গুরুদেবের অবসন্নমূর্তি যদি-বা সইতে পারতাম, তাঁর থম্‌থমে ভাব বড়ো দুঃসহ লাগত। তাঁর সে মূর্তি দৈবাৎই দেখা যেত। কিছু বলতেন না কাউকে, কথা কইতেন না কারো সাথে, ফিরে তাকানো নেই এদিকে-ওদিকে; কোলের মাঝে জড়ো-করা হাত, সুদূরে দৃষ্টি, স্থির নিষ্কম্প মূর্তি। রোগশয্যায় এ অবস্থায় দেখেছিলাম একদিন। সেদিন অভিজিৎ বাঁচিয়েছিল আমাদের।

গুরুদেব রোগশয্যায়— দিনের পর দিন একটা নিয়মে চলছিল। গুরুদেব তখন উদয়নের নীচের তলায় একটি ঘরে থাকেন। গুরুদেব সকলের হাতের সেবা নিতে পারতেন না। একান্ত যারা অতি কাছাকাছির তাদের হাতের সেবাই নিতেন কেবল। তাই আমরা যারা তাঁর সেবার অধিকার পেয়েছি, সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে থাকি। সুরেনদা রোজ এর ওর সময় পালটে পালটে নতুন নতুন চার্ট তৈরি করে দরজার বাইরে ঝুলিয়ে দেন, আমরা তাই দেখে দেখে আপন আপন সময়মত ঘরের ভিতরে ঢুকি। একজন এলে অন্যজন বেরিয়ে আসি।

গুরুদেবকে ঘিরে যারা থাকতাম, সকলকে তিনি সর্বদা হাসিতে কথায় ভরিয়ে

রাখতেন চিরকাল ; এমন-কি, রোগশয্যায়ও।

একদিন গুরুদেব বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন, মনও খুশি ছিল। এ অবস্থায় তিনি যখন কথাবার্তা কইতেন, গল্প করতেন, আমরা ঘিরে দাঁড়াতাম। রোগীর ঘরের আটকে-থাকা হাওয়া এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে ছাড়া পেত। আমাদের মন হালকা হত।

সেদিনও সকালে সেই রকম এ কথা ও কথা তুলতে তুলতে গুরুদেবের এক প্রিয়পাত্রের বিবাহের কথা তুললেন, অমুককে আবার বিয়ে দেওয়া যায় না— অমুকের সঙ্গে ? বিষয়টা কৌতুকচ্ছলেই হচ্ছিল গোড়া থেকে। আমরা হাসছিলাম শুনে। এমন সময়ে আমাদেরই একজন পাত্র সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে ফেলল।

গুরুদেবের হাসি কথা বন্ধ হয়ে গেল— যেন মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে সকলে নিঃশব্দে সরে গেলাম। সকাল গেল, দুপুর এল— সেই একভাব। যার যখন সে ঘরে থাকবার কথা, সে ছাড়া কেউ ঘরে ঢুকছে না, যে ঘরে আছে তারও সাহসে কুলোচ্ছে না তাঁর সামনে যাবার, কৌচের পিছনে দাঁড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে ; ওষুধ খাবার সময় হলে ওষুধের গ্লাসটি এগিয়ে ধরছে, গুরুদেব দৃষ্টি না ফিরিয়েই ওষুধ খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

সকলের মনেই একটা অস্বস্তি। কি করা যায় ?

গুরুদেব ফুল ভালোবাসেন, উদীচীর পিছনে বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন, সেই গাছে নতুন ফুল ফুটে ঝরেছে তলায়, কুড়িয়ে এনে একটি পাতায় করে রেখে দিলাম পাশে। গুরুদেব এক পলক দেখে দৃষ্টি বাইরে নিয়ে নিলেন।

ভয়ে ভয়ে বললাম, উদয়নের পুবের বারান্দার পাশে যে ডালিম গাছ তাতেও ফুল ধরেছে টুকটুকে লাল। মনে হল যেন শুনলেন কথাটা। বললাম, কঙ্কর-কুঞ্জের পলাশ গাছেও এবারে ফুল ফুটেছে— এই প্রথম।

বললেন, হুঁ।

দুপুর গেল, বিকেল এল।

গুরুদেবের ঘরের চার দিকে সকলে ঘুরঘুর করেন। নিজেদের মধ্যেও কেউ জোরে জোরে কথা বলছে না এমনি অবস্থা। গুরুদেবের অসুস্থতার কথা ভেবে

ভাবনা আরো বাড়ল। কি উপায়?

গুরুদেব খোলা আকাশ ভালোবাসেন, মনে হল পুবের বারান্দায় যদি নিয়ে যাওয়া যায় হয়তো খুশি হয়ে উঠবেন।

গুরুদেব রাজি হলেন, বাইরে আসতে আগ্রহই দেখালেন। ধরাধরি করে চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে তাঁকে সামনের বারান্দায় আনা হল। মনে আশা— এবারে হয়তো গুরুদেব আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন। কৌচের পিছনে তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আমরা। গুরুদেব কোনো কথাই বললেন না।

মনে মনে সকলে তখন প্রার্থনা করছি একটা কিছু ঘটনা ঘটুক যাতে গুরুদেব কথা কয়ে ওঠেন। বারান্দার সামনে লাল কাঁকরের চওড়া আঙিনা— তার ধার দিয়ে পথ, উত্তরায়ণে আসতে যেতে এই পথেই যেতে হয় সকলকে। মনে মনে ভাবছি— এই পথে এখন কেউ একজন এসে পড়ুক, তাকে ডেকে আনি গুরুদেবের কাছে। রোগীর ঘরে আমাদের দেখে দেখে হয়তো একঘেয়ে হয়ে গেছে গুরুদেবের, অন্য কেউ এলে ভালো লাগবে। কেউ আসে না কেন, আসছে না কেন— করতে করতে দুজন অতিথি এলেন সেই পথে। গুরুদেব অসুস্থ, তাঁকে তো আর দেখতে পাবেন না, উত্তরায়ণ ঘুরে দেখে যাবেন তাঁরা শুধু। অতিথি দুজনকে ডেকে আনা হল। তাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুদেবের দেখা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন। গুরুদেব অতিকষ্টে 'কোথা হতে আসছ, কদিন থাকবে'— দু-একটি কথা বলেই চুপ করে গেলেন। এক শিক্ষক যাচ্ছিলেন অফিস-ফেরত এই পথে, তাঁকে ডাকা হল, বলা হল গুরুদেবের সঙ্গে দু-চারটে হালকা কথা বলতে।

এক অতিথি ভদ্রমহিলা গুরুদেবকে গান শোনাবেন শখ, তাঁকে আনিয়ে গান গাওয়ানো হল; গুরুদেব শুনতে পেলেন কি পেলেন না তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। আর কাকে আনা যায়? রথীদা বোঠান সেক্রেটারিকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠালেন আশ্রমে, কি-একটা কাজে উনি গিয়েছেন সেখানে। ভাবলেন অনিল হয়তো এই আবহাওয়াটা কাটিয়ে দিতে পারবে। ওঁর অভ্যেস ছিল, ঝড়ের মতো এসে দুমদাম করে কথা গল্প বলে আবার তেমনি করেই চলে যেতেন। গুরুদেব হেসে উঠতেন, তিনি ভালোবাসতেন ওঁর এই ভঙ্গি।

উমি এলেন, ছুটতে ছুটতেই এলেন। সকাল হতেই ব্যাপার গুরুতর

জানেন, জেনেই দূরে দূরে আছেন। এ ধরনের অবস্থায় কাছাকাছি তাঁকে পাওয়া যায় না কখনো। তলব পেয়ে এলেন। যে-মানুষ আপন খুশিতে কথা বলে যান, কার মনের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে খবর রাখেন না বড়ো, সেই মানুষও আজ থেমে রইলেন, বার বার চেষ্টা করেও কথা সমাপ্ত করতে পারলেন না। এমন সময়ে চার বছরের অভিজিৎ খেলার মাঠ হতে খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছে ঐ পথ দিয়ে।

সবাই ফিসফিসিয়ে উঠলেন, ধর ধর— অভিজিৎকে ধর।

ধরতে হল না অভিজিৎকে। সে গুরুদেব-দাদুকে বাইরে দেখেই ছুটে এল, এসেই দাদুর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, বললে, জানো দাদু, তোমার সব কবিতা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। আর একটাও বাকি নেই।

গুরুদেব বললেন, সত্যি নাকি? সব শিখে ফেলেছ?

—হ্যাঁ দাদু। স—ব।

—তা হলে তো তোমার জন্য আবার আমার নতুন করে কবিতা লিখতে হবে দেখছি।

আমাদের তখন নিশ্বাস যেন একটু হালকা ভাবে পড়তে শুরু করেছে।

গুরুদেব ও অভিজিতের কথা জমে উঠল। উচ্ছ্বাসের ধাক্কায় অভিজিৎ ডান হাঁটুটা গুরুদেবের কোলের উপরে তুলে দিয়েছে কখন, বলছে, জানো দাদু, আজ কোন্ কবিতাটা শিখেছি? শোনো—

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদগঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।

কবিতার মধ্যে 'পাঠা' আর 'রক্ত' এই দুটোই বুঝেছিল সে। তাই বললে, এর মানে কি জানো দাদু?

গুরুদেব মাথা নাড়লেন।

অভিজিৎ গুরুদেবের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাতে শুরু করে দিল, 'এর মানে হল— পাঁঠাগুলিকে বেঁধে নিয়ে এল— কাটল, আর রক্ত— রক্ত'— বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতখানি যতটা পারল সামনে বাড়িয়ে দিল।

দু-চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। ভাবখানা— যেন অতি বিস্ময়কর একটা ব্যাপার দেখাচ্ছে সে তার গুরুদেব-দাদুকে।

গুরুদেব প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। বললেন, তাই তো গো, এমন মানে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানে না গো!

গুরুদেবের হাসির সঙ্গে আমরাও হেসে উঠলাম। আমাদের হাসিটা যেন একটু জোর রবেই হল।

তখন সেক্রেটারি এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন, ভদ্রমহিলা যে গান শোনালেন, কেমন লাগল আপনার?

গুরুদেব বললেন, আমি শুনতেই পাই নি।

উনি বললেন, হ্যাঁ, বড়ো মিহি গলা। তা মেয়েদের গলা আর কত জোরে উঠবে। গান গাইতে হয় তো পুরুষের গলায়। শুনে বলতে হবে— গলা বটে।

গুরুদেব বললেন, তা যা বলেছিস। আমাদের এক ওস্তাদ ছিলেন, তিনি বলতেন, মেয়েদের গলা আবার গলা! ও তো গলি হ্যায়।

যারা গুরুদেবের পিছনে ছিলাম এতক্ষণ, কখন এসে সামনে দাঁড়িয়েছি। হাসির রেশ ঘুরতে লাগল আমাদের ঘিরে কিছুকাল। সন্ধে পেরিয়ে গেল। চার দিক অন্ধকার হয়ে এল। গুরুদেবকে আবার ধীরে ধীরে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমরা খুশিভরা মনে হালকা পায়ে যে-যার বাড়ি ফিরে এলাম। এবারে খেয়ে নেব, কেউ খানিক ঘুমোব। গুরুদেবের কাছে থাকবার পালা কারো প্রথম রাতে, কারো মাঝরাতে, কারো সেই শেষ রাতে।

এই অভিজিৎকে নিয়েই মুশকিল হত গুরুদেবের অসুস্থ অবস্থায়।

অভিজিতের জন্ম হল কলকাতায়। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পরে গুরুদেব কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এর নাম রইল 'অভিজিৎ'।

অভিজিৎ দিনে দিনে বাড়তে লাগল। এই তল্লাটে অভিজিৎই তখন একমাত্র শিশু। গুরুদেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। টলমল করে দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল একদিন সে। তার পর পা' পা' পা' ফেলে চলতে শিখল। গুরুদেব বলতেন, এই কচি পা একদিন কত শক্ত হবে, কত দৃঢ় হবে— এর উপরেই ভর রেখে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবে।

জ্ঞান হবার আগে হতেই অভিজিৎ চিনেছে গুরুদেবকে। চলতে যখন

শেখে নি, তখন হতেই ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুখচোখ ধুয়ে মার কোলে চড়ে বাইরে বেরিয়ে যাঁর মুখ আগে দেখত সে, তিনি ছিলেন গুরুদেব। তখন হতেই অভ্যেস তার, ভোরে উঠে সর্বপ্রথম গুরুদেবের কাছে আসা। চলতে শিখলে পর সে একলাই আসত গুরুদেবের কাছে। কোনোদিন বিছানা হতে নেমেই ছুট দিত সেদিকে। তাড়াতাড়ি পাকড়াও করে বাসিমুখ ধুইয়ে জামা বদলে ছেড়ে দিতাম। অভিজিৎ গুরুদেবের কাছে এসে দাঁড়াত, লেখার টেবিলের উপরে রাখা কাঁচের বৈয়মভরা লজেন্স থাকত, তা হতে গুরুদেব তার হাতে তিনটি লজেন্স দিতেন; অভিজিতের দিন শুরু হত।

কি জানি কি হিসাব ছিল অভিজিতের, তিনটির বেশি লজেন্স সে কোনোদিন নিত না। এক-এক দিন গুরুদেব বৈয়মের মুখ খুলে অভিজিতের সামনে ধরতেন, অভিজিৎ হাত ডুবিয়ে এক-মুঠ লজেন্স তুলে নিত, নিয়ে হাতের তেলোয় সেগুলি মেলে ধরে গুনত— 'বাপ, মানি, খোকন'— তিনটি রেখে বাকি লজেন্সগুলি বৈয়মে ফেলে দিত। গুরুদেবের খুব আনন্দ হত, বলতেন, এমন নির্লোভ ছেলে আমি দেখি নি।

লজেন্স তিনটি কিন্তু অভিজিৎ নিজেই খেত। 'বাপ, মানি, খোকন'— এ ছিল তার গণনার পদ্ধতি; তার নিজেরই সৃষ্টি। সবাই দেখে হাসত, মজা পেত।

এই তিনটি লজেন্স রোজ অভিজিতের চাই গুরুদেবের কাছ থেকে। গুরুদেবও লক্ষ রাখতেন, বৈয়মে ঠিকমত লজেন্স ভরা আছে কি না।

শেষবার— যেবার অপারেশন হবে, গুরুদেব কলকাতায় এলেন, পরদিন ভোরে যথানিয়ম অভিজিৎ দাদুর ঘরে গেল। গুরুদেব বিছানায় শুয়ে আছেন, অভিজিৎকে দেখে খাটের পাশে রাখা টেবিলের দিকে তাকালেন— লজেন্সের বৈয়ম নেই সেখানে। এবারে শান্তিনিকেতন হতে অসুস্থ গুরুদেবকে নিয়ে আসার সময়ে সকলেরই মন খুব খারাপ ছিল, কি জানি— কি হয়। লজেন্সের কথা কারো মনে থাকবারও কথা নয়। অভিজিৎকে খালি হাতে ফিরে যেতে হল। গুরুদেবের বড়ো বাজল, বললেন, এরা জানে আমার সাথে সাথে থাকে লজেন্সের শিশি, সেই জিনিসেই এদের যত ভুল!

অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই বৈয়মভরা লজেন্স এনে রাখা হল কিনে।

শেষের দিকে অপারেশনের পরের কয়টা দিন— এই লজেন্স পাওয়াও বন্ধ

হয়ে গেল অভিজিতের, তবু সে আসত রোজ সকলের হাত ছিটকে একবার দাদুর ঘরে। শেষদিন— যেদিন সব শেষ হয়ে গেছে, অভিজিতের কথা আমার মনেও নেই— ভিড়ের ফাঁক দিয়ে পথ করে বিদ্যুতের মতো সে এসে দাঁড়াল ঘরে। একটি কথা নেই মুখে— সাদা চাদরে আবক্ষ ঢাকা গুরুদেব-দাদুকে দেখল স্তব্ধ হয়ে। কি জানি কি ভেবে নিল সে— সে-ই জানে। তার পর যখন ফুলে ফুলে ঢাকা গুরুদেবের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় নীচে— ঐ হাজার হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে একটি শিশুকণ্ঠ সেদিন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল, দাদুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা— অমন করে নিয়ে যাচ্ছে কেন— দাদুর কষ্ট হবে যে—

সকাল ছাড়াও যখন-তখন ছুটে ছুটে গুরুদেব-দাদুর কাছে যাওয়া চাই অভিজিতের। পথে যেতে তলায় পড়ে-থাকা সোনাঝুরির শুকনো পাতাটি নজরে পড়ল, তুলে নিয়ে এল দাদুর কাছে— দাদু, এই দেখো কেমন চাঁদ! রঙ তুলি নিয়ে কাগজে কাগজে হিজিবিজি দাগ কাটল— তাই নিয়ে ছুটে গেল দাদুর কাছে— দাদু, এই নাও ছবি। এটা হল মাছ, এটা চাঁদের মা বুড়ি বসে বসে সুতো কাটছে, আর এটা হল শিমুল ফুল— তলায় পড়ে আছে।

গুরুদেব বলতেন, তোর ছেলের ছবি আঁকা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এরই মধ্যে কেমন একটা রূপ দিতে শিখেছে।

এমনিতরো দিনে কতবার যে দাদুর ঘরে যাওয়া চাই অভিজিতের তার শেষ ছিল না। শিশু অভিজিৎ আর গুরুদেবের মধ্যে বেশ একটা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে গিয়েছিল দিনে দিনে। ঘুরে ফিরে না এলে-গেলে যেন চলত না।

অভিজিৎকে গুরুদেব আদর করে বলতেন 'যুবরাজ'। বলতেন, রানীর ছেলে 'রাজপুত্তুর'।

১৯

সেবার— শেষবার কালিম্পঙে গুরুদেব হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়। খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোয় চলে এলাম। যে গুরুদেবকে কতবার কত অসুস্থতায়ও বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখি নি, ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসতেন— ঐ পর্যন্ত। সেই গুরুদেবকে যখন স্ট্রেচারে করে গাড়ি হতে নামানো হল— দেখে বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল।

জোড়াসাঁকোর দোতলায় পাথরের ঘরে তাঁকে এনে তোলা হল; সেই ঘরেই থাকেন। কয়দিন খুবই আশঙ্কায় কাটল। ধীরে ধীরে ভালোর দিকে মোড় ঘুরতে লাগল। গুরুদেব সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তখনো তাঁকে বিছানায় উঠিয়ে বসাবার অবস্থা আসে নি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এল। গুরুদেবের এক দিদিই জীবিত তখন— বর্ণকুমারী দেবী। তিনি এলেন আশি বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজও ভাসে ছবি চোখের সামনে— গৌরবরন একখানি শীর্ণহাতের শীর্ণতর আঙুলে চন্দন নিয়ে গুরুদেবের কপালে কাঁপতে কাঁপতে ফোঁটা কেটে দিলেন। দুজন দুপাশ হতে ধরে রেখেছি বর্ণকুমারী দেবীকে। ফোঁটা কেটে তিনি বসলেন বিছানার পাশে চেয়ারে। ভাইয়ের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। খুব রাগ হয়েছে দিদির ভাইয়ের উপরে। কালিম্পঙে গিয়েই তো ভাই অসুস্থ হয়ে এলেন, নয়তো হতেন না— এই ভাব দিদির। ভাইকে বকলেন, বললেন, দেখো রবি, তোমার এখন বয়েস হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনো। বুঝলে?

গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাব না; বসে বসে যাব এবার থেকে।

সকলের খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

দিদি যত বলতে লাগলেন, না রবি, যা বলছি শোনো, ছুটে ছুটে আর কোথাও যাবে না তুমি। গুরুদেব ততই বলছেন, না, বসে বসেই যাব।

সেদিন দিদির সঙ্গে তাঁর এই কথা রোগশয্যায় যেন উৎসবের আমেজ এনে দিল। গুরুদেব বললেন, দেখি, তোমার পা-দুটি তুলে ধরো উপরে, নয়তো প্রণাম করব কি করে?

দিদি বললেন, থাক্, এমনিতেই হবে, তোমাকে আর পেন্নাম করতে হবে না কষ্ট করে। ব'লে ভাইকে আরো আরো আদর করে আরো বুঝিয়ে দুপাশে দুজনের হাতে হাতের ভর রেখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন।

গুরুদেবকে নিচু হয়ে কারো পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে একবারই মাত্র দেখা গেছে আমাদের কালে। তাও আমি দেখি নি, উনি দেখেছেন, ওঁর কাছেই শুনেছি গল্প, বলেছিলেন— সে যে কি সুন্দর লাগছিল গুরুদেবকে দেখতে তখন!

সুরেনঠাকুর মশায়ের অসুখ, গুরুদেব তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন, তিনি দেখতে গেলেন। সেইসঙ্গে সুরেনঠাকুর মশায়ের মা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী— গুরুদেবের মেজোবোঠান, তাঁর সঙ্গেও দেখা করলেন। মেজোবোঠানের বয়স তখন প্রায় পঁচাশির কাছাকাছি। গুরুদেব নিচু হয়ে মেজোবোঠানের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

গুরুদেব একটু ভালো হতেই আশ্রমে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররাও ভাব দেখে অনুমতি দিলেন। গুরুদেব আশ্রমে এলেন। উদীচী থেকে গিয়েছিলেন কালিম্পঙে; কিন্তু ফিরে এসে আর উদীচীতে ঢোকা হল না তাঁর। উদীচীতে একটি মাত্র ঘর, নীচে উপরে একই ব্যবস্থা। ডাক্তার ভৃত্য সেবক সেবিকা সবাইকে নিয়ে স্থান বেশি চাই। উদয়ন প্রকাণ্ড বাড়ি, রথীদা বোঠানও থাকেন সেখানে। তাঁদের কাছাকাছি এক বাড়িতে গুরুদেব থাকলে সব দিক হতেই সুবিধে। তাই গুরুদেবকে উদয়নেই আনা হল। কয়দিন পরে ভালো হলে পাশের জাপানীঘরে এলেন। এখন সেই জাপানীঘর নেই; দেয়াল ভেঙে ঘর বারান্দা এক করে দেওয়া হয়েছে।

সেই জাপানীঘরের গোল জানালার পাশে একদিন দুপুরে গুরুদেব এক লম্বা কৌচে বসে আছেন; এখন গুরুদেব অনেকটা ভালো, মাঝে মাঝে পড়াশোনা করেন, লেখেন, দু-একটা ড্রইংও করেন। আমাদের সেবা করবার মতো করণীয় কাজ তেমন কিছু নেই, বিশেষ করে দুপুর বেলাটাতে; কেবল ঘড়ি ধরে ওষুধ ঢেলে খাওয়াই আর পাশে চুপটি করে বসে থাকি। গুরুদেবের হাত কি পা কি মাথা যেই একটু নড়ে ওঠে এগিয়ে গিয়ে শুধোই, কিছু কি চাই গুরুদেব? গুরুদেব হয়তো বললেন, কলমটা দে, বা খাতাটা দে, বা চাদরটা এনে পা দুটো ঢেকে দে, শীত করছে; এইরকম টুক্‌টাক কাজ আর-কি!

সেদিন তেমনি দুপুরে আমার পালা, আমি এটা-ওটা সেরে গুরুদেবের পাশে বসে আছি। গুরুদেব বললেন, দেখ্, আমার জন্য তোদের কত সময় নষ্ট হয়, এটা আমার বড়ো লাগে। এখন তো আমি অনেক ভালো হয়ে গেছি, বেশি-কিছু তোদের করবার নেই, চুপ করে বসে না থেকে কিছু বরং কর এই সময়টাতে। আমার তাতে ভালোই লাগবে। বই পড়, নাহয় কিছু লেখ্।

গুরুদেব কতবার কতভাবে আমাকে লেখার কথা বলেছেন আগে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। লিখব, আমি! এও একটা সম্ভবপর কথা নাকি?

গুরুদেব বলছেন দেখ্ই-না একবার চেষ্টা করে। বলেছেন, তুই ছবি আঁকতে পারিস, লিখতেও পারবি। কবিতা লেখ। লিখেই দেখ্-না— দেখবি ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে হেসেছি।

কিন্তু এই দুপুরে আজ যখন গুরুদেব বললেন, তুই লেখ্ রানী, যা হোক কিছু একটা লেখ্— সময় নষ্ট করিস নে; সেদিন কি জানি কেন হাসতে পারলাম না। হাসি এল না। বললাম, গুরুদেব, লিখতে তো জানি না আমি, কখনো লিখি নি; তবে এবারে আপনার অসুখের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ কিছু বলেছিলেন একদিন, তা নোট করে রেখেছি; যদি দেখিয়ে দেন, তবে তা থেকে একটা লেখা তৈরি করতে পারি।

গুরুদেবের অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ রোজ সকালে বিকেলে ও বাড়ি হতে এ বাড়ি আসেন রবিকাকার খবর নেন। ঘরে আর ঢোকেন না, বলেন, ও বাবা— রুগ্ণ সিংহ বিছানায় পড়ে, ও আমি দেখতে পারব না।

গুরুদেব একটু ভালোর দিকে, অবনীন্দ্রনাথের মনও ভালো সে খবরে— সেদিন বিচিত্রা হলে বসে কথায় কথায় অনেক কথাই বলে গেলেন সকালে। যাবার সময় বললেন, রানী, অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করে, কাউকে আমি বলতে পারি নি কিছু। আজ কেমন এসে গেল আপনা হতে। এগুলি মূল্যবান কথা, নষ্ট কোরো না— ধরে রেখো। বলে অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তাঁর কথা কয়টি কেবলই আমার মনে ঘুরতে লাগল। এ এক বিষম দায়িত্বভার মনে হল। কিন্তু কি করে রাখব? কেমন করে ধরব? শেষরাতে গুরুদেবের ঘরে ডিউটি দিই আর ভাবতে থাকি। শেষে মনে হল, যেমন যেমন অবনীন্দ্রনাথ

বলেছেন ঠিক তেমনিই মনে এনে এনে লিখে রাখি।

গুরুদেবের মাথার দিকে ঘরের কোণে রাখা নিভুনিভু কেরোসিনের লণ্ঠনের আলোয় বসে বসে লিখলাম পর পর কয়দিন। সে সময়টায় একলাই থাকতাম আমি গুরুদেবের ঘরে। ভাবলাম, এইভাবে ধরা তো থাক্ কথাগুলি, এর পরে সুযোগমত কোনো ভালো লেখককে দিলে এ থেকে একটা ভালো লেখা তৈরি করে দেবেন।

গুরুদেব বললেন, সেই লেখাগুলি আছে তোর কাছে?

বললাম, হ্যাঁ।

—যা, নিয়ে আয় তো।

উদয়নের পাশেই কোনার্ক। দৌড়ে এসে দেরাজ খুলে লেখাগুলো নিয়ে গুরুদেবের কাছে এলাম। গুরুদেব পড়তে লাগলেন। দু-তিন পাতা পড়বার পরই দেখি তাঁর কপাল ঘামতে শুরু করেছে। লিখলে কি পড়লে অল্পেতেই এখন গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ভাবনা হল। মনে হল, এই পাতাটা পড়া হলেই বলি, গুরুদেব আর না, বাকিটা কাল পড়বেন। যেই বলতে যাব, অমনি গুরুদেব, পলকে পাতা উলটে অন্য পাতা পড়তে লাগলেন। এমন একমনে পড়ছেন যে, পড়ার মাঝে শব্দ করি এ সাহস হয় না। পাতার পর পাতা এ ভাবেই চলল। থামাবার মতো ফাঁক পাই নে। দেখতে পাচ্ছি গুরুদেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপালের ঘাম বড়ো বড়ো ফোঁটায় ফুটে উঠছে; ভয়ে ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। একবার তাঁর হাতে-ধরে-রাখা কাগজগুলোর দিকে চাই, একবার মুখের দিকে তাকাই।

যেন এক নিশ্বাসে গুরুদেব সবটা পড়ে ফেললেন। বললেন, এ অপূর্ব হয়েছে, স্পন্‌টেনিয়াস্ হয়েছে। অবন বলে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। এতে বদলাবার কিছু নেই। তুই অবনের কাছ থেকে আরো গল্প আদায় করে নে। এমনি করে না বলিয়ে নিলে ও বসে লিখবার ছেলে নয়। ব'লে গুরুদেব ঐ লেখারই এক ধারে লিখলেন অবনীন্দ্রনাথকে। সে চিঠি অবনীন্দ্রনাথ—যেমন ছোটো ছেলে রঙিন খেলনা পেলে খপ্ করে নিয়ে মুঠোয় লুকোয়—টুকরো কাগজের চিঠিখানা তেমনি করেই নিয়ে নিলেন। বললেন, রানী, এ চিঠি তোমাকে দেব না। এ যে রবিকা আমায় লিখেছেন— আমার চিঠি।

চিঠিতে লিখেছিলেন, অবন, কোমর বেঁধে বসে লিখবার ছেলে তুমি নও।

এ জিনিস তুমি ছাড়া আর-কারো মুখে হবে না, রানীকে তুমি এমনিতরো আরো গল্প দাও।—

আরো ছিল, সবটা মনে আসছে না। কিছুদিন পর গুরুদেব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়, বললেন, যা, অবনের কাছ থেকে আরো গল্প নিয়ে আয়।

সে একটা সময় গেছে আমার— সোনায়-মোড়া সময়। গুরুদেবের স্নেহ উপচে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের উপর। আমায় দিয়ে বলে পাঠালেন— অবনকে গিয়ে আমার নাম করে বলিস, আমি শুনতে চেয়েছি।

অবনীন্দ্রনাথ খুশিতে উছলে উঠছেন, রবিকা গল্প শুনে খুশি হয়েছেন, আরো শুনতে চাইছেন! বললেন, যত পারো নিয়ে যাও, রবিকাকে গিয়ে শোনাও।

আমি যেন দুজনের স্নেহ-ভালোবাসার বাহন হয়ে গিয়েছিলাম তখন।

জোড়াসাঁকোর ছয় নম্বর বাড়িতে তখন আমি একা। অবনীন্দ্রনাথ রোজ সকালে বিকেলে আসেন পাঁচ নম্বর থেকে, দু তিন চার ঘণ্টা বসে এক-এক বেলা গল্প বলে যান। সারারাত জেগে সেগুলি আমি লিখে ফেলি, পরদিন ভোরে তাঁকে শোনাই; তার পর আবার নতুন গল্প শুনি। অবনীন্দ্রনাথের মহা আগ্রহ। বলেন, যত পারো নিয়ে যাও, সময় আমারও বড়ো কম। কে জানত রবিকা আমার এই-সব গল্প শুনে এত খুশি হবেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে আসত।

সাতদিনে কতকগুলি গল্প লিখে ফিরে এলাম আশ্রমে। অবনীন্দ্রনাথ বলে দিলেন—এবারকার মতো এই-ই নিয়ে যাও, গিয়ে শোনাও রবিকাকে। ওঁর অসুস্থ শরীরে বেশি উৎসাহ আনন্দ দিতেও ভয় হয়। এই বুঝে লেখা ওঁকে শুনিয়ো। এই গল্পগুলি শুনে রোগশয্যায় যদি উনি মুহূর্তের জন্যও খুশি হন— সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গুরুদেব তখন উদয়নের দোতলার ঘরে। জানালা দিয়ে দূর দেখতে পাবেন বলে আনা হয়েছে উপরে।

গুরুদেব জানালার ধারে বসেছিলেন সকালবেলা; আমি গল্পগুলি এনে দিলাম হাতে। গুরুদেব পড়তে লাগলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পড়তে পড়তে কোথাও জোরে হেসে উঠলেন, কোথাও-বা ঝরঝর করে দুচোখের জল ঝরে পড়ল, হাতের রুমালে ঘষে ঘষে চোখ মুছলেন। এমন

করে গুরুদেবের চোখের জল পড়তে এই প্রথম দেখলাম।

বললেন, আশ্চর্য রূপ দিয়েছে— ছবির পরে ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ— রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে ওদের সবাইকে। কি সজীব, সব যেন আবর্তিত হচ্ছে। এমন ভাবে সেই যুগকে ধরেছে এনে— এ আর কেউ পারবে না।

গল্পগুলি রোজ কিছুটা করে পড়েন। পরে তুলে রাখি। পরদিন আবার দিই। পড়তে পড়তে গুরুদেব বললেন, দেখ্, এক-একটা যুগের এক-একটা মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তখন সেই স্বদেশী যুগে চার দিকে কি একটা উন্মত্ততা— বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। পি. এন. বোস বলতেন, 'রবিবাবু— এ যে হল, হয়ে গেল', মানে দেশ উদ্ধার হয়ে গেল। বলতুম, হল বৈকি।

তার পর গেল সেই যুগ, গেল সেই উন্মত্ততা। সিরিয়াস হয়ে গেলুম। এখানে চলে এলুম। খোড়ো ঘর, আসবাবপত্র নেই, গরিবের মতো বাস করতে লাগলুম।

কী সুন্দর অবন সেকালের আমাকে তুলে ধরেছে। সবাই ভাবে আমি চিরকাল বাবুয়ানি করেই কাটিয়েছি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। কিন্তু কিসের ভিতর দিয়ে যে আমাকে আসতে হয়েছে, এই লেখাগুলোতে তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

যেদিন পড়া শেষ হয়ে গেল কাগজগুলি সরিয়ে নেব বলে উঠে এগিয়ে এলাম। গুরুদেব কোলের-উপরে-রাখা লেখাগুলির উপর বাঁ হাতখানি চাপা দিয়ে রইলেন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গুরুদেব বললেন, রথীকে ডাক।

রথীদাকে ডেকে আনলাম। রথীদা এসে দাঁড়ালেন পিছনে; গুরুদেব বুঝতে পারলেন। লেখার কাগজগুলি হাতে নিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে তুলে ধরলেন, বললেন, প্রেসে দাও।

রথীদা লেখাগুলো নিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

এই হল 'ঘরোয়া' বইয়ের সূত্রপাত।

এই জানালার ধারে এমনি করেই বসে গুরুদেব নতুন গানে সুর দিয়েছিলেন— 'ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে'। আরো কত কবিতা লিখলেন। একদিন একটি লম্বা কাগজে 'নারী'

কবিতাটি লিখে আমায় দিলেন নীচে নাম সই করে। বললেন, তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখলাম। রোগী তোদের কাছে দেবতার মতো। যে নারী কর্তব্যকে নিজের মধ্যে নেয় তার উপরেই পড়ে বিশ্বের সেবার ভার— পালনের ভার। সেখানে নারীরা ইউনিভারসেল। বিশ্বের পালনী শক্তি তোদের মধ্যেই আছে। বললেন, রানী নামেই আরম্ভ করেছিলাম কবিতা, শেষে রানী কেটে নারী করে দিলুম। হেসে বললেন, তা তুই নারী তো বটিস ?

সেই সময়েই গুরুদেবের একটা ইচ্ছা জাগল তিনি আশ্রমের শিল্পী জ্ঞানী গুণী কয়েকজনকে নিজে উপাধি দেবেন। বললেন, যাঁরা সে-সম্মান পাবার যোগ্য তাঁরা তা হতে বঞ্চিত থাকবেন কেন ? বললেন, উপাধিগুলি লিখে রাখ তো, নয়তো ভুলে যাব পরে।

ছদিন ধরে গুরুদেব আমাকে দিয়ে উপাধিগুলি লেখালেন। ছ-একটা উপাধির নামমাত্র মনে আছে যেমন— রূপায়নী, নিপুণিকা, কলাকুশল ইত্যাদি। বারো-চৌদ্দটি উপাধি ছিল নারী-পুরুষের। কাকে কোন্‌টা দেবেন তাও বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু তা আর হতে পেল না।

গুরুদেবের আরোগ্য সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠলেন। কিছুতেই রোগের উপশম নেই। হোমিয়োপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি কবিরাজি সবরকম চিকিৎসাই করে দেখা গেল ; যে যেমন বলেন, সবই তো করা হল। অসহ্য কষ্ট দিনের পর দিন। মুখ বুজে সয়ে থাকেন গুরুদেব— কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আমরা সইতে পারি না। একমাত্র শেষ আশা অপারেশন।

অপারেশনে গুরুদেবের খুব আপত্তি। বলেন, শনি যদি একটা-কিছু ছিদ্র খোঁজে, সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে— তাকে স্বীকার করে নাও। মিথ্যে তার সঙ্গে যুঝে লাভ কি। মানুষকে তো মরতে হবেই একদিন। এক ভাবে না এক ভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক-না শেষ। ক্ষতি কি তাতে ? মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছিঁড়ি করার কি প্রয়োজন ?

বললেন, তাঁর দেওয়া দেহ অক্ষতভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো।

দেখা যাক, আরো কিছুদিন দেখা যাক— এই করে করে আরো কিছুকাল কাটল। শেষে সবাই মিলে— অপারেশন করলে যে ভালোই হবে, এবং এ যন্ত্রণা হতে একমাত্র রক্ষার পথ এই-ই— এ কথা বলতে গুরুদেব স্পষ্ট করে

রাজি হলেন না, মুখে কিছু বললেনও না— তবে চুপ করে গেলেন। সবাই স্থির ধরে নিলেন অপারেশন অনিবার্য।

গুরুদেবকে আনা হবে অপারেশনের জন্য কলকাতায়, কথাবার্তা চলছে, আয়োজন ব্যবস্থার তোড়জোড় হচ্ছে। গুরুদেব এবারে জোর করেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়, 'ঘরোয়া'র জন্য আরো কয়েকটি গল্প চাই। বললেন, তুই কয়দিন আগেই যা।

এবারে গুরুদেবকে ছেড়ে আসতে আমার খুবই কষ্ট হল। দোতলার ঘরে কৌচে বসেছিলেন গুরুদেব, স্টেশনে আসবার মুখে তাঁকে প্রণাম করলাম। গুরুদেবের মুখ ম্লান। দৃষ্টি নিমীলিত। প্রণাম করে কৌচ ঘেঁষে বসলাম— উঠে আসবার শক্তি যেন ক্ষণকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। গুরুদেব আমার পিঠের উপরে তাঁর ডান হাতখানি রাখলেন— পরে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এমনিভাবে আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে ধীরে অতি ধীরে বললেন, অবনকে গিয়ে বলিস আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার জীবনের সব বিলুপ্ত ঘটনা যে অবনের মুখ থেকে এমন করে ফুটে উঠবে তা কখনো মনে করি নি।

শান্তিনিকেতনের মাটিতে এই তাঁর শেষ স্পর্শ। সেদিন ছিল ষোলোই জুলাই।

পঁচিশে জুলাই উনিশশো একচল্লিশ সাল, শুক্রবার বেলা তিনটে পনেরো মিনিটের সময় গুরুদেব এলেন আবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। খবরটা জনসাধারণের কাছ হতে গোপন রাখা হয়েছিল, তাই স্টেশনে বা বাড়িতে ভিড় হয় নি মোটেই। বেশ নিরিবিলিতেই গুরুদেবকে আনা হল। সারাদিন ট্রেনে গরমে তিনি কষ্ট পেয়েছেন; খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যে স্ট্রেচারে করে তাঁকে আনা হল তাইতে সেইভাবেই শুয়ে রইলেন। খাটে আর তোলা গেল না তখন। বললেন, এখন আর আমাকে নাড়াচাড়া কোরো না, এই ভাবেই থাকতে দাও।

জোড়াসাঁকোর পুরোনো বাড়ির দোতলায় সেই পাথরের ঘরেই এবারও তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগে এই 'পাথরের ঘর'ই বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার হত এ বাড়িতে।

এবারে অপারেশন হবে বলে আগে হতে ঘরের সব জিনিসপত্র বের করে দেওয়া হয়েছিল। এমন-কি দুদিকের দেয়ালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড়ো বড়ো দুটি ছবি ছিল তাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। গেল বারে গুরুদেব যখন অসুস্থ এই ঘরেরই মাঝামাঝি বিছানায় শুয়ে থাকতেন, মনে হত, দুদিক থেকে মহর্ষিদেব ও দ্বারকানাথ যেন দেখছেন তাঁকে। সে এক শোভা! এবারে সে-সব ছবি অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেয়াল পরিষ্কার করে ঘরের সমস্ত জিনিস 'লাইসল' দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে আগে হতে।

বিকেলে দু-একজন যাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কারো সঙ্গেই তিনি তেমন কথাবার্তা বলতে পারলেন না। সন্ধের দিকে বেশ খানিকটা ঘুমলেন ঐ স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়েই।

রাত সাড়ে সাতটার সময় একবার বলে উঠলেন, কি জানি— ভালো লাগছে না যেন আমার।

ঘরে একা তখন আমি। ভয় হল একটু। কিন্তু গুরুদেবের কাছে তা সামলে গেলাম। জানতাম তাঁর জন্য কেউ উতলা হয়ে পড়ে তা তিনি পছন্দ করেন না। মিনিট-দুয়েক তাঁর পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে, একবার এক ফাঁকে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে পাশের ঘরে রথীদাকে

ডেকে বললাম, গুরুদেব বলছেন তাঁর ভালো লাগছে না। একবার এ ঘরে আসুন।

রথীদা এ ঘরে এলেন, ভান করলেন যেন এমনিই এসেছেন দেখতে। ডাক্তার রাম অধিকারী এলেন রথীদার সঙ্গে সঙ্গে। ইনি গুরুদেবের অসুস্থ অবস্থার শুরু হতেই আছেন সাথে সাথে। পাশের ঘরের ডাক্তাররা কেউ-না-কেউ সব সময়েই থাকতেন। আগের বারেও এমনি ব্যবস্থাই ছিল। গুরুদেবের আড়ালে সদাজাগ্রত হয়ে থাকতেন তাঁরা।

ডাক্তার গুরুদেবের নাড়ী দেখলেন, ওষুধ খাওয়ালেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। খানিক বাদে তাঁরা ঘর থেকে চলে গেলেন। মীরাদি এলেন, তিনি গুরুদেবের পাশে বসেই জিজ্ঞেস করলেন— বাবা, এখন তুমি কেমন আছ ?

মীরাদি অবশ্য এই কয়মিনিটের ব্যাপার জানতেন না। মীরাদি ট্রেনের ক্লান্তির কথা ভেবেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন; কিন্তু ততক্ষণে গুরুদেব টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ভালো লাগছে না বলাতেই ডাক্তার রথীদা সবাই এ ঘরে এ সময়ে এলেন, তাঁকে ওষুধ খাওয়ালেন ইত্যাদি। তাই মীরাদি যেই না জিজ্ঞেস করলেন— 'বাবা, এখন তুমি কেমন আছ'— গুরুদেব অমনি চোখ বড়ো বড়ো করে কথাগুলোর উপর জোর দিয়ে বলে উঠলেন—খুব ভালো আছি। জিজ্ঞেস কর-না— ঐ ওকে। ব'লে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। শরীর খারাপ লাগছে— বলেছেন, ডাক্তারকে খবর দিলাম, ওষুধ খাওয়ানো হল— তাইতে আবার কি অভিমান।

রাত্রে গুরুদেবকে স্ট্রেচার হতে তুলে খাটে শোওয়ানো হল। সে রাত্রে সারারাত বেশ ভালোই ঘুমলেন তিনি।

পরদিন ২৬শে। গুরুদেব সকালে খুব প্রফুল্ল আছেন। ক্লান্তিটাও অনেকটা কেটে গেছে। রাত্রে ভালো ঘুম হওয়াতে বেশ বিশ্রামও হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে অনেক কথা বললেন। সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ চারুবাবু অমিয়বাবু এঁরা অনেকে এলেন। অবনীন্দ্রনাথ আজ খুব খুশি। গুরুদেবকে হাসিমুখে দেখলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। কাল একবার দরজায় উঁকি মেরে ক্লান্ত গুরুদেবকে

ঐ ভাবে শোওয়া অবস্থায় দেখে বারান্দার এ মাথা ও মাথা বার-কয়েক ঘুরে ছটফট করতে করতে নেমে চলে গিয়েছিলেন। গতবারে গুরুদেবের অসুখের সময়ও দেখেছি। রোজ সকালে বিকেলে আসতেন এ বাড়িতে, না এসে থাকতে পারতেন না; বারান্দায় বসে খবর নিতেন গুরুদেবের, ভালো বা মন্দ খবর বুঝে খানিক আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন নয়তো খানিক ছটফট করতেন, পরে চলে যেতেন। গুরুদেবের ঘরে ঢুকতেন না বড়ো।

আজ বারান্দায় উঠেই ইশারায় শুধোলেন— কি, কেমন অবস্থা ঘরের ?

বললাম, খুব ভালো।

তখন অবনীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে ঢুকলেন গুরুদেবের ঘরে।

'ঘরোয়া'র গল্প নিয়েই বললেন গুরুদেব, অবন, আজকের দিনে আমাকে এমন রূপ দেওয়া— এ আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। সবাই আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। আমাকে স্তুতি করতে গিয়ে আসল আমাকে ধরতে পারে নি। তোমার মুখ দিয়ে এতদিনে সবাই জানবে তোমাদের রবিকাকাকে।

সে যুগের নানা গল্প হতে হতে খুড়ো-ভাইপো জমে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তোমার মনে আছে রবিকাকা, সেই গল্প— চার দিকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি, মালগাড়ির নীচে বসে কুলি-মজুরদের নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে— এমন সময়ে এঞ্জিন এসে গাড়ি টানতে শুরু করলে।

তাঁদের হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

গুরুদেব বললেন, তোমার মনে আছে অবন, খবর পেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চাঁদা তুলতে গেলুম ? অন্ধকার সিঁড়ি। অতিকষ্টে উপরে উঠে দেখি একটা ছোটো ঘরে একটা ছোটো কাঠের বাক্সের সামনে এক ভদ্রলোক বসে। আমাদের দলবল দেখে তখুনি পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের বিদেয় করে দিয়ে যেন বাঁচলেন। কেন টাকা দিলেন, কাকে টাকা দিলেন, সে-সবের খোঁজ নেবারও দরকার মনে করলেন না!

গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথ দুজনে হাসতেই থাকেন। এ সময়ে তাঁদের মুখের ভাব আর গলার স্বরে কে বলবে যে, আশি বছরের খুড়ো আর সত্তর বছরের ভাইপো গল্প করছেন।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উৎসব করা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তি। কেউ কেউ তাঁর কাছে এসেছিলেন এই প্রস্তাব নিয়ে, তারা আসতেই তিনি

তেড়ে উঠেছেন, বলেছেন, আগে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাবো, তার পর তোমাদের কথা শুনব।

এর পরে কেউ আর সাহস করেন নি তাঁর কাছে এগতে। অথচ গুরুদেবের ইচ্ছা এবারে বিশেষভাবে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-উৎসব করুক জনসাধারণে। কিন্তু যাঁকে নিয়ে ব্যাপার তাঁকে বলতে যাবে কে।

আমাকেও বলে দিয়েছিলেন গুরুদেব, অবনকে গিয়ে বলিস যে, আমি বলে পাঠিয়েছি, সে যেন রাজি হয়।

শেষ পর্যন্ত নন্দদাকেও পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব কলকাতায়। অবনীন্দ্রনাথ দক্ষিণের বারান্দায় আপন চেয়ারে বসে দু হাতে পুতুল গড়ছেন— মুখে মোটা চুরুট। নন্দদা এলেন, অনেকখানি দূরে একটা মোড়ার উপরে বসলেন। অবনীন্দ্রনাথ চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলেন নন্দদাকে; বুঝলেন নন্দদা কেন এসেছেন এখানে; নন্দদাও দেখলেন অবনীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছেন তাঁর আসার কারণ। দুজনেই চুপচাপ। অবনীন্দ্রনাথ একমনে পুতুল গড়তেই লাগলেন। মুখের চুরুট নিভে গেছে। বসে বসে এক সময়ে নন্দদা সেখানেই মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে এক পায় দু পায় সরে গেলেন। আমি আগাগোড়া দেখছিলাম। যাবার সময়ে নন্দদা ইশারায় বলে গেলেন, আমি পারব না বলতে, যা বলবার তুমিই বোলো।

নন্দদা চলে যেতে হাতের পুতুল রেখে অবনীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। বললেন, মজাটা দেখলে? বলতেই দিলুম না ওকে কিছু। ব'লে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন আর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ব্যাপারটা সব বলেছিলাম গুরুদেবকে আজই সকালে। গুরুদেব এক ধমক দিলেন অবনীন্দ্রনাথকে, মা যেমন দেয় তাঁর বেয়াড়া ছেলেকে। বললেন, অবন, তোমার এতে আপত্তির মানে কি? দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে, তোমার তো তাতে হাত নেই।

অবনীন্দ্রনাথ আর কি করেন, ছোটো ছেলে বকুনি খেলে যেমন মুখের ভাবখানা হয়, তেমনি মুখখানা হয়ে গেল তাঁর। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, তা আদেশ যখন করছ, মালাচন্দন পরব ফোঁটানাটা কাটব, তবে কোথাও যেতে পারব না কিন্তু। ব'লেই অবনীন্দ্রনাথ গুরুদেবকে প্রণাম করে পড়ি-কি-মরি একরকম ছুটেই সে ঘর ছেড়ে পালালেন। পাছে রবিকাকা

আরো কিছু আদেশ করে বসেন। দেখে গুরুদেব হেসে উঠলেন, বললেন, পাগ্‌লা বেগতিক দেখে পালাল।

চারুবাবু অমিয়বাবু ও ঘরে আর আর যাঁরা ছিলেন সবাইকে উদ্দেশ করে গুরুদেব বললেন, অবন কিছু চায় না। জীবনে চায় নি কিছু। কিন্তু এই একটি লোক যে শিল্পজগতে যুগ-প্রবর্তন করেছে, দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে। তাই বলছি, এঁকে যদি তোমরা বাদ দাও তবে সব বৃথা।

তার পর তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়ার কথা উঠল, গুরুদেব বললেন, অবনের গল্প যখন শুনি মনে হয় তখন কত সহজভাবে নতুন জীবন চালনা করে গেছি। কিছু ভাবতে হত না। এখন সময়টা যেন পূর্ণ হয়ে গেছে আর নতুন কোনো উত্তেজনা নেই। তখন প্রতিটি দিন নতুন ছিল। সে কি আশ্চর্য যুগ— অবনের গল্প পড়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে তোমরা সবাই। তখন মানুষ নতুন করে নানা বিষয় রিয়ালাইজ করছে। কোনো ভয়ডর নেই। অথচ দেখো, তখন অবনরা ছোটো ছিল, সাহসও তত ছিল না বললেই হয়। কিন্তু কি করবে, আমার প্রতি সম্মান বল, ভালোবাসা বল, ছাড়তে পারে না। কখন কি কাণ্ড হবে— পুলিস এল— সব ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছে, সে এক নতুন রকমের লাইফের আত্মোপলব্ধি। এই বইটা বের হলে একটা সময়কার ইতিহাস জানতে পারবে। অবনের কথায় যা ছবি আছে সেই ঢের। এখন আমরা ভগ্নদূতের মতো চললুম। যৌবনের কি দীপ্তি ছিল, অনুভব করতুম নিজের ভিতরকার একটা তেজ। এখন সব কৃত্রিম। দেখতে পাই তো। বানিয়ে বানিয়ে সব কথা কয়— ভালো লাগে না।

দুপুরেও গুরুদেব ভালোই ছিলেন। বিকেলে সাড়ে চারটের সময় পঞ্চাশ সি. সি. গ্লুকোস ইন্‌জেকশন দেওয়া হল ডান হাতের শিরায়। গুরুদেবের বেশ একটু লেগেছিল। রানীদি নুনের পুঁটলির সেক দিতে লাগলেন হাতে, আমিও ছিলাম কাছে। গুরুদেব বললেন, দ্বিতীয়া, গেল সব জ্বলিয়া। বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর সারা শরীরে ভীষণ কাঁপুনি উঠল, কম্বল চাপা দিয়ে তিন-চার জনে চেপে ধরে রইলাম। আধ ঘণ্টার উপরে ঠকঠক করে কাঁপলেন গুরুদেব। তার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। ইন্‌জেকশনের জন্যই এই কাঁপুনি হয়েছিল। গুরুদেব খুবই কষ্ট পেলেন আজ। জ্বরও ১০২·৪ অবধি উঠল। সারারাত গুরুদেবের একটানা ঘুমের মধ্যেই কেটে গেল।

আজ ২৭শে। সকালে গুরুদেব একটি কবিতা মুখে মুখে বললেন, আমি লিখে নিলাম।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

গুরুদেব বললেন, সকালবেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন— লিখে রাখ্, নয়তো হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেক বারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল— এবারে চুপচাপ থাকি ; পারি নে। এ পাগলামি নয়তো কি ?

কবিতার কয়েকটা জায়গায় বলে বলে কাটাকুটি করালেন। ফিরে আর একটা কাগজে তা লিখে দিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব শুয়ে শুয়েই বুকের উপরে কবিতার কাগজটি ধরে আরো তিন জায়গায় নিজের হাতে কেটে অন্য কথা বসালেন।

তার পর অনেকক্ষণ একই ভাবে স্থির শুয়ে রইলেন, পরে বললেন, সেই কবিতাটা বল্ তো একবার কাছে বসে, শুনি, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' সেইটে। গুরুদেবের কাছে বসে বলতে লাগলাম,

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে,
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা—

আর মনে আসছে না— কিছুতেই মনে আসছে না। অথচ এত পরিচিত কবিতা ঠিক এই মুহূর্তেই কি করে ভুলে গেলাম জানি না। গুরুদেব কান পেতে আছেন— দুঃখে শ্বাসরোধ হয়ে এল আমার। কি করি— মনে এল, গুরুদেবের কবিতা ওঁর কণ্ঠস্থ থাকে বেশির ভাগই— দৌড়ে গিয়ে ওঁকে ডেকে আনলাম, উনি বলতে লাগলেন—

দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি—

আটকে গেলেন উনিও। বারান্দা দিয়ে অমিতাদি যাচ্ছিলেন, উনি তাঁকে ধরে এনে বসালেন। অমিতাদিও সবটা মনে আনতে পারলেন না আজ। সেদিন যে কি হল সকলের— বড়ো অসহায় অবস্থা আমাদের। ততক্ষণে উনি অন্য ঘর থেকে গীতাঞ্জলি নিয়ে এসেছেন— বই খুলে পড়া হল কবিতা। গুরুদেব তেমনিই স্থির হয়ে আছেন। খানিক পরে এক এক করে সবাই ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। আরো কিছুক্ষণ কাটল। আমিও তেমনি স্থির বসে আছি। গুরুদেব চোখ মেললেন, বললেন, এই-সব কবিতাগুলি মুখস্থ করে রেখে দিস— এগুলো মন্ত্রের মতন।

রানীদি বেবুদি দেবেনবাবু ওঁরা অনেকে এলেন। গুরুদেবের বেশ প্রসন্ন ভাব। তিনি বললেন, ডাক্তাররা বড়ো বিপদে পড়েছে। কত ভাবে রক্ত নিচ্ছে, পরীক্ষা করছে; কিন্তু কোনো দোষই পাচ্ছে না তাতে। এ তো বড়ো বিপদ হল হে ডাক্তারদের। রোগী আছে, রোগ নেই। এতে ডাক্তাররা ক্ষুণ্ণ হবে না তো কি— বল?

এই এক বছর অসুস্থ অবস্থায় গুরুদেবের আধ-শোয়া ভাবে বিছানায় শুয়ে ঘুমনো অভ্যেস ছিল। বিছানায় কোমর হতে ঘাড় অবধি অনেকগুলো বালিশ জড়ো করে রাখা হত; হাঁটুর নীচেও সর্বদা একটা মোটা বালিশ থাকত। অপারেশনের পরে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে কিছুদিন অবধি, তাই ডাক্তাররা বলেছিলেন এখন থেকে দু-একটা করে বালিশ কমিয়ে অভ্যেস

করিয়ে নিতে হবে। আজ বিকেলে যখন পায়ের নীচের বালিশটা ঠিক করে দিতে যাই, তখন গুরুদেব বললেন, আর কেন? পা তুলে থাকা আমার চলবে না গো, উঁচু ঘাড়ও আমার আর সাজবে না। যে ঘাড় কোনোদিন নামাই নি আজ ডাক্তাররা বলছে, ঘাড় নামাও—পা সোজা করো। কি অধঃপতন হল আমার বল দেখি!

২৭শে সকাল। এ দুদিন গুরুদেব খুব বিমর্ষ হয়ে আছেন। অপারেশন নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন। বলছেন, যখন অপারেশন করতেই হবে তখন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকে গেলেই ভালো।

রোজ গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে। গুরুদেব ডাক্তারদের বলেন, বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপ এই ছোটো ছোটো খোঁচা আর কতদিন চালাবে? আমরা সবাই জানি আগামীকাল অপারেশন হবে; কিন্তু গুরুদেবকে জানতে দেওয়া হয় নি তা। জ্যোতিদাকে ডেকে গুরুদেব নানা ভাবে প্রশ্ন করেন, জ্যোতিদাও নানা ভাবে এড়িয়ে যান, অন্য গল্প করেন, অপারেশনের সঠিক দিনটার কথা আর বলেন না। পাছে গুরুদেব কোনোরকম বিচলিত হয়ে পড়েন। গুরুদেব বললেন, আচ্ছা জ্যোতি, আমাকে বুঝিয়ে বল তো—এই ব্যাপারে আমার কতদূর কি লাগবে। আমি সব বুঝে রাখতে চাই আগে থেকে।

জ্যোতিদা বললেন, আপনি টেরও পাবেন না কিছু। এই তো রোজ গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে, এই রকম একটা খোঁচার মতো হয়তো একবার একটু লাগবে। আপনি কিছু ভাববেন না এ নিয়ে। এমনও হতে পারে যে, অপারেশন-টেবিলে এক দিকে অপারেশন হচ্ছে আর-এক দিকে আপনি কবিতা বলে যাচ্ছেন।

গুরুদেব হাসলেন, বললেন, তা হলে তুমি বলতে চাইছ যে আমার কিছুই লাগবে না?

জ্যোতিদা বললেন, একটুও না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

গুরুদেব আমাদের বললেন, তা হলে আজকে তোরা জ্যোতির এখানে আহারের ব্যবস্থাটা একটু ভালো ভাবেই করিস।

গুরুদেব জ্যোতিদার এই রকম হালকা কথাবার্তায় বেশ খুশি হয়ে ওঠেন।

আজ বিকেলে গুরুদেব একটি কবিতা বললেন, লিখে নিলাম। কবিতাটি বলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললেন, ভয়কে ভয় করলেই ভয়। কবিতাটি পড়ে শোনালাম গুরুদেবকে। গুরুদেব মুখে বলে বলে কবিতা সংশোধন করালেন। আবার জায়গায় জায়গায় আমাকে বকুনিও দিলেন, বললেন, এ কি লিখেছ তুমি? ছন্দ মিলল কোথায়?

আমি কলম হাতে নিয়ে বসে নিজের মনে হাসি। বলি, কবিতা কি লিখেছি কখনো, যে ছন্দ বুঝব?

গুরুদেব বললেন, তা হলে দেখছি এবার তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়ব! এ ভাবে তোমাকে দিয়ে কবিতা লেখালে তুমিই কোনো দিন কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে। এখন তোমাকে আমি খাটাচ্ছি, তখন আমাকেই তুমি খাটিয়ে নেবে।

৩০শে জুলাই। আজই অপারেশন হবে গুরুদেবের। সকাল থেকে তারই তোড়জোড় চলছে। পাথরের ঘরের পুব দিকের লম্বা বারান্দার দক্ষিণ দিক্ ঘেঁষে অপারেশনের টেবিল সাজানো হয়েছে, অপারেশনের অন্যান্য জিনিস-পত্র চার দিকে জায়গা মাফিক রাখা হয়েছে। ঘর-বারান্দা ধোওয়া-মোছা হচ্ছে, সব-কিছুই নিঃশব্দে হচ্ছে। গুরুদেব পাথরের ঘরে দক্ষিণ-শিয়রী শুতেন, আজ কয়দিন যাবৎ খাট ঘুরিয়ে তাঁকে পুব-শিয়রী করা হয়েছে। তাই মাথার কাছের বারান্দায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তিনি কিছুই টের পাচ্ছেন না। আমাদের প্রাণ উদ্‌বেগে শঙ্কাতুর। কি জানি কি হবে। সবাই তো বলছেন, ভয়ের কিছু নেই।

গুরুদেব একবার জ্যোতিদাকে ডাকলেন, বললেন, আচ্ছা— আমাকে বলো তো— ব্যাপারটা কবে করছ তোমরা?

জ্যোতিদা বললেন, এই— কাল কি পরশু— এখনো ঠিক হয় নি। ললিত-বাবু যেদিন ভালো বুঝবেন সেদিনই হবে।

গুরুদেবকে আজ তেমন প্রফুল্ল দেখাচ্ছে না যেন।

গুরুদেব অনেকক্ষণ হল চুপ করে আছেন। কি যেন ভাবছেন। বুঝলাম কিছু কথা মনে এসেছে— কাগজ কলম নিয়ে পাশে বসলাম। আমাকে কাছে বসতে দেখে ইশারা করলেন— লেখো। আমি লিখে যেতে লাগলাম, গুরুদেব ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।

কবিতাটি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন গুরুদেব। আজকাল কিছু ভাবতে গেলে অল্পেতেই তাঁর ক্লান্তি আসে ; এ কথা তিনি নিজেও বলেন।

গুরুদেব আবার বুকে দু হাত জড়ো করে চুপচাপ চোখ বুজে রইলেন। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে, সাড়ে নয়টার সময় বললেন, লিখে নে—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বললেন, সকালবেলার কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।

বোঠান শান্তিনিকেতনে অসুস্থ, এখানে আসতে পারেন নি। বোঠানের এতে খুবই খারাপ লাগছে, গুরুদেবকে চিঠি লিখেছেন দুঃখ করে। মনের মধ্যে আমার ভাবনা— আজই তো অপারেশন হবে, অপারেশনের পরে গুরুদেব কেমন থাকবেন কি জানি! বললাম, বোঠানকে একটা চিঠি লিখবেন? উনি যে বড়ো ভাবনায় আছেন আপনার জন্য।

বেলা তখন দশটা। গুরুদেব বললেন, লেখ বউমাকে। তিনি বলে গেলেন আমি লিখে যেতে লাগলাম—

মামণি,

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারি নে বলে কিছুতে লিখতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ— অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছ। কিছু তাপ এখনও তোমার শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদটাই সব চেয়ে দুঃখজনক। আমাকে প্রত্যহই একটা-না-একটা খোঁচা দিচ্ছেই— বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেছি বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়। এই-সব ছোটো ছোটোর উপদ্রব যেমন।— যা হোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরি নেই। চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি—

চিঠিখানা গুরুদেবের হাতে দিলাম, কলম দিলাম; গুরুদেবের হাত কাঁপছে— চিঠির নীচে কাঁপা হাতে সই করলেন 'বাবামশায়'। অক্ষরগুলি একটার গায়ে আর-একটা লেগে লেখাটা অস্পষ্ট হল।

গুরুদেব তখনো জানেন না আজই তাঁর অপারেশন হবে।

সাড়ে দশটার সময়ে ললিতবাবু অপারেশনের সব-কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে কনুই অবধি হাত ধুয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের সার্টের হাতাটা গোটাতে গোটাতে গুরুদেবের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আজ দিনটা ভালো আছে। তা হলে আজই সেরে ফেলি— কি বলেন? ব'লে বাইরে আকাশের দিকে চাইলেন। যেন ঝক্‌ঝকে দিন দেখে এই মুহূর্তেই কথাটা মনে এল তাঁর।

গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, আজই? পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ভালো, এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।

তার পর আর আমাদের সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা কইলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে কেবল বললেন, একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ।

কবিতাটি পড়ে শোনালাম। বললেন, কিছু গোলমাল আছে— তা থাক্, ডাক্তাররা তো বলছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে; ভালো হয়ে পরে ঠিক করব'খন।

বেলা এগারোটার সময়ে বাইরের বারান্দায় স্ট্রেচারে করে গুরুদেবকে অপারেশন-টেবিলে আনা হল। আমরা ধারেকাছেই দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় কাঁপছি। গুরুদেবের মুখের সামনে বুকের উপরে একটা ছোটো স্ক্রিন দিয়ে দিয়েছে যেন গুরুদেব তার ওদিকে কিছু দেখতে না পান। গুরুদেবকে ক্লোরোফরম্ দিয়ে অজ্ঞান করানো হয় নি— লোক্যাল অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে অপারেশন করা হচ্ছে। আমরা শুধু গুরুদেবের মুখখানিই দেখতে পাচ্ছি, একটা বড়ো স্ক্রিনে তাঁর দেহ আড়াল করে রাখা হয়েছে। নিঝুম বাড়ি; কোথাও একটি ছুঁচ পড়লে যেন সে আওয়াজ কানে লাগবে এমনি ভাব সবার। সোজা যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দেহের ভারটা সেখানে ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলাম সামনে।

এগারোটা কুড়ি মিনিটে অপারেশন হয়, সেলাই ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি শেষ হতে আধঘণ্টাটাক সময় লাগে। সব বেশ ভালো ভাবেই হল। গুরুদেবকে ঘরে আনা হল। আমাদের মুখ দেখে বোধ হয় তাঁর মায়া হল। ভারী হাওয়াটা উড়িয়ে দেবার জন্যই হেসে বললেন, কি ভাবছ? খুব মজা— না?

দিনের বেলা গুরুদেব খুব ঘুমলেন। ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দু-চারটে কথাও বললেন, তবে ডাক্তারদের মানা ছিল— তাই তাঁকে থামিয়ে দিতে হচ্ছিল।

বিকেলের দিকে গুরুদেব বারকয়েকই বললেন, জ্বালা করছে— ব্যথা করছে। গায়ের তাপ আজ অন্য দিনের তুলনায় কম।

ললিতবাবু সন্ধে সাতটায় আবার এলেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, অপারেশনের সময়ে কি লেগেছিল আপনার?

গুরুদেব বললেন, কেন মিছে মিথ্যে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে।

অপারেশনের সময়ে নাকি খুব লেগেছিল গুরুদেবের। কিন্তু একটুও টের পেতে দেন নি তিনি, একটু নড়েন নি, একবারও আঃ উঃ করেন নি।

গুরুদেব বললেন, জ্যোতিকে আমি একবার জিজ্ঞেস করতে চাই— সে যে আমাকে বোঝালে যে একটুও লাগবে না— তার মানে কি ?

এত কষ্টের মাঝেও হাসি-ঠাট্টার সুরেই কথা বললেন গুরুদেব।

ললিতবাবু বললেন, তা এক রকম সব তো ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল, কেবল জ্যোতির দুঃখ রয়ে গেল আপনার কবিতাই বলা হল না।

গুরুদেব হাসলেন।

ডাক্তাররা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর গুরুদেব বললেন, দ্বিতীয়া, জ্যোতি নাকি একটি কবিতার জন্য দুঃখ করছিল।

বললাম, তা হলে বলবেন আপনি ? আমি লিখে নিই !

বললেন, ক্ষেপেছিস তুই। এখন কবিতা বলব !

—তবে আজকের কবিতাটি—

গুরুদেব বললেন, না, তাতে যে গোলমাল আছে একটু। কাল যেটা লিখেছি একবার পড়ে শোনা আমাকে।

আমি কাল বিকেলের লেখা কবিতাটি পড়ে শোনালাম। বললেন, ঠিক আছে, এটাই ঠিক হবে। লিখে জ্যোতিকে দে।

আমি আলাদা একটি কাগজে লিখলাম—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার ॥

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে ॥

পাশের ঘরে জ্যোতিদা রথীদা ডাক্তাররা ও আরো অনেকে বসেছিলেন —গিয়ে কবিতাটি জ্যোতিদার হাতে দিলাম। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। কবিতাটি সকলে নিজের নিজের জন্য কপি করে নিতে লাগলেন। সকলেই ভাবলেন গুরুদেব এখুনি এই কবিতাটি লিখে পাঠালেন। কিছু না বলে গুরুদেবের কাছে ফিরে এলাম।

রাত্রে গুরুদেব ভালোই ঘুমলেন।

৩১শে। আজ সকালে গুরুদেব একটা-দুটো কথাই বললেন মাত্র— ব্যথা করছে, জ্বালা করছে।

দুপুর থেকে কেমন নিঃসাড় হয়ে আছেন। গায়ের তাপও বেড়েছে আজ। দিনে বেশ ঘুমিয়েছেন, কিন্তু রাত্রে ভালো ঘুম হল না গুরুদেবের।

১লা অগস্ট। আজ সকাল থেকে গুরুদেব কোনো কথাই বলছেন না। অসাড় হয়ে আছেন। কেবল যন্ত্রণাসূচক শব্দ করছেন থেকে থেকে। দুপুরের দিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু মাথা নাড়ছেন। মাঝে মাঝে যখন তাকান— তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাই, ভাবি, কিছু বুঝি-বা বলতে চাইছেন; কিন্তু কিছু বলেন না।

অল্প অল্প জল, ফলের রস খাওয়ানো হচ্ছে গুরুদেবকে। ডাক্তাররা চিন্তিত। অন্য কোনো উপসর্গ আছে কি না ধরতে পারছেন না। সারাদিন ডাক্তারদের আনাগোনা পরামর্শ ফিসফাস চলেইছে। এদিক-ওদিক যেতে-আসতে পাশের ঘরের কথা কিছু কিছু কানে আসছে। বড়ো ভাবনা হল, ভীত হয়ে পড়লাম।

২রা। কাল রাতটা নানা রকম ভয়-ভাবনাতে কাটল। গুরুদেব কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন সারারাত। আজ সকালে কথা দু-চারটে যা বলছেন— পরিষ্কার। কিছু খাওয়াতে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, বলেন— আঃ, আমাকে আর জ্বালাস নে তোরা।

আজ গুরুদেবের মুখে এরকম কথা শুনেও কত ভালো লাগছে। এ দুদিন যেন দম আটকে আসছিল সবার। বললাম, কষ্ট হচ্ছে কিছু? তিনি বললেন, কি— কি করতে পারবে তুমি? চুপ করে থাকো।

একজন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার?

গুরুদেব স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, এর কি কোনো বর্ণনা আছে?

দুপুর হতে গুরুদেব আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সারারাত এইভাবেই

কাটল। বিধানবাবু এসেছিলেন। গুরুদেবের খুব হিক্কা উঠছে, মাঝে মাঝে কাশিও আসছে।

৩রা। সকালে শান্তিনিকেতনে ফোন করা হল বোঠানকে এখানে চলে আসবার জন্য। কাল রাত্রে গুরুদেবের অবস্থা সংকটজনকই ছিল। আজ যেন একটু ভালো; মানে— ওষুধ বা কিছু খাওয়াতে গেলে যে বিরক্ত হচ্ছেন— সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দুপুর হতে আবার অন্য দিনের মতো আচ্ছন্ন হলেন।

সন্ধের ট্রেনে শান্তিনিকেতনের ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বোঠান এলেন। বোঠানের শরীরের অবস্থাও খুব খারাপ।

রাতটা গুরুদেবের ভালো কাটল না মোটেই।

৪ঠা। ভোরবেলা অল্পক্ষণের জন্য গুরুদেব একটু-আধটু কথা বললেন। ডাকলে বা কিছু খেতে বললে সাড়াও দিলেন; কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। সকালে একবার ফিডিং কাপে করে মুখে কফি ঢেলে দিলাম, বেশ চার আউন্সের মতো কফি খেলেন।

বোঠান এসে গুরুদেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন, বাবামশায়, আমি এসেছি— আমি বউমা— বাবামশায়!

গুরুদেব বুঝতে পারলেন। একবার চোখ-দুটি জোর করে টেনে বোঠানের দিকে তাকালেন আর মাথা নাড়লেন।

ডাক্তাররা দু-বেলাই আসছেন যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে দু-তিনজন ডাক্তার দিনরাত বাড়িতেই থাকছেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে একবার খুব ভয় হল গুরুদেবের অবস্থা দেখে। তখুনি ইন্দুবাবুকে ফোন করে আনানো হল। ওষুধ পথ্য সবই তো নিয়মমত পড়ছে কিন্তু রোগের উপশম কই? রোজই কিছু-না-কিছু একটা নতুন উপসর্গ জুটছে। জ্বরও বেড়েই চলেছে, ক্রমেই গুরুদেব দুর্বল হয়ে পড়ছেন। রাত এগারোটার সময় একবার ডান হাতখানি তুলে আঙুল ঘুরিয়ে আবছা স্বরে বললেন, কি হবে কিছু বুঝতে পারছি নে— কি হবে—।

ঐ পর্যন্তই। তার পর সারারাত্রে আর কোনো কথা নেই।

৫ই। সারাদিন গুরুদেব সেই একই রকম অবস্থায়। সন্ধ্যে সার্ নীলরতনকে নিয়ে বিধানবাবু এলেন। আজ আর ডাকলেও গুরুদেবের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সার্ নীলরতন গুরুদেবের পাশে বসে তাঁকে দেখলেন,

তাঁর অবস্থা শুনলেন অন্য ডাক্তারদের কাছ থেকে। কিছু বললেন না। যতক্ষণ সার্ নীলরতন গুরুদেবের পাশে বসে ছিলেন সারাক্ষণ গুরুদেবের ডান হাতখানির উপর তিনি হাত বুলোচ্ছিলেন। যাবার সময়ে সার্ নীলরতন গুরুদেবের মাথার কাছ পর্যন্ত এসে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, গুরুদেবকে আবার খানিক দেখলেন, তার পর দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেলেন। কি তাঁর মনে ছিল কি জানি! কিন্তু যাবার সময়ে তাঁর ঘুরে দাঁড়িয়ে গুরুদেবকে আর-একবার দেখে নেবার সেই ভঙ্গিটির মানে যেন অতি স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে।

রাত্রে স্যালাইন দেওয়া হল গুরুদেবকে। অক্সিজেনও আনিয়ে রাখা হয়েছে। নাকটি কেমন যেন বাঁ দিকে একটু হেলে গেছে, গাল-দুটি ফুলেছে, বাঁ চোখ ছোটো ও লাল হয়ে গেছে। পায়ের আঙুলে ও হাতের আঙুলে ঘাম ঘাম মতো হচ্ছে।

ললিতবাবু আজ অপারেশনের একটা সেলাই খুলে দিয়ে গেলেন দিনের বেলা।

আজ ৬ই। সকাল হতে বাড়ি লোকে লোকারণ্য। গত কয়দিন হতেই লোকজনের ভিড় চলছিল কিন্তু আজ আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কাউকে। আজ আবার পূর্ণিমা, আজকের দিনটা যদি কোনোরকম করে কেটে যায় তবে হয়তো ভরসা পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ভরসাই যে কম।

গুরুদেব এক-একবার খুব জোরে কেসে উঠছেন। থেকে থেকে হিক্কাও সমানে চলেছে। আজ আর গুরুদেবের কোনো সাড়াশব্দ নেই। সকালে বোঠান একবার গুরুদেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন, বাবামশায়— বাবামশায়— বাবামশায়— বাবামশায়।

গুরুদেব একবার সাড়া দিলেন এবং তাকালেন। কাল রাত থেকে অনেক সময়ে তাকিয়ে থাকেন, যেন কোথায় তাকিয়ে আছেন বোঝা যায় না। এক-একবার দু ভুরু কুঁচকে আসে, সেটা ব্যথার বা আর-কিছুর— কি জানি।

এখন দুপুর বারোটা, এখনো সেই একই অবস্থা। মুখে জল বা ফলের রস একটু একটু দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বেশি দিতে ভয় হয় কখন হিক্কা উঠবে আর বিষম লাগবে। কাসিও আছে খুব।

বিকেলও কাটল একই ভাবে। সন্ধে হতে অনেকেই গুরুদেবের ঘরে এসে

তাঁকে দেখে যেতে লাগলেন। বর্ণকুমারী দেবী ভাইকে দেখতে এসে রাত্রে এখানেই রয়ে গেলেন। একবার করে বর্ণকুমারী দেবী কাঁপতে কাঁপতে এ ঘরে আসেন ভাইকে দেখতে— সামনে আর আসতে পারেন না, গুরুদেবের মাথার কাছ হতেই ফিরে যান, আবার আসেন।

গুরুদেবের শিয়র বরাবর বাইরে পুবের আকাশে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে দেখি পরিপূর্ণ ছবি একখানি। এই ছবিখানি যেন আজকের জন্তই দরকার ছিল। এমনটিই হবার কথা ছিল।

রাত বারোটায় গুরুদেবের অবস্থা খুব অবনতির দিকে গেল।

৭ই অগস্ট ১৯৪১ সাল শ্রাবণ মাসের ২২শে আজ। ভোর চারটে হতে মোটরের আনাগোনা জোড়াসাঁকোর সরু গলিতে। নিকট আত্মীয় বন্ধু পরিজন প্রিয়জন সব আসছেন দলে দলে।

পুবের আকাশ ফরসা হল। অমিয়াদি চাঁপাফুল অঞ্জলি ভরে এনে দিলেন। সাদা শাল দিয়ে ঢাকা গুরুদেবের পা-তুখানির উপর ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলাম।

বেলা সাতটায় রামানন্দবাবু গুরুদেবের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করলেন। শাস্ত্রীমশায় পায়ের কাছে বসে মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্ দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

এ মন্ত্র গুরুদেবের মুখে কত কতবার শুনেছি।

বাইরের বারান্দায় ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে কে যেন গাইছেন গান, 'কে যায় অমৃতধামযাত্রী'।

চেষ্টা করেও নিজেকে সামলে রাখা যাচ্ছে না।

বেলা নয়টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল। নিশ্বাস সেই একই ভাবে পড়ছে। ক্ষীণ শব্দ নিশ্বাসে। সেই ক্ষীণ শ্বাস ক্ষীণতর হয়ে এল। গুরুদেবের দু-পায়ের তলায় দু-হাত রেখে বসে আছি। পায়ের উষ্ণতা কমে আসতে লাগল।

বেলা দ্বিপ্রহরে বারোটা দশ মিনিটে গুরুদেবের শেষ নিশ্বাস পড়ল।

বাইরে জনতার দারুণ কোলাহল। তারা শেষবারের মতো একবার দেখবে গুরুদেবকে।

গুরুদেবকে সাদা বেনারসী-জোড় পরিয়ে সাজানো হল। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাট-করা চাদর গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো, কপালে চন্দন, গলায় গোড়ে মালা, দু পাশে রাশি রাশি শ্বেতকমল রজনীগন্ধা। বুকের উপরে রাখা হাতের মাঝে একটি পদ্মকোরক ধরিয়ে দিলাম; দেখে মনে হতে লাগল যেন রাজবেশে রাজা ঘুমচ্ছেন রাজশয্যার উপরে। ক্ষণকালের জন্য যেন সব ভুলে তন্ময় হয়ে রইলাম।

একে একে এসে প্রণাম করে যেতে লাগল নারীপুরুষে। ব্রহ্মসংগীত হতে লাগল এক দিকে শান্তকণ্ঠে।

ভিতরে উঠোনে নন্দদা সকাল থেকে তাঁর নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। নকশা এঁকে মিস্ত্রি দিয়ে কাঠের পালঙ্ক তৈরি করালেন। গুরুদেব যে রাজার রাজা, শেষ-যাওয়াও তিনি সেইভাবেই তো যাবেন।

তিনটে বাজতে হঠাৎ এক সময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দা হতে দেখলাম— জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল।

—

ব্যক্তি-পরিচয়

অনুদি	শ্রীঅণুকণা দাশগুপ্তা
অপরাজিতা	শ্রীঅপরাজিতা দেবী [রাধারানী দেবী]
অপূর্বদা	অপূর্বকুমার চন্দ
অমিতাদি	শ্রীঅমিতা ঠাকুর
অমিয়বাবু	শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী
অমিয়াদি	শ্রীঅমিয়া ঠাকুর
অমূল্য বিশ্বাস	অমূল্যকৃষ্ণ বিশ্বাস
আরিয়ম্‌দা	আরিয়ম্‌ উইলিয়াম্‌স্ (আর্যনায়কম্‌)
আলু	সচ্চিদানন্দ রায়
আশাদি	আশা দেবী (আর্যনায়কম্‌)
ইন্দুবাবু	ডাক্তার ইন্দুমাধব বসু
ইভাদি	শ্রীইভা দেবী
উইলমট	শ্রীউইলমট পেরেরা
কালীমোহনবাবু	কালীমোহন ঘোষ
ক্ষিতীশ	শ্রীক্ষিতীশ রায়
গাঙ্গুলিমশায়	প্রমোদলাল গাঙ্গুলি
গোঁসাইজি	নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
গৌরদা	গৌরগোপাল ঘোষ
চারুবাবু	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
জ্যোতিদা	ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার
জ্যোতিদাদা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডাক্তারবাবু	শ্রীশচীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দিনদা	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দেবেনবাবু	দেবেন্দ্রমোহন বসু
ধনরাজগিরি	হায়দ্রাবাদের একজন ধনী জমিদার
নতুন বউঠান	কাদম্বরী দেবী
নন্দদা	নন্দলাল বসু
নিশিকান্ত	নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

নীলরতন	ডাক্তার নীলরতন সরকার
ছুটুদি	রমা কর : শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, [সুরেন্দ্রনাথ করের স্ত্রী]
পুপু	শ্রীনন্দিনী দেবী
প্রশান্ত	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
বড়দাদা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়মা	হেমলতা ঠাকুর
বিধানবাবু	ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়
বেবুদি	নলিনী বসু
বোঠান	প্রতিমা দেবী
মহাদেব	ভৃত্য
মামাবাবু	নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
মীরাদি	মীরা দেবী
মেজবউঠান	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
রথীদা	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রানীদি	রানী মহলানবিশ
ললিতবাবু	ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
লাবণ্যদি	লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী [অজিতকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী]
শাস্ত্রীমশায়	বিধুশেখর শাস্ত্রী
সন্তোষবাবু	শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জ
সমরেন্দ্রনাথ	সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সরোজদা	সরোজরঞ্জন চৌধুরী
সুধাদা	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
সুধীরা বউদি	সুধীরা বসু
সুরেনদা	সুরেন্দ্রনাথ কর
সেক্রেটারি	অনিলকুমার চন্দ
হেমবালাদি	হেমবালা সেন